দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ সংখ্যা, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ), April 2026
www.poundrakshatriya.com
দামঃ ৩০০ টাকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

বৈশাখ সংখ্যা বিষয়ঃ ক্ষত্রিয়





সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ সংখ্যা, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (শশাঙ্কাব্দ), April 2026

www.poundrakshatriya.com

দামঃ ৩০০ টাকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

বৈশাখ সংখ্যা বিষয়ঃ ক্ষত্রিয়





সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

সংগঠন মন্ত্র (বেদ থেকে গৃহীত)

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সং জানানা উপাসতে।।

সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।

সমানী বা আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ।। (সামবেদ)

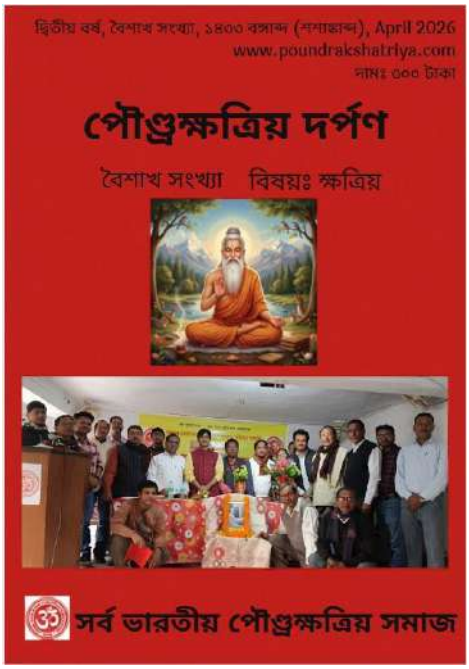
“সমভাবে চল, সমভাবে বল, সমভাবে মনোবৃত্তি সমূহের প্রেরণা হউক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের ন্যায় সমভাবে আরাধনা পরায়ণ হও। তোমাদের সমান মন্ত্র হউক, সমান সমিতি হউক, সমান মন হউক, সমান চিত্ত হউক, তোমরা সমান মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হও, সমানভাবে আত্ম নিবেদন কর, সম হৃদয়ে উদ্দেশ্য জানাও, তোমাদিগের মন সমানভাবে ভাবান্বিত হউক, তোমাদিগের হাস্যহর্ষ সমভাবাপন্ন হউক। ওম শান্তি! ওম শান্তি! ওম শান্তি!

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ

দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ সংখ্যা, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/শশাঙ্কাব্দ,

যুগাব্দ - ৫১২৮, এপ্রিল, ইং-২০২৬

www.poundrakshatriya.com



পত্রিকা সম্পাদকঃ শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

সহ-সম্পাদিকাঃ শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল

যে কোনও বিষয়ের জন্য যোগাযোগ

সম্পাদক - ৯৮০০২৯৬৬৪৮

প্রকাশকের ঠিকানাঃ

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ই-মেলঃ :

poundrakshatriyadarpan@gmail.com

সূচিপত্র

NEW COMMITTEE - ৩

আত্মজাগরণ - ৫

সম্পাদকীয় - ৬

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

-শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল ১৩

স ভা পৌ ক্ষ স লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য -১৯

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ঐতিহ্যে রাজা দক্ষিণরায় - শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল - ২০

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কেন 'রাজার জাতি' ?- শ্রীলক্ষ্মীপতি গায়েন - ২৭

বৈদিক সাহিত্যে ক্ষত্রিয়

- শ্রীসৎকৃত বেদাঙ্গ - ৩৮

বৈদিক সংহিতায় ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতি রণপ্রিয়া রায় - ৪২

উপনিষদে ক্ষত্রিয় - শ্রীউপেন্দ্র বৈদ্য - ৫০

সংহিতা বা স্মৃতি গ্রন্থে ক্ষত্রিয়

- শ্রীবিষ্ণু বিশ্বাস - ৬১

পুরাণে ক্ষত্রিয় - শ্রীআত্মবান সাধু - ৬৮

অষ্টাদশ মহাপুরাণে ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতী প্রাণদা পাত্র - ৭৭

বাল্মীকি রামায়ণে ক্ষত্রিয়

- শ্রীসীতাপতি পাইক - ৮৪

রামায়ণে ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতী রাধারানী দেবী - ৯২

মহাভারতের ক্ষত্রিয় আদর্শ

- শ্রীধনেশ্বর নস্কর - ৯৯

মহাভারতে ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতী সুপর্ণা মণ্ডল - ১০৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ক্ষত্রিয় দর্শন

- শ্রীপতিতপাবন রায় -১১৪

ক্ষত্রিয় পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

- শ্রীরামচন্দ্র করণ - ১২৩

পিতামহ ভীষ্মের ক্ষত্রিয় ধর্ম

- শ্রীদেবব্রত মৃধা - ১৩১

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয় কেন ?

- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল - ১৩৮

ভারত নির্মাণে ক্ষত্রিয়দের অবদান

- শ্রীপুষ্পরাক্ষ সিংহ - ১৪৭

সমাজ উন্নতির সোপানসমূহ

- শ্রীহরি নস্কর - ১৫৩

একটি পৌন্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রাম

- শ্রীমতী সুমিতা গায়েন - ১৫৭

অনুগল্পঃ পরম্পরা - ১৫৮

বর্তমানে হিন্দু একতার প্রয়োজন

- আচার্য শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায় -১৫৯

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা চিন্তা করুন বৈশ্বিক, কাজ করুন স্থানীয় ভিত্তিতে-ত্রিলোচন নস্কর-১৬১

কম্যুনিজম ও ইসলামি মৌলবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সাদৃশ্য সম্পর্কে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে - ড. বন্দেমাতরম মৌলিক - ১৬২

আদর্শ পতিব্রতা নারী বসুন্ধরা

- শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল - ১৭৪

কবিতাঃ "ছন্দের খোঁজে"

- বরুনাংশু গায়েন - ১৮০

সাংগঠনিক খবর - ১৮১

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন - ১৮১

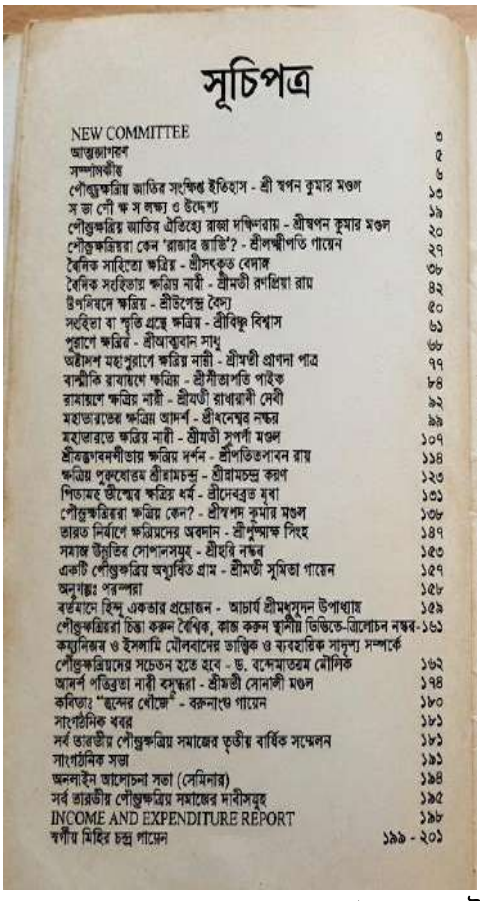
সাংগঠনিক সভা - ১৯১

অনলাইন আলোচনা সভা (সেমিনার) - ১৯৪

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ - ১৯৫

INCOME AND EXPENDITURE REPORT - ১৯৮

স্বর্গীয় মিহির চন্দ্র গায়েন -১৯৯ - ২০১



সূচিপত্র

NEW COMMITTEE ৩
আত্মজ্ঞাপন ৫
সম্পাদকীয় ৬
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল ১৩
স ভা পৌ ক্ষ স লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৯
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ঐতিহ্যে রাজা দক্ষিণরায় - শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল ২০
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কেন 'রাজার জাতি'? - শ্রীলক্ষ্মীপতি গায়েন ২৭
বৈদিক সাহিত্যে ক্ষত্রিয় - শ্রীসংকেত বেদার ৩৮
বৈদিক সহিতায় ক্ষত্রিয় নারী - শ্রীমতী রণপ্রিয়া রায় ৪২
উপনিষদে ক্ষত্রিয় - শ্রীউপেন্দ্র বৈদ্য ৫০
সংহিতা বা স্মৃতি গ্রন্থে ক্ষত্রিয় - শ্রীবিষ্ণু বিশ্বাস ৬১
পুরাণে ক্ষত্রিয় - শ্রীঅনুব্রান সাধু ৬৮
অষ্টাদশ মহাপুরাণে ক্ষত্রিয় নারী - শ্রীমতী প্রাগদা পাত্র ৭৭
বাল্মীকি রামায়ণে ক্ষত্রিয় - শ্রীসীতাপতি পাইক ৮৪
রামায়ণে ক্ষত্রিয় নারী - শ্রীযতী রাধারানী দেবী ৯২
মহাভারতের ক্ষত্রিয় আদর্শ - শ্রীধনেশ্বর নস্কর ৯৯
মহাভারতে ক্ষত্রিয় নারী - শ্রীমতী সুপর্ণা মণ্ডল ১০৭
শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ক্ষত্রিয় দর্শন - শ্রীপতিতপাবন রায় ১১৪
ক্ষত্রিয় পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র - শ্রীরামচন্দ্র করণ ১২৩
পিতামহ ভীষ্মের ক্ষত্রিয় ধর্ম - শ্রীদেবব্রত মৃধা ১৩১
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয় কেন? - শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল ১৩৮
ভারত নির্মাণে ক্ষত্রিয়দের অবদান - শ্রীপুষ্পাক্ষ সিংহ ১৪৭
সমাজ উন্নতির সোপানসমূহ - শ্রীহরি নস্কর ১৫৩
একটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রাম - শ্রীমতী সুমিতা গায়েন ১৫৭
অনুগল্পঃ পরম্পরা ১৫৮
বর্তমানে হিন্দু একতার প্রয়োজন - আচার্য শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায় ১৫৯
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা চিন্তা করুন বৈশ্বিক, কাজ করুন স্থানীয় ভিত্তিতে-ত্রিলোচন নস্কর-১৬১
কম্যুনিজম ও ইসলামি মৌলবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সাদৃশ্য সম্পর্কে
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে - ড. বন্দেমাতরম মৌলিক ১৬২
আদর্শ পতিব্রতা নারী বসুন্ধরা - শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল ১৭৪
কবিতাঃ "ছন্দের খোঁজে" - বরুনাংশু গায়েন ১৮০
সাংগঠনিক খবর ১৮১
সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ১৮১
সাংগঠনিক সভা ১৯১
অনলাইন আলোচনা সভা (সেমিনার) ১৯৪
সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ ১৯৫
INCOME AND EXPENDITURE REPORT ১৯৮
স্বর্গীয় মিহির চন্দ্র গায়েন ১৯৯ - ২০১

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত দায়িত্বপ্রাপ্তগণ

SARBA BHARATIYA POUNDRAKSHATRIYA SAMAJ

NEW COMMITTEE ON AND FROM 25.01.2026 UPTO NEXT CONFERENCE

POST	NAME	PHONE NO
PRESIDENT	1. SRI SWAPAN KUMAR MANDAL	98002 96648
VICE-PRESIDENT	2. SRI DEBASIS JODDER	98755 45362
	3. SRI SATYAPADA MONDAL	81169 92093
	4. SRI BHABESH HOWLY	97325 30583
GENERAL SECRETARY	5. SRI TAPAN BAIDYA	94771 41104
	6. SRI NITYANANDA MONDAL (SECRETARY)	82406 92025
ASISSTANT SECRETARY	7. SRI KARTICK CHANDRA SARKAR	99323 75178
	8. SRI SUVENDU GAYEN	98005 59526
	9. SRI NARESH TARAFDAR	81456 63669
	10. SRI MANUDEB GAYEN	90931 51596
	11. SRI CHANDRA SHEKHAR MANDAL	90516 68617
	12. SRI MUKESH MONDAL	96474 24945
CASHIER	13. SRI ASOKE KUMAR BAIDYA	90386 65787
MEMBER	14. SRIMATI SONALI MANDAL	82500 81654
	15. SRI BARINDRA MONDAL	94747 14797
	16. SRI KARTICK MONDAL	83486 03723
	17. SRI MILTON SARKAR	82508 72614
	18. SRI CHIRANTAN MANDAL	99324 31559
	19. SRI NISHIT KAYAL	92331 38810
	20. SRI SUKUMAR MANDAL	85368 73697
	21. SRI SHIBAJI MONDAL	87773 19044
	22. SRI SUBHAJIT MONDAL	81455 65440
	23. SRI ASHIM MONDAL	97329 79497
	24. SRI TAPAN KUMAR BACHAR	70032 12060
	25. SRI RAJESH BAIDYA	99336 85899
	26. SRIMATI POLY SARKAR	99323 75178

DISTRICT CONVENER

DISTRICT	NAME	PHONE NO
MEDINIPUR	SRI SUVENDU GAYEN	9800559526
SOUTH 24 PARGANAS	SRI MANUDEB GAYEN	9093151596
NORTH 24 PARGANAS	SRI KARTICK CHANDRA SARKAR	9932375178
NADIA	SRI NARESH TARAFDAR	8145663669

ASSEMBLY CONVENER

ASSEMBLY	NAME	PHONE NO
BONGAON	**SRI MUKESH MONDAL**	9647424945
HABRA	**SRI SUBHAJIT MONDAL**	8145565440
GAIGHATA	**SRI TAPAN KUMAR BACHAR**	7003212060
MAHISHADAL	**SRI BARINDRA MONDAL**	9474714797
BARASAT	**SRI CHANDRA SHEKHAR MANDAL**	9051668617
MADHYAMGRAM	**SRI ASOKE KUMAR BAIDYA**	9038665787
HINGALGANJ	**SRIMATI SITARANI GAYEN**	8967261466
BASIRHAT LOKSABHA	**SRI BHABESH HOWLY**	9732530583

CELL IN-CHARGE

CELL	NAME	PHONE NO
EDUCATION (HIGHER)		
EDUCATION (SCHOOL)	**SRI KARTICK MONDAL**	8348603723
EDUCATION (PRIMARY SCHOOL)	**SRI ASHIM MONDAL**	9732979497
EDUCATION (NTS)	**SRI CHIRANTAN MANDAL**	9932431559
LAW CELL	**SRI MILTON SARKAR**	8250872614
POUNDRAKSHATRIYA SENA (YOUTH CELL)	**SRI RAJESH BAIDYA**	9933685899
DEBI BAHINI (WOMEN CELL)	**SRIMATI POLY SARKAR**	9932375178

POUNDRAKSHATRIYA DARPAN

RESPONSIBLITY	NAME	PHONE NO
EDITOR	**SRI SWAPAN KUMAR MANDAL**	9800296648
ASSISTANT EDITOR	**SRIMATI SONALI MANDAL**	8250081654

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র

"বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মাতৃগণ। তোমারা যে, যে অবস্থায় থাক না কেন ভুলিও না, তুমি এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জননীর একটি সন্তান। ভুলিও না, জননীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। ভুলিও না তোমার চরিত্র, তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃতিত্ব, তোমার গৌরব তোমার প্রতিষ্ঠার দিকে তোমার জননীর অপমান, তোমার জননীর লাঞ্ছনা, তোমার জননীর নির্যাতনের জন্য তুমি দায়ী। ভুলিও না- তোমার ব্যক্তিগত সুখ, স্বচ্ছন্দ, সুবিধা, বিলাস, ব্যাসন ভোগের ক্ষুধা মনুষ্যেতর জীবনেও মিটিতে পারে। ভুলিও না তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার নিত্য সহচর। ভুলিও না— তুমি আর্য, আচার্য্যত্ব তোমার আছে। ভুলিও না তুমি ভারতের একজন, পৃথিবীর একজন। ভারত তথা পৃথিবী তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

স্মরণ রাখিও–তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, গুজরাটী, কানাড়ী, আসামী, চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। মৎসর হস্তের বিকৃত বিবৃতিকে তোমার লেখনীর নির্মম আঘাতে খণ্ডন করিতে হইবে। **সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, যুদ্ধ চলিয়াছিল, চলিতেছে ও চলিবে, অনন্ত কাল চলিবে। স্মরণ রাখিও — শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিও, অর্থের অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব। চিন্তা করিও—পরিবেশই মানব গঠন করে। অসৎ পরিবেশ নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন ও সৎপরিবেশে প্রবেশই অস্তিত্ব রক্ষার উপায়।** মনে রাখিও তোমার পরিচয়ে, তোমার জাতি, তোমার জননীর পরিচয়। স্থির জানিও তোমার আদরেই তোমার জননীর আদর। বিচার করিও -- তোমার গুরু পুরোহিত কুলের অবনতি প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হইতে পারেন কিন্তু মৎসর মানবকুল তাহার স্পর্শে কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। মনে রাখিও একতাই বল, সংঘশক্তিই বল। মনে রাখিও – কুটনীতিই তোমার মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, আবার সোজা হইয়া সোজা পথে চলিতে হইবে। লুপ্ত গরিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, উজ্জ্বলতর করিতে হইবে। নচেৎ তোমার আত্মাই তোমাকে ক্ষমা করিবে না, করিতে পারে না। সাধু। সাবধান! প্রলোভনে বঞ্চিত হইও না, আত্ম-বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ।" বাক্য সার্থক কর। **ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !!!**"

- মহাত্মা রাইচরণ সরদার,
"দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা"
থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

কেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যুক্ত হবেন ?

সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ। এবিষয়ে যে কারণ বিন্দুগুলোকে চিহ্নিত করা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপঃ-

১. ক্ষত্রিয় পরিচয় ও মর্যাদা সুরক্ষা - সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহাসিক পরিচয় ও মর্যাদা রক্ষায় কাজ করে। এককভাবে লড়াই করার চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির মাধ্যমে নিজেদের 'ক্ষত্রিয়' পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করা সহজ। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

২. সামাজিক ঐক্য ও সংহতি - বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে সম্প্রদায়ের শক্তি বোঝা যায় না। সংগঠনে যোগ দিলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, যা যেকোনো বিপদে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

৩. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন - সংগঠিত সমাজ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সম্প্রদায়ের দাবি তুলে ধরা সহজ হয়। আবার নিজেরা সংগঠিত হলে নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব অর্থাৎ নিজেদের রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা সম্ভব যা নিজ সম্প্রদায় তথা দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে বেশি কার্যকর।

৪. সরকারী সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করা - প্রাপ্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন অধিকার যাতে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়ে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠন তদারকি ও সহায়তা করে। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ যাতে এই কাজ ত্বরান্বিত হয়।

৫. শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা - মেধাবী ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক দিশা দেখানোর জন্য সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই ভূমিকা সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত এলাকায় যাতে ঠিকভাবে পালিত হয় তার জন্য সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

৬. বৈবাহিক সম্পর্ক সহজীকরণ - সংগঠনের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের উপযুক্ত

পাত্র-পাত্রীর খোঁজ পাওয়া সহজ হয়, যা সামাজিক বিশুদ্ধতা রক্ষায় সাহায্য করে। আধুনিক যুগের জটিলতায় বৈবাহিক সম্পর্ক ক্রমশ ভঙ্গুর হচ্ছে। সংগঠনের মাধ্যমে এর কারণ চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিকার করা সম্ভব। পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক নির্মিত হলে সেখানে বিশ্বাস বজায় থাকে ও বোঝাপড়া ভালো হয় যা দাম্পত্য সম্পর্ককে মজবুত করে।

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমবায় - ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা কৃষকদের জন্য সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ বা সরকারি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সংগঠন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের পাশে থাকা যায়, অন্যদিকে তেমনি নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করার সহায়ক হয়।

৮. আইনি সহায়তা - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের কোনো মানুষ জাতিগত বিদ্বেষ বা অন্য কোনো আইনি জটিলতায় পড়লে আমাদের সংগঠন যৌথভাবে আইনি লড়াই লড়তে পারবে এবং সদস্যদের পাশে থাকতে পারবে।

৯. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি, গাজন বা লোকজ আচারগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এই সংগঠন গবেষণামূলক কাজ করে থাকে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করলে এই কাজ আরও সহজতর হবে।

১০. কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান - সংগঠনের বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন পেশার সুযোগ ও সরকারি চাকরির খবর দ্রুত পেতে পারেন।

১১. ইতিহাস চর্চা ও প্রচার - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই সংগঠন লিটারেচার বা বই প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে। ফলে এই সংগঠনে যোগ দিয়ে নিজেদের ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে জানা যেমন যাবে তেমনি নিজ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গভীরে প্রবেশ করা যাবে যা আত্মিক উন্নতি ও সম্প্রদায়ের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে।

১২. দুর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রাণ - প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীর সময় একক প্রচেষ্টার চেয়ে সংগঠনের হয়ে ত্রাণকার্য পরিচালনা অনেক বেশি কার্যকর হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত এলাকাগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত এবং সেখানে নিজেদের সংগঠন থাকা অত্যন্ত জরুরী।

১৩. নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ - সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রশাসনিক ও সামাজিক নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে তাদের দেশের যোগ্য সেবক হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

১৪. সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ত্বরান্বিত করা - অনেক সময় গ্রামের মানুষ সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানেন না। আবার অনেক জায়গায় সরকারী প্রকল্পে তিনি রাজনীতির শিকার হয়ে বঞ্চিত হতে পারেন। সংগঠন বাড়ি বাড়ি তথ্য পৌঁছে দিয়ে সাহায্য করতে পারে এবং বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার অধিকার পাইয়ে দিতে পারে। কারণ একতাই বল।

১৫. কুসংস্কার দূরীকরণ - সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে এই সংগঠন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে।

১৬. আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচয় - ভারত ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে থাকা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এই সম্প্রদায়কে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা সম্ভব। তাতে সম্প্রদায়ের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন প্রজন্ম অনুপ্রেরণা পাবে।

১৭. জমি ও সম্পত্তি রক্ষা - গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের জমি দখল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা। সেক্ষেত্রে সংগঠনের সামাজিক চাপ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

১৮. স্বাস্থ্যসেবায় সহযোগিতা - বড় বড় চিকিৎসকদের নিয়ে হেলথ ক্যাম্প করা বা সম্প্রদায়ের কোনো অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য আর্থিক তহবিল গঠন করা সংগঠনের মাধ্যমে সম্ভব।

১৯. প্রবীণদের সুরক্ষা - সমাজের প্রবীণ ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সঙ্গ দেওয়ার জন্য সংগঠন একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারে।

২০. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মঞ্চ - আজ আপনি সংগঠিত হলে আপনার সন্তান একটি শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো পাবে, যেখানে সে মাথা উঁচু করে নিজের পরিচয় দিতে পারবে। আপনি দেরিতে যুক্ত হলে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম পিছিয়ে পড়বে। আগে যুক্ত হলে আগে জায়গা পাবেন ও আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে, পরবর্তী প্রজন্মকেও তৈরি করতে পারবেন।

২১. বিভিন্ন শংসাপত্র প্রাপ্তিতে সহায়তা - অনেকে প্রয়োজনীয় নথির অভাবে বা সরকারি জটিলতায় বিভিন্ন শংসাপত্র পান না। এই সংগঠন সঠিক নথিপত্র জোগাড়

করতে সাহায্য করতে পারে। সংগঠিত শক্তি সরকারি দপ্তরে চাপ সৃষ্টি করতে ও দাবী আদায়ে সাহায্য করে।

২২. মেধা ও প্রতিভার স্বীকৃতি - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের কৃতি সন্তান—সে শিক্ষায় হোক বা খেলাধুলায়—তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করলে সামাজিক অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পায় যা একমাত্র সংগঠনের মাধ্যমে করা সম্ভব।

২৩. গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন - যেসব এলাকায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষের বাস বেশি, সেখানে রাস্তাঘাট, পানীয় জল বা আলোর ব্যবস্থার জন্য সরকারের ওপর সম্মিলিত চাপ সৃষ্টি করা ও দাবী আদায় সম্ভব।

২৪. আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা - সংগঠিত সমাজ থাকলে কোনো অশুভ শক্তি বা গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের কোনো দুর্বল সদস্যের ওপর অন্যায় করার সাহস পায় না। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

২৫. নারীর ক্ষমতায়ন - সংগঠনের মহিলা শাখার মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self-help Group) তৈরি করা এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করা যায়। নারীর অধিকার রক্ষায় সংগঠন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কোনও নারী লাঞ্ছিত হলে সংগঠন প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে তার পাশে থাকতে পারে। সংগঠিত হলে কোনও অশুভ শক্তি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নারীদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

২৬. ইতিহাস বিকৃতি রোধ - অনেক সময় ইতিহাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান এড়িয়ে যাওয়া হয়। সংগঠন ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে সঠিক তথ্য তুলে ধরে পাঠ্যপুস্তকে বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার নিশ্চিত করে। সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

২৭. জেলা ও রাজ্য স্তরে নেটওয়ার্কিং - একজন সদস্য হিসেবে আপনি সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সফল মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখার সুযোগ পান, যা ব্যক্তিগত উন্নতির সহায়ক।

২৮. আবাসন ও ধরমশালা নির্মাণ - তীর্থস্থান বা বড় শহরগুলোতে সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধরমশালা বা গেস্ট হাউস থাকলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও থাকা অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী হয় যা এই সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে।

২৯. কুটির শিল্পের প্রচার - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত। সংগঠন প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণে সাহায্য করতে পারে।

৩০. রক্তদান ও জরুরি সেবা - সংগঠনের নিজস্ব ব্লাড ডোনার গ্রুপ বা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা থাকলে আপদকালীন সময়ে সম্প্রদায়ের মানুষ দ্রুত পরিষেবা পেতে পারে। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করলে এই পরিষেবা পরিকাঠামো দ্রুত গড়ে তোলা ও পরিষেবা প্রদান সম্ভব।

৩১. আইটি ও ডিজিটাল সাক্ষরতা - বর্তমান যুগে পিছিয়ে পড়া মানুষদের ডিজিটাল দুনিয়ার সাথে পরিচিত করতে সংগঠন বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে।

৩২. কৃষিঋণ ও আধুনিক চাষাবাদ - কৃষিজীবী সদস্যদের জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সরকারি কৃষিঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়াটি সংগঠন সহজতর করে দেয়। সংগঠন পিছিয়ে পড়া মানুষের ভরসার জায়গা হতে পারে।

৩৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা - অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বৃহত্তর আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠনের একটি অন্যতম লক্ষ্য। আপনি সংগঠিত হলে তবেই আপনি অন্য সম্প্রদায়ের থেকে সম্মান পাবেন।

৩৪. ভূমিহীনদের অধিকার রক্ষা - যাদের নিজস্ব জমি নেই, সরকারের কাছ থেকে পাট্টা বা খাস জমি পাওয়ার লড়াইয়ে সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। অন্যদিকে যারা ভূমি হারানোর ভয়ে আছেন তারা সংগঠিত হয়ে তা রক্ষা করতে পারবেন।

৩৫. মাদকমুক্ত সমাজ গঠন - যুবসমাজকে নেশা ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করতে সংগঠনের নজরদারি ও কাউন্সিলিং অত্যন্ত কার্যকর।

৩৬. নিজস্ব সংবাদমাধ্যম বা মুখপত্র - সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া ও খবর প্রচারের জন্য নিজস্ব পত্রিকা বা ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করা সহজ হয় যদি সবাই সংগঠিত থাকে।

৩৮. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চর্চা - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব মন্দির বা উপাসনা স্থল সংস্কার এবং ধর্মীয় আচারগুলো বিধি মোতাবেক পালন নিশ্চিত করা।

৩৯. পরিবেশ সচেতনতা - সংগঠন বৃক্ষরোপণ বা দূষণ রোধের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে পারে। আপনি সংগঠনে যুক্ত হয়ে আধুনিক

যুগের একটি বড় দায়িত্ব পালনের শরিক হতে পারবেন।

৪০. উত্তরসূরিদের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি - আপনি যদি আজ সংগঠনের অংশ হন, তবেই আপনার পরবর্তী প্রজন্ম একটি সুশৃঙ্খল এবং সচেতন সমাজ উপহার পাবে।

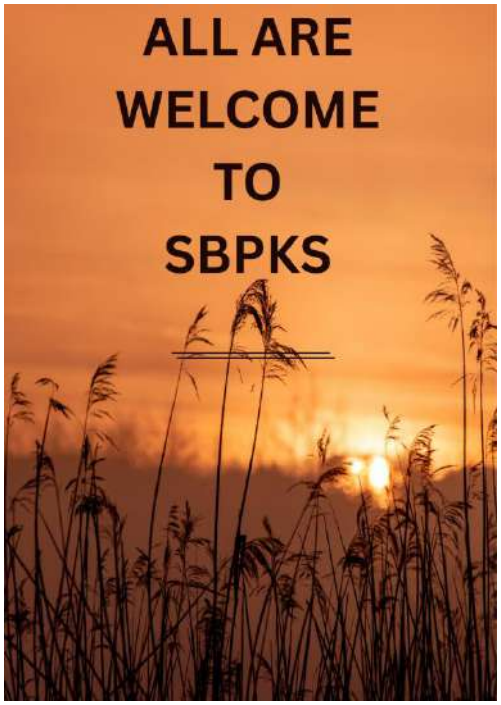
ব্যক্তিগত উন্নতি যখন সামাজিক উন্নতির সাথে যুক্ত হয়, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। তাই বিচ্ছিন্ন না থেকে সম্মিলিত শক্তি হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। "একতাই বল"—এই নীতিতে বিশ্বাস করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের উচিত এই মহৎ সংগঠনে যুক্ত হওয়া। এটি কেবল আপনার ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং আপনার উত্তরসূরিদের জন্য একটি সুন্দর ও সম্মানজনক সমাজ রেখে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্য হিসাবে আপনি **নিজ সম্প্রদায়ের জন্য কর্তব্য পালনের** সুযোগ পাবেন। **'কলি যুগে সঙ্ঘ শক্তি'** - এমন একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এর অর্থ হল বর্তমানে চলমান কলিযুগে যৌথভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করলে তা একটি শক্তি হিসাবে কাজ করবে এবং সেখানে সাফল্য নিশ্চিত। তাই সাফল্যের জন্য সঙ্ঘশক্তি দরকার। তাই প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা উচিৎ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য তৈরি সংগঠনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যোগ না দিলে কারা যোগ দেবে ? আপনি কি অন্য কারুর সংগঠনে যোগ দিচ্ছেন? নিশ্চয় না। তাহলে আপনার সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংগঠনে আপনাকেই যোগ দিতে হবে যাতে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়। অনেকে মনে করেন নিজ সম্প্রদায়ের সংগঠন মানে একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। আসলে তিনি একটি সংকীর্ণ মানসিকতার মানুষ বলেই এমন ধারণা পোষণ করেন। আমরা সকলে দেশের জন্য কাজ করলেও আমরা কেউ নিজ পরিবারকে ভুলি না। তেমনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় হল আমাদের নিজস্ব পরিবার। দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারভুক্ত। ভারতের রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি অসংখ্য পিলার বা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমন একটি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে থাকে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় এই অসংখ্য পিলার বা স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম পিলার বা স্তম্ভ। আমরা আমাদের পিলার বা স্তম্ভকে মজবুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি - তাই এটি কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয় নয় বরং দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষার একটি প্রচেষ্টা। প্রত্যেকে নিজ নিজ

স্তম্ভের দায়িত্ব নিলে দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নত হবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করবে। আপনি অসংগঠিত ও দুর্বল হলে আপনাকে অন্যরা অবমাননা করতে পারে কিন্তু সংগঠিত হলে সে সম্ভাবনা একেবারে থাকবে না। বরং আপনি সংগঠিত হলে কোনও অন্যায় বা অবমাননা হলে তার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে পারবেন। নিজ সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক অবদান এবং মাহাত্ম্য একমাত্র সংগঠনের মাধ্যমে জানা ও রক্ষা করা সম্ভব। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে যোগদান করা উচিৎ।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

সম্পাদক (পত্রিকা)

শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল



পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মনে রাখুন

- ভারত আমাদের মাতৃভূমি, তাই ভারতকে রক্ষা করা আমদের প্রাথমিক কর্তব্য।
- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা চন্দ্রবংশীয়।
- মুসলিম ও খৃষ্টানরা ধর্মান্তরকরণ ও লুণ্ঠনের জন্যই অর্থাৎ অসৎ উদ্দেশ্যেই ভারতে এসেছিল।
- নমশূদ্র তপসিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জন্য ৫৮.২৯% হিন্দু (যার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়) অধ্যুষিত খুলনা জেলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়।
- যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের দলিত-মুসলিম ঐক্যের স্বপ্ন আজও যারা দেখেন তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষতি করে চলেছেন।
- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্বারা সংকটে পড়লে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক চেষ্টায় সংকটমুক্ত হন।
- ১৮৭১-এর সেন্সাসের আগে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিম্নবর্ণের তালিকাভুক্ত ছিল না।
- মুসলিমদের দ্বারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সবচেয়ে বেশী জমি হারিয়েছে।
- বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ কাঠামোর ভিত নড়বড়ে করে দেয়। অনুপ্রবেশকারীদের লাভবান করে।
- ১৯৪১ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৮.৪৩%। ২০১১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৫.৫৭%।
- মূলধারার রাজনীতি না করার কারণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পরোক্ষভাবে অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করে চলেছে।
- পৌণ্ড্র হলে তিনি বৌদ্ধ নন, বৌদ্ধ হলে তিনি পৌণ্ড্র নন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল

পণ্ডিতগণের মতে, সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক পর্বে পূর্ব ভারতে **'পুণ্ড্রদেশ'** এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। **পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়।** মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায়, ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে **'পুডনগল'** কথাটি আছে যার সংস্কৃত অর্থ **পুণ্ড্রনগর**। পৌণ্ড্র সভ্যতার বিকাশ প্রায় সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসই পূর্ব ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়।[১]

'পৌণ্ড্র' শব্দের অর্থ হল তিলক বা ফোঁটা। অনুমান করা হয় ভারতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে পৌণ্ড্ররা কপালে তিলক বা ফোঁটা দিত। তাদের পেশা ছিল বৈদিক রীতি অনুসারে ক্ষত্রিয়; তাই তাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ভারতীয় আর্য।

ভারতের জাতীয় মহাকাব্য **মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, হরিবংশ, মনু সংহিতা, মৎস্য পুরাণ, কুলতন্ত্র** ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখিত আছে, মহারাজ বলীর পুত্রগণ যথা- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম, পূর্ব ভারতের পাঁচটি স্থানের শাসক ছিলেন। সেইসূত্রে **পৌণ্ড্ররা চন্দ্র বংশীয়।** চন্দ্রদেব বা সোমদেবের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র মহাবীর্য্য, তারপর বংশানুক্রম এইরকম - প্রতিষ্ঠান - প্রবীর - মনসা - অভয়দ - সুধন্বা - সুবাহু - রৌদ্রাশ্ব - কক্ষে - সভানর - কালানল - সৃঞ্জয় - পুরঞ্জয় - জন্মেজয় - মহামণি - মহামণা - তিতিক্ষু - উষদ্রথ - ফেণ - সুতপা - বলি। মহারাজ বলির পাঁচপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম। ভাগবত পুরাণ থেকে এই বংশ তালিকা পাওয়া যায়। **অনেকে মহারাজ বলিকে অসুররাজ বলি ভাবেন যা সঠিক নয়।** মহারাজ পৌণ্ড্র প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পৌণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রবর্ধন। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় ছিলেন তাই বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামধারণ করা হয়েছে।

মহাভারতের সভা পর্বে ১৩ অধ্যায়ে **মহারাজ পৌণ্ড্র বাসুদেব** সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় রাজা **বাসুদেবের** বংশধর।[২] রাজা বাসুদেব কৌরব পক্ষের হয়ে মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মহামাত্রকে পাঠান। তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা **পুণ্ড্রবর্ধন** নামে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।[৩] পৌণ্ড্র রাজা বাসুদেবের ভাই কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করে **'মহামুনি কপিল'** নামে পরিচিতি লাভ করেন। মহামুনি কপিল

সাগর দ্বীপে বসবাস করতেন এবং এখানেই তিনি **'সাংখ্য দর্শন'** রচনা করেছিলেন।[৪] **গৌতম বুদ্ধ** বুদ্ধত্ব লাভের পর পুণ্ড্র দেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য। এই সময় পুণ্ড্র রাজ্য সারা বঙ্গদেশ জুড়ে বিরাজিত ছিল ও উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করেছিল।[৫] **ঐতেরেয় আরন্যকে পুণ্ড্র জনজাতিদের বিশ্বামিত্রের বংশধর বলা হয়েছে**। বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে পুণ্ড্রজনদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। মহাভারতের সভা পর্বেও পুণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। **মনে করা হয়** পুণ্ড্র পরিবর্তিত হয়ে 'পৌণ্ড্র' হয়েছে, যেমন 'ব্রাহ্মণ' 'বামন' ও 'কায়স্থ' 'কায়েত' হয়েছে।[৬]

অনেকে মনে করেন পৌণ্ড্ররা সৎশূদ্র। পৌণ্ড্ররা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং একাদশ শতকে তারা যখন হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে তখন তাদের নাম হয় সৎশূদ্র। H. H. Risley তাঁর "People of India" গ্রন্থে বলেছেন, "পৌণ্ড্ররা আচরণ ও অভ্যাসে প্রায় সৎশূদ্র এবং তারা তদের দৈনন্দিন ব্যবহারে কোন নীচতা দেখায়নি।[৭] E. A Gait পৌণ্ড্রদের বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের কথা বলেছেন।[৮] **ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানার মতে**, সেনদের রাজত্বকালে বর্ণ কৌলীন্য প্রকট আকার ধারণ করে এবং তারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়। এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যক্তি গৌড়বঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করে। তাই সুন্দরবনে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা অনেক বেশী।[৯] **ধনঞ্জয় দাসের** মতে, 'একমাত্র বসিরহাট মহকুমার অধিবাসীগণ প্রাচীনকাল থেকে এই স্থানে বাস করিতেছে'(বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস)।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৌণ্ড্র জনসমাজের মধ্যে সামাজিক উত্তরণের জন্য এক আন্দোলন সূচিত হয়।[১১] এই আন্দোলনকে **'Self Respesct Movement' বা 'আত্ম মর্যাদা আন্দোলন'** বলা হয়।[১২] এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন **বেণী মাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ** প্রমুখ। ১৯০১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের মধ্যে যারা চাষ করত তাদের **পদ্মরাজ বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়** বলা হয়। পৌণ্ড্রদের সামাজিক মর্যাদার সরকার কর্তৃক অবনমন ঘটে। এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের আত্ম মর্যাদা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট **রাইচরণ সরদার**। বেণী মাধব হালদার ও রাইচরণ সরদার ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে জনগণনার রিপোর্টে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আবেদন পত্রটি গৃহীত হয়নি। [১৩]

১৯২১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রদের নিম্নবর্ণের তালিকাভুক্ত করা হয়। এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ** প্রমুখ নিম্নবর্ণের তালিকা থেকে পৌণ্ড্রদের বাদ দিতে ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্ট W. H. Tomson-এর কাছে ডেপুটেশন সহকারে একটি স্মারক লিপি পেশ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শব্দটি প্রয়োগের দাবী জানান। [১৪] **"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ"** ও **'A Short History and Ethnology'** নামে দুটি বইও সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্টকে দেওয়া হয় যাতে পৌণ্ড্রদের উচ্চ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।[১৫] কিন্তু সরকারের ষড়যন্ত্রে এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনাতেও সরকারের একই অবস্থান বজায় থাকে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আগেই **'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি'** ও **'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমিতি'** নামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমকালীন সমস্যা তুলে ধরার জন্য **'প্রতিজ্ঞা'**(১৯১৮), **'ক্ষত্রিয়'**(১৯২০) ও **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার'** (১৯২৪) নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৬]

এই সময় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের নেতারা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রসারে জোর দেন। পিতামাতা যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাঁর আবেদন জানান। ১৯৩২ সালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা একটি সম্মেলনের মাধ্যমে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে,

১) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পবিত্র পৈতা ধারণ করবে এবং দ্বাদশাশৌচ পালন করবে।

২) সকল শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করতে হবে।

৩) প্রত্যেক পরিবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষা তহবিলে দান করবেন।

৪) **সমাজ দর্পণ** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।[১৭]

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা মহাত্মা **রাইচরণ সরদার** প্রস্তাবিত তপশীলি তালিকা থেকে পৌণ্ড্রদের বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে একটি মেমরেন্ডাম প্রদান করেন। তিনি সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন এবং বলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বাংলার হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, সুতরাং সাহায্যের প্রয়োজন নেই।[১৮] এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি** বাংলার নিম্নবর্ণের যে তালিকা তৈরি করে তাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উল্লেখ ছিল না।[১৯] ১৮১০ সালে **পুরীর জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ,** যে জাতির মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, তাদের তালিকা তৈরি করেন, তাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[২০] ১৯১১ সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অন্যান্য বঞ্চিত জাতিদের

অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বলা হয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ব্যবহার ও রীতিনীতি নিম্নবর্ণের মত নয়।[২১] এমনকি এই সময়ের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিম্নবর্ণের মনে করত না।[২২] উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই সময় উচ্চবর্ণের সরকারি কর্মচারীদের কাছে সরকার নিম্নবর্ণের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য চাইলে সেখানে তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নাম দেননি।[২৩] মিসেস অ্যানি বেসান্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবিকে সমর্থন করেন।

এখানে ইংরেজদের বিভেদের রাজনীতির কাছে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতাদের দাবি মান্যতা পায়নি। আসলে ইংরেজরা বর্ণ হিন্দুদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দূরে সরিয়ে বর্ণ হিন্দুদের দুর্বল করতে চেয়েছিল যাতে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন মজবুত হতে না পারে। কারন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা সবসময় মূল ধারার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের পাশে থেকেছেন। এছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবস্থান ছিল কলিকাতার নিকটবর্তী। ফলে জাতীয় নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তারাই বেশি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। তাই ইংরেজরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য নিম্ন বর্ণের তালিকা ভুক্ত করে।

অন্যদিকে **নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ** তারা বরাবর স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছেন, কারন তারা মনে করতেন ওটা বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন।[২৪] পূর্ববঙ্গের সাহারাও একই কারণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।[২৫] এমন কি মাহিষ্য সমাজও ইংরেজ রাজত্বকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন।[২৬]

কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা ব্যতিক্রম ছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা **মহেন্দ্রনাথ করণ** পড়াশোনা উপেক্ষা করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। এরফলে তিনি পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন এবং তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা ৯ বছর পরে প্রাইভেটে দিয়ে পাস করেন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কলম ধরে **'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'** নামে বই ও অসংখ্য স্বদেশী কবিতা রচনা করেন এবং নানা সামাজিক উন্নয়ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[২৭] আর একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **রাজেন্দ্রনাথ সারকার** ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় স্বার্থে নির্বাচনে একজনকে সমর্থন করতে বললে তিনি তাকে সমর্থন করেন।[২৮] আর একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বদেশী নেতা ছিলেন **গৌরহরি বিশ্বাস**। তিনি লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।

গৌরবাবুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় **জীবন মণ্ডল** ও **বীরুপদ মণ্ডল** প্রমুখ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিল্পী স্বদেশী গান গেয়ে সাধারন মানুষকে জাগিয়ে তোলেন।[২৯] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী **স্বর্ণময়ী মণ্ডল, মোক্ষদা নস্কর, অষ্টমী ঢালী** প্রমুখ কারাবরণ করেন। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় নেতা **অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর** স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান।[৩০] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষাদরদী **ধ্রুবচাঁদ হালদার** ও **ভূষণ চন্দ্র নস্কর**ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন।[৩১] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় **পতিরাম রায়** স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর আস্থা অর্জন করেন।[৩২] পতিরাম রায় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে বসিরহাট লোক সভা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিভাজন ও শাসনের সিদ্ধান্তই বলবত থাকে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সার্বিক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং অদ্যাবধি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তপশিলি তালিকাভুক্ত আছেন।

স্বাধীন ভারতেও বিভিন্ন সরকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রতি সুবিচার করেনি। সরকারী নথিপত্রে পৌণ্ড্রের বদলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শব্দ ব্যবহার করলে তবেই এই সম্প্রদায়কে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দেওয়া হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করানোর জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঐক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের পতাকার তলে সংগঠিত হোন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

তথ্যসূত্রঃ

1. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৭
2. E. Gait, —Social Precedence of Castes,‖ Census of India 1901 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), 372; Gait, — ppendix I‖, Census of India 1901, 119.
3. ঐ
4. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৪৯।
5. ঐ পৃষ্ঠা - ৩৪।
6. Soumen Biswas - Aspects of the Socio-Political History of a Scheduled Caste of Bengal: A Case Study of the Pods (1872–1947) PhD Thesis, page-4.
7. H. H. Risley, The People of India (Calcutta and Simla: William Clowes and Sons, 1915),page- 216.
8. ঐ
9. মনীন্দ্রনাথ জানা - সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, দীপালী বুক হাউজ, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা-৪৬।
10. ঐ
11. H. Beverley, Census of Bengal (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), 188.

12. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা- ১৫৭-১৫৮।
13. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৮১।
14. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৯-২০।
15. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৫।
16. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৭-৮
17. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৯।
18. Raicharan Sardar, Deener Atmokahini Ba Satya-Pariksha, cited in Naskar, Poundra Manisha, Vol. 1, 335–336.
19. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
20. Section 7 of Regulation IV of 1809, and again in Regulation XI of 1810, cited in O'Malley, Census of India 1911, Vol. V, P. 229.
21. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
22. সনৎ কুমার নস্কর - পৌণ্ড্র মনীষা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৪-৩৭৬।
23. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ
24. Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj, Bengal, 1872-1937 (Kolkata: K. P. Bagchi & Company, 1990),Page-5.
25. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় - ঐ, পৃষ্ঠা-১৫২।
26. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ২০২।
27. Dhurjati Naskar, Poundra Kshatriya Kulatilak (South 24 Parganas:PoundraKshatriya UnnayonParishad,2008), P-59.
28. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১।
29. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৬৯।
30. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭১।
31. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭৩।
32. Soumen Biswas- ঐ, পৃষ্ঠা- ২০৬।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মনে রাখুন

- **বর্তমান সল্টলেক ও বিধাননগর শহর যেখানে গড়ে উঠেছে সেই এলাকার জমি মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা হেমচন্দ্র নস্কর বিধানচন্দ্র রায়কে দান করেন উপনগরী নির্মাণের জন্য।**
- **ব্রহ্মচারী ভোলানাথ সুন্দরবন এলাকার উন্নয়নের জন্য সারাজীবন অতিবাহিত করেন।**
- **রাজা দক্ষিণ রায় ইসলামের আগ্রাসন প্রতিরোধ করেন বলেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা হিন্দু আছে।**
- **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে গেছে বলেই তারা আজ পিছিয়ে পড়েছে।**
- **ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে নয়, ব্রাহ্মণদের মত যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সমকক্ষ হতে হবে।**
- **মহাত্মা রাইচরণ সরদার কখনও সনাতন হিন্দু মূলধারা থেকে বিচ্যুত হন নি। আমরাও যেন বিচ্যুত না হই।**
- **ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তপশিলি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অবদান সব থেকে বেশী।**
- **সব ব্যাপারে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা চারিত্রিক দুর্বলতার লক্ষণ। সামান্য হলেও নিজের সিদ্ধান্তে দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য কিছু করা উচিত।**
- **নিজ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দল না থাকার কারণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচনে দলগুলি নিজেদের সুবিধা মত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। সেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মতামতের কোনও গুরুত্ব থাকছে না।**
- **মুসলিমদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল, তাই তাদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনলে জাতীয় সংহতি মজবুত হবে, ভারত শক্তিশালী হবে।**

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। ভারতের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি ও তাদেরকে একই সংগঠনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা।

২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ইতিহাসবোধ ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করা ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।

৩। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি করা।

৪। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে "Payback to your Society"-এর ধারণা জাগ্রত করা।

৫। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনা বৃদ্ধির জন্য মেলার আয়োজন করা।

৬। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ আরও বৃদ্ধি করা।

৭। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের ধারণা জাগ্রত ও বর্ধিত করা।

৮। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আধুনিক সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সচেতন করা। জাতপাত ও ধর্মের ব্যবধান মুছে ফেলা।

৯। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যুবদের নিয়ে **'পৌণ্ড্র সেনা'** গঠন এবং নারীদের নিয়ে একটি **'দেবী বাহিনী'** গঠন করা।

১০। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও আলোচনা সভাতে সামিল করা।

১১। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদর্শন।

১২। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে এনে সাধ্যমত সমাধান বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

সবিনয় নিবেদন

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ-এর **সবিনয় নিবেদন বিভাগে** চিঠি/পত্র প্রকাশিত হবে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক তাঁর মতামত জানাতে পারবেন। মতামত সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া চাই। এছাড়া পাঠক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক বা অন্য যে কোনও বিষয়ে এই বিভাগে মতামত জানাতে পারেন। লেখা ইমেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ-এ পাঠাতে হবে। ইমেলঃ poundrakshatriyadarpan@gmail.com
Whatsapp No: 9800296648
লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

- পত্রিকা সম্পাদক

ঐতিহাসিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব



পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ঐতিহ্যে রাজা দক্ষিণরায়

- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

বঙ্গীয় বদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তিক জনপদ, যা লোকগাঁথায় 'আঠারো ভাটির দেশ' নামে পরিচিত, সেখানে রাজা দক্ষিণরায়ের উপস্থিতি কেবল একটি লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একটি সুপ্রাচীন, বীরত্বগাথা সমৃদ্ধ এবং লড়াকু জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষার নিরন্তর সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল। বিশেষত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসে রাজা দক্ষিণরায় একজন ঐতিহাসিক বীর, সমরকুশলী রাজন্য এবং বিজাতীয় আগ্রাসন থেকে নিজ ভূমি ও ধর্ম রক্ষা করার এক অবিস্মরণীয় রক্ষাকর্তা হিসেবে পরিগণিত। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদি ইতিহাস, তাদের সামাজিক বিবর্তনের ধারা এবং মধ্যযুগীয় বাংলার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণরায়ের অবস্থান পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কেবল বাঘের নিয়ন্ত্রক কোনো দৈব সত্তা নন, বরং তিনি ছিলেন ইসলামী শাসন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দেশীয় প্রাচীর।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বংশগতি ও তাদের বীরত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা মূলত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের বংশধর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে যে ধারাবাহিক ইসলামী আগ্রাসন শুরু হয়, তার ফলে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এই পরিবর্তনের জোয়ারে যখন উত্তর ও মধ্যবঙ্গের অনেক জনপদ বিধ্বস্ত হচ্ছিল, তখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি বিশাল অংশ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে দক্ষিণবঙ্গের দুর্গম অরণ্য ও সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই প্রতিকূল পরিবেশে তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন রাজা দক্ষিণরায়, যিনি ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে যশোরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি এবং

পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের সার্বভৌম শাসকে পরিণত হন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ইতিহাস ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে, মহারাজা পুণ্ড্র, যার নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় পুণ্ড্রবর্ধন। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন রাজা বাসুদেব, যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত এই রাজন্যবর্গের বংশধর হিসেবে নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় বহন করে আসছে। তাদের বীরত্ব এবং প্রশাসনিক দক্ষতা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরের (বর্তমান মহাস্থানগড়) ধ্বংসাবশেষ এবং শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয়।

ঐতিহাসিক উৎস	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দের পরিচয় ও মর্যাদা	প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণ
মহাভারত ও পুরাণ	ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ	রাজা বাসুদেবের বংশধর এবং পুণ্ড্রবর্ধনের শাসক
বায়ু ও মৎস্য পুরাণ	ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত	প্রাচীন ভারতের সামরিক ও প্রশাসনিক
		কার্যে লিপ্ত জনগোষ্ঠী
ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. রিসলে	উচ্চ সামাজিক আচরণ	দৈনন্দিন জীবনযাপনে আভিজাত্য ও শৌর্য প্রকাশ
আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা	নগর নির্মাতা	মহাস্থানগড় বা পুণ্ড্রনগরের উন্নত নাগরিক সভ্যতার স্থপতি

মধ্যযুগে সেন রাজাদের শাসনামলে বর্ণপ্রথার কঠোরতা এবং পরবর্তীকালে তুর্কি আক্রমণের ফলে এই জনগোষ্ঠীর ওপর এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয় । বিশেষ করে ইসলামী শাসনামলে করের বোঝা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের হাত থেকে বাঁচতে তারা দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এই সংগ্রাম কেবল ভৌগোলিক স্থান রক্ষা ছিল না, বরং এটি ছিল স্বধর্ম এবং নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার এক সচেতন রাজনৈতিক কৌশল।

লোকসংস্কৃতি এবং 'রায়মঙ্গল' কাব্যের বিবরণে দক্ষিণরায়কে এক অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে চিত্রিত করা হলেও, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তিনি ছিলেন যশোরের রাজা মুকুট রায়ের সুযোগ্য সেনাপতি এবং সুন্দরবন অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী ভূস্বামী। তিনি মূলত রাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্বসূরি কোনো এক বীর পুরুষ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। দক্ষিণরায়ের মূর্তি এবং তার সামরিক সজ্জা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি একজন আধুনিক রণকৌশলী যোদ্ধা ছিলেন। তাকে সচরাচর একজন পূর্ণাঙ্গ যোদ্ধার বেশে দেখা যায়, যার হাতে টাঙ্গি, ঢাল, তলোয়ার এবং পিঠে তীর-ধনুক থাকে।

বিস্ময়করভাবে, দক্ষিণরায়ের অনেক মূর্তিতে তার কাঁধে বন্দুক বা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রও দৃশ্যমান, যা নির্দেশ করে যে তিনি সময়ের সাথে তার সামরিক বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করেছিলেন এবং বহিরাগত শত্রুদের মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকতেন। তার এই সামরিক সজ্জা কেবল বনের শ্বাপদ শিকারের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল সুলতানি আগ্রাসন থেকে নিজ প্রজাদের রক্ষা করার জন্য একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীর প্রতীক।

ষোড়শ শতকের তথ্যানুসারে, দক্ষিণরায়ের রাজত্বের সীমা ছিল উত্তরে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর (কাকদ্বীপ), পশ্চিমে ঘাটাল এবং পূর্বে বাকলা জেলা (বর্তমান বাংলাদেশ)। এই বিশাল ভূখণ্ডের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা তাকে সেই সময়ের একজন প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত করেছিল। তার পিতা দণ্ডবক্ষ মুনি এবং মাতা রণনিপুণা নারায়ণী দেবী তাকে বীরত্বের উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন ।

রাজত্বের সীমা	ভৌগোলিক অঞ্চল	তাৎপর্য
উত্তর সীমা	ভাগীরথী নদী	গাঙ্গেয় সমতলের সঙ্গে সংযোগ ও বাণিজ্যের পথ
দক্ষিণ সীমা	কাকদ্বীপ ও সাগর দ্বীপ	সামুদ্রিক বন্দর ও বহিরাগত নৌ-আক্রমণ প্রতিরোধের কেন্দ্র
পশ্চিম সীমা	ঘাটাল	মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ
পূর্ব সীমা	বাকলা ও যশোর	পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রশাসনিক ও সামরিক ঘাঁটি

ইসলামী আগ্রাসন ও দক্ষিণরায়ের প্রতিরোধ সংগ্রাম

বাংলার ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া ইসলামী বিজয় কেবল এক রাজবংশের পতন ঘটিয়ে অন্য রাজবংশের উত্থান ছিল না, বরং এটি ছিল এক গভীর সাংস্কৃতিক অভিঘাত। সুলতানি আমলের অনেক ঐতিহাসিকই মন্দির ধ্বংস এবং গণ-ধর্মান্তরকরণের ঘটনা নথিভুক্ত করেছেন। এই সংকটকালে সুন্দরবন অঞ্চলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের প্রধান রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন রাজা দক্ষিণরায়।

সুন্দরবনের লোকগাঁথায় পীর বড় খাঁ গাজীর সাথে দক্ষিণরায়ের দীর্ঘ যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ কেবল দুজন ব্যক্তির ক্ষমতার লড়াই ছিল না, বরং তা ছিল সুপ্রাচীন স্থানীয় সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আসা নতুন ধর্মের এক সংঘাত। 'রায়মঙ্গল' এবং 'গাজীমঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে যে, গাজী সাহেব যখন তার অনুসারী বাহিনী নিয়ে হিন্দু প্রধান জনপদগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করতে আসেন, তখন দক্ষিণরায় তার বিশাল আঞ্চলিক বাহিনী নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গাজী সাহেব তার অলৌকিক প্রচারণার মাধ্যমে এবং কৌশলে স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা অনেক সময় 'গাজীর গান' বা পুথি সাহিত্যে হিন্দুদের পরাজয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এই যে, দক্ষিণরায়ের বীরত্বের কারণে ইসলামী বাহিনী এই অঞ্চলে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়, যেখানে দক্ষিণরায় তার নিজস্ব প্রভাব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন। এই সন্ধিটি ছিল দক্ষিণরায়ের এক অনন্য কূটনৈতিক বিজয়, যার মাধ্যমে তিনি তার অধীনস্থ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রজাদের ওপর থেকে বাধ্যতামূলক জিজিয়া কর এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের চাপ সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা রক্ষা

সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিজীবী ও বনজীবী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যখন জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপন করছিল, তখন সুলতানি শাসকদের খাজনার জুলুম এবং বহিরাগত লুটেরাদের আক্রমণ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। দক্ষিণরায় কেবল সামরিক রক্ষাকর্তাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন এক সামাজিক নেতা, যিনি বিজাতীয় শাসনের অধীনেও হিন্দু ধর্মীয় অনুশাসন ও ক্ষত্রিয় মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছিলেন। তার পূজা এবং তাকে কেন্দ্র করে পালিত উৎসবগুলো মূলত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি

প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করত, যা তাদের মধ্যে ইসলামী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন প্রতিরোধ চেতনা তৈরি করেছিল।

সুন্দরবনের লোককাহিনীতে বনবিবির সাথে দক্ষিণরায়ের বিরোধের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বনবিবিকে মক্কা থেকে আগত এক দৈব নারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে ইসলামি প্রভাব বিস্তার করা। অন্যদিকে দক্ষিণরায় ছিলেন এই ভূমির ভূমিপুত্র এবং প্রকৃত অধিপতি। 'বনবিবির জহুরানামা' অনুসারে, বনবিবি ও তার ভাই শাহ জঙ্গলি যখন সুন্দরবনে এসে আজান প্রদান করেন, তখন দক্ষিণরায় তাকে তার সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই যুদ্ধে দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণী দেবী নিজে এক বিশাল ভূত-প্রেত ও লৌকিক যোদ্ধাদের বাহিনী নিয়ে বনবিবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই বর্ণনাটি রূপক হলেও এটি তৎকালীন স্থানীয় হিন্দু রাজবংশগুলোর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ইঙ্গিত দেয়, যা ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম। শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতা হয় যেখানে সুন্দরবনের একটি অংশ বনবিবির প্রভাবে থাকলেও, গভীর অরণ্য এবং স্থানীয় মানুষের হৃদয়ে দক্ষিণরায়ের শাসন অটুট থাকে। এই সমঝোতার ফলেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তাদের সনাতন ধর্ম পালন করার সুযোগ পায় এবং আজও তারা দক্ষিণরায়ের পূজা দিয়েই জঙ্গলে প্রবেশ করে, যা প্রচ্ছন্নভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বিজয়কেই নির্দেশ করে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মমর্যাদা আন্দোলন ও দক্ষিণরায়ের ঐতিহ্য

উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে যে 'আত্মমর্যাদা আন্দোলন' বা 'Self-Respect Movement' শুরু হয়, তার মূলে ছিল তাদের হারানো ক্ষত্রিয় গৌরব পুনরুদ্ধার করা। এই আন্দোলনে মহাত্মা রাইচরণ সর্দার এবং বেণীমাধব হালদারের মতো নেতারা নেতৃত্ব দেন। তারা সমাজকে বুঝিয়েছিলেন যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কোনো নিম্নবর্ণের হিন্দু নয়, বরং তারা সুপ্রাচীন রাজন্যবর্গের বংশধর যারা বিজাতীয় শাসনামলে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল।

এই আন্দোলনের সময় দক্ষিণরায় এক নতুন সাংস্কৃতিক প্রতীকে পরিণত হন। তাকে কেবল একজন বাঘের দেবতা হিসেবে নয়, বরং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদি পূর্বপুরুষ এবং সাহসিকতার আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়। দক্ষিণরায় পূজা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য

প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। ১৯৩২ সালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতাদের সম্মেলনে যে সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়েছিল, তাতে শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি সামরিক ঐতিহ্যের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার অনুপ্রেরণা ছিলেন স্বয়ং রাজা দক্ষিণরায়।

দক্ষিণরায়ের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে **'জাতাল উৎসব'** পালিত হয়, যেখানে বীরত্বব্যঞ্জক গান এবং পালাগান পরিবেশিত হয়। এই গানগুলোতে দক্ষিণরায়ের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সাহসিকতা ও প্রতিরোধের বীজ বপন করা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অনেক গ্রামে দক্ষিণরায়ের থানে বা মন্দিরে অস্ত্র পূজা করার রীতি আজও টিকে আছে, যা তাদের প্রাচীন সামরিক ঐতিহ্যের একটি জীবন্ত প্রমাণ। দক্ষিণরায়ের মূর্তিতে যে ধুতি, জ্যাকেট এবং বুট জুতো পরিহিত রূপ দেখা যায়, তা মূলত একজন স্বাধীনচেতা রাজার অবয়ব, যিনি কোনো বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নত করেননি।

দক্ষিণরায়ের **প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার** একটি প্রধান দিক ছিল সুন্দরবনের দুর্গম ভূ-প্রকৃতি। এই অঞ্চলের অসংখ্য নদী, খাঁড়ি এবং ঘন ম্যানগ্রোভ বনকে তিনি তার সামরিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যোদ্ধারা এই ভৌগোলিক পরিবেশে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। **'রায়মঙ্গল'** কাব্যে বর্ণিত **'ব্যাঘ্র বাহিনী' বা 'কুম্ভীর বাহিনী'** মূলত এই অঞ্চলের মানুষের গেরিলা রণকৌশলের একটি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা ।

সুলতানি বা মোগল শাসনের সময় অনেক বিদেশী বহিরাগত আক্রমণকারী এই অঞ্চলে আক্রমণ করতে এসে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। দক্ষিণরায় এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতেন, যার অর্থ হলো তার অধীনে এমন একটি প্রশিক্ষিত স্থানীয় বাহিনী ছিল যারা অরণ্যকে হাতের তালুর মতো চিনত। এই কৌশলেই তিনি দিল্লির সুলতান বা বাংলার নবাবদের প্রতিনিধিদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে এই অঞ্চলকে মুক্ত রেখেছিলেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য একটি স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন ভূখণ্ড তৈরি করেছিলেন।

রাজা দক্ষিণরায় কেবল সুন্দরবনের রূপকথার কোনো চরিত্র নন, বরং তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ঐতিহ্যের এক সুদৃঢ় ভিত্তি। মধ্যযুগের অস্থিতিশীল সময়ে যখন বাংলার হিন্দু রাজত্বগুলো একে একে পতনের মুখে পড়ছিল, তখন দক্ষিণরায় সুন্দরবনের লোনা জলে ও ঘন অরণ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির এক অপরাজেয় দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন। তার নেতৃত্বে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কেবল জঙ্গল হাসিল করেনি, তারা জয় করেছিল পরাধীনতার গ্লানিকেও।

বিদেশী মুসলিমদের সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায়ের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিদেশী মুসলিমদেরকে সহজে মেনে নেয়নি। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে, "উচ্চবর্ণের অত্যাচারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে" - এই বক্তব্য অসত্য, অতিকথা বা মিথ। বরং এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে, অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটে ছিল এবং শুধুমাত্র তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নয়, মুসলিম ধর্মীয় পীর ও গাজীরা ধর্ম প্রচারের জন্য অস্ত্র ধারণ করত। এই যুদ্ধে দক্ষিণ রায় পরাজিত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অস্তিত্ব থাকত না। এই যুদ্ধের দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও একটি যোদ্ধা জাতি।

বিদেশী ইসলামী আগ্রাসন থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রক্ষা করার ক্ষেত্রে দক্ষিণরায়ের ভূমিকা ছিল বহুমুখী—তিনি ছিলেন একাধারে সমরনায়ক, প্রজাবৎসল শাসক এবং ধর্মীয় অভিভাবক। তার ঐতিহাসিক বিজয় এবং গাজীর সাথে তার সম্মানজনক সমঝোতা প্রমাণ করে যে, তৎকালীন হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেনি, বরং তারা তাদের নিজস্ব শক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল। আজকের দিনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যে নবজাগরণ ও আত্মপরিচয়ের লড়াই, তার মূলে দক্ষিণরায়ের সেই প্রাচীন বীরগাথা আজও প্রেরণা যোগায়। রাজা দক্ষিণরায় তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য কেবল অতীতের কোনো শাসক নন, তিনি তাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের অতন্দ্র প্রহরী এবং বাংলার বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দক্ষিণ রায়ের আদর্শ ও সাহসিকতাকে পাথেয় করে এগিয়ে চলুক এই কামনা করি।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।





পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কেন 'রাজার জাতি' ?

- শ্রীলক্ষ্মীপতি গায়েন

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতি কেবল একটি জনসমষ্টি নয়, বরং এটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য এবং উজ্জ্বলতম অধ্যায়। বাংলার আদিম ইতিহাসের সাথে এই জাতির নাড়ি পোতা রয়েছে। **ঐতিহাসিকভাবে 'পুণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড্র' শব্দটি উচ্চবংশীয় আভিজাত্য এবং এক সুপ্রাচীন রাজকীয় ঐতিহ্যের স্মারক।** প্রাচীন মহাকাব্য থেকে শুরু করে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা—সর্বত্রই পৌণ্ড্রদের বীরত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং ভূমি-সংলগ্ন আভিজাত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের 'রাজার জাতি' বলা হয়। নিম্নে বিশদে আলোচিত হল -

প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ও রাজকীয় ভিত্তি

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজকীয় পরিচয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হলো প্রাচীন **'পুণ্ড্রবর্ধন' বা 'পুণ্ড্রদেশ'।** এটি ছিল প্রাচীন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী জনপদ। এই জনপদের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর, যা বর্তমানে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। পুণ্ড্রনগরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে যে, এই জাতি যিশুখ্রিস্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বেই এক উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও পুণ্ড্রনগর ছিল এক সমৃদ্ধ প্রশাসনিক কেন্দ্র। এই নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বিশাল দুর্গ প্রাকার এবং পরিকল্পিত স্থাপত্য রীতি সাক্ষ্য দেয় যে, এখানকার শাসকরা ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দূরদর্শী। পৌণ্ড্র সভ্যতার বিকাশ প্রায় সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এটি পূর্ব ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত ।

পুণ্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধি কেবল কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল না; এটি ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। হিউয়েন সাং-এর মতো পরিব্রাজকদের বর্ণনা অনুযায়ী, এই অঞ্চলে শত শত বিহার এবং মন্দির ছিল, যা শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পুণ্ড্রদের পরিচয় কেবল একটি জাতি হিসেবে নয়, বরং

একটি রাষ্ট্রীয় শক্তির আধার হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক উইলসনের মতে, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরের কতকাংশ এবং বিহারের রামগড়, পালামৌ এবং চুনারের কতকাংশ নিয়ে পুণ্ড্রদেশ বিস্তৃত ছিল। ক্যানিংহামের মতে উপরোক্ত স্থানগুলি ব্যতীত পাবনা জেলাও পুণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফার্গুসন মনে করেন, রাজমহল ও শিলিগুড়িও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় মর্যদা: রাজকীয় উৎপত্তির উৎস

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রীয় পরিচয় বা 'রাজার জাতি' হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পেছনে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের সমর্থন অনস্বীকার্য। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে পুরাণ ও মহাভারত পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পুণ্ড্রদের বীরত্ব ও আভিজাত্যের উল্লেখ রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, চন্দ্রবংশীয় রাজা বলির পাঁচ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম—ভারতের পূর্ব অংশে পাঁচটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা বলির পুত্র পুণ্ড্র যে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তা-ই পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত হয়। এই বংশতালিকাই পৌণ্ড্রদের রাজকীয় আভিজাত্যের আদি উৎস।

মহাভারতের সভাপর্বে পুণ্ড্রদের **'সুজাত ক্ষত্রিয়' বা সৎক্ষত্রিয়** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সভাপর্বের ১৩তম অধ্যায়ে বিখ্যাত পৌণ্ড্র রাজা বাসুদেবের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের একচ্ছত্র অধিপতি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌণ্ড্ররা কৌরবদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল, যা তাঁদের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রভাব ও সামরিক শক্তির পরিচায়ক ।

মনুসংহিতায় তাঁদের 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলার অর্থ হলো এমন এক ক্ষত্রিয় জাতি যারা দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণদের সান্নিধ্য এবং বৈদিক সংস্কার থেকে দূরে থাকায় নিজেদের সামাজিক অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিল । এটি কোনো হীন পরিচয় নয়, বরং একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী। বিশেষ করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবল প্রভাবে এই অঞ্চলের শাসকরা যখন বৈদিক রীতিনীতি ত্যাগ করেন, তখনই শাস্ত্রকাররা তাঁদের 'ব্রাত্য' বা সংস্কারচ্যুত বলে অভিহিত করেন, কিন্তু তাঁদের ক্ষত্রিয় আভিজাত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি ।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও দার্শনিক ঐতিহ্য: ক্ষমতার দ্বৈত রূপ

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজকীয় ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন পৌণ্ড্রক বাসুদেব। তিনি কেবল একজন দক্ষ যোদ্ধাই ছিলেন না, বরং তাঁর প্রভাব ছিল সমগ্র পূর্ব ভারত জুড়ে । তাঁর রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধন এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পৌরাণিক আখ্যানে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা তাঁর বিশাল ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ।

রাজা বাসুদেবের সাথে যুক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম হলো মহামুনি কপিল। প্রচলিত বিশ্বাস ও কিছু ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, মহামুনি কপিল ছিলেন রাজা বাসুদেবের ভাই। তিনি রাজসুখ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন এবং সাংখ্য দর্শন রচনা করেন। কপিল মুনির এই দার্শনিক অবদান ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি। একটি রাজপরিবার থেকে একদিকে যেমন পরাক্রমশালী রাজা (বাসুদেব) উৎপন্ন হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক (কপিল মুনি) উৎপন্ন হয়েছেন—এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেয়। সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে কপিল মুনির নাম আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং সাগর দ্বীপে তাঁর আশ্রম এই জাতির আধ্যাত্মিক সংযোগের প্রতীক।

ইসলাম প্রতিরোধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায় স্বধর্ম রক্ষায় বিদেশী মুসলিম ধর্মযোদ্ধা বড় খাঁ গাজী সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। দীর্ঘকালীন যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু কেউ জয়লাভ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর দক্ষিণ রায়ের কাহিনী'তে লিখেছেন, বঙ্গে পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে পীর, গাজীরা সশস্ত্র ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই কালে দক্ষিণ রায় স্বধর্ম রক্ষায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনি এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় দেবত্বে পরিণত হয়েছিলেন। মুসলিমদের সাথে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দক্ষিণ রায়ের দীর্ঘকালীন যুদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিদেশী মুসলিমদেরকে সহজে মেনে নেয়নি। এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে, "উচ্চবর্ণের অত্যাচারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে" - এই

বক্তব্য অসত্য, অতিকথা বা মিথ। বরং এই যুদ্ধের ঘটনা আরও প্রমাণ করে, অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটে ছিল এবং শুধুমাত্র তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নয়, মুসলিম ধর্মীয় পীর ও গাজীরা ধর্ম প্রচারের জন্য অস্ত্র ধারণ করত। এই যুদ্ধে দক্ষিণ রায় পরাজিত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অস্তিত্ব থাকত না। এই যুদ্ধের দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও একটি যোদ্ধা জাতি।

মধ্যযুগীয় বীরত্ব ও সামরিক ঐতিহ্য

বাংলার মধ্যযুগে যখন স্বাধীন জমিদার বা বারো ভুঁইয়াদের উত্থান ঘটে, তখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তাঁদের সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষ করে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বীরদের এক বিশাল ভূমিকা ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তখন তাঁর সেনাবাহিনীর এক বিশাল অংশ গঠিত হয়েছিল ঢালী এবং রায়বেঁশে সৈন্যদের নিয়ে। এই সৈন্যদের সিংহভাগই ছিলেন এই সাহসী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিদেশী মুঘলদের বিরুদ্ধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহাসিক ভূমিকা দেশপ্রেমের পরিচায়ক।

প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনী ও পৌণ্ড্রদের দক্ষতা

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে ৫২,০০০ ঢালী সৈন্য ছিল, যাদের সাহসিকতা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন এবং বহিরাগত আক্রমণকারীদের হাত থেকে ভূমি রক্ষা করার যে ঐতিহ্য বহন করছিল, তা-ই তাঁদের সামরিক শক্তিতে রূপান্তর লাভ করে। **প্রতাপাদিত্যের কুকি সৈন্যদের সেনাপতি ছিলেন রঘু। তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ছিলেন।** আজও রঘুর বংশধররা হিঙ্গলগঞ্জের ছোটো সাহেবখালি গ্রামে বসবাস করেন।

আত্মমর্যাদা আন্দোলন ও ক্ষত্রিয়ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৮৯১-১৯৫৬)

উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে এক বিশাল জাগরণ বা 'Self-Respect Movement' শুরু হয় । ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে জনগণনার সময় এই জাতিকে ভুলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হন। ১৮৯১ সালের সেন্সাসে হার্বার্ট রিজলি এই জাতিকে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে

তালিকাভুক্ত করেন, যা শিক্ষিত পৌণ্ড্র সমাজকে গভীরভাবে আঘাত করে ।

নেতৃত্বের ভূমিকা: বেণীমাধব হালদার ও রায়চরণ সরদার

এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল পৌণ্ড্রদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় পরিচয় সরকারি নথিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার এবং শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হন তাঁদের প্রকৃত পরিচয় হলো 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'। মহাত্মা রাইচরণ সরদার ছিলেন এই জাতির প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং একজন প্রথিতযশা আইনজীবী। তিনি আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি সমাজের শিক্ষার প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কেবল অতীতের গৌরবে বিশ্বাসী নন, বরং আধুনিক যুগেও নিজেদের অধিকার আদায়ে তাঁরা অত্যন্ত সচেতন এবং সংগঠিত। মহাত্মা রাইচরণ সরদার এবং মহেন্দ্রনাথ করণের মতো নেতারা 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ' ও 'A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods' এর মতো গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁদের ঐতিহ্যের প্রমাণ তুলে ধরেন ।

সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন: আধুনিক যুগের ক্ষত্রিয়ত্ব

একটি জাতির 'রাজকীয়' হওয়ার পরিচয় কেবল যুদ্ধজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারেও তা প্রতিফলিত হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা খুব দ্রুত অনুধাবন করেছিলেন যে, শিক্ষার আলো ছাড়া সামাজিক মর্যাদা স্থায়ী হবে না। বিশ শতকের শুরুর দিকেই এই জাতির মধ্যে শিক্ষার হার দ্রুত বাড়তে থাকে। অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর এবং পতিরাম রায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা নিজেদের চেষ্টায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস গড়ে তোলেন ।

সাক্ষরতা ও জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন

১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে তাঁদের সাক্ষরতার হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়, যা সেই সময়ের অন্য অনেক সম্প্রদায়ের তুলনায় ছিল বিস্ময়কর । তাঁরা কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যবসা ও উচ্চশিক্ষার দিকে মনোযোগ দেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তুলনায় অনেক এগিয়ে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাঁদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও শাস্ত্রীয় আচার

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণস্বরূপ সুপ্রাচীন বৈদিক আচারসমূহ পালন করে আসছেন। ১৯৩২ সালের এক সম্মেলনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, **সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পবিত্র পৈতা ধারণ করবেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত 'দ্বাদশাহাশৌচ' (১২ দিনের অশৌচ) পালন করবেন।** ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের মতো তাঁদের মধ্যেও কুলজি প্রথা ও গোত্রীয় পরিচয় বিদ্যমান।

তাঁদের বৈবাহিক রীতিনীতিতেও আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যদিও ব্রাহ্মণ্য রীতির সাথে কিছু মিল রয়েছে, তবুও তাঁদের নিজস্ব কিছু প্রতীক ও বিশ্বাস এই সম্প্রদায়কে অনন্য করে তুলেছে। পৌষ বা মকর সংক্রান্তি উৎসবটি এই সমাজে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালিত হয়, যা তাঁদের ভূমি-সংলগ্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক ।

সাংগঠনিক জাগরণ ও প্রচারমাধ্যম

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মপরিচয়ের লড়াইয়ে লিখনী ও পত্রিকার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাঁরা অসংখ্য সাময়িকী প্রকাশ করেছিলেন যার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে সচেতন করা হতো - *ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়-বান্ধব, প্রতিজ্ঞা* (১৯১৮), *ক্ষত্রিয়* (১৯২০), *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার* (১৯২৪) ইত্যাদি। এই পত্রিকাগুলি কেবল ধর্মীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কৃষি উন্নয়ন, নারী শিক্ষা এবং কুসংস্কার দূরীকরণেও সোচ্চার ছিল। বর্তমানে শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে **'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ'** ২০২০ সাল থেকে এক নতুন সাংগঠনিক যাত্রার সূচনা করেছেন, যার লক্ষ্য হলো এই জাতির হারানো গৌরব পুনরুজ্জীবিত করা।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের অবদান: জাতির আলোকবর্তিকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস সমৃদ্ধ করার পেছনে বহু মহৎ মানুষের অবদান রয়েছে। তাঁদের জীবন সংগ্রাম এবং সাফল্য এই জাতির রাজকীয় সত্তাকে বারবার প্রতিষ্ঠিত করেছে। বহু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ধ্রুবচাঁদ হালদার এবং ভূষণচন্দ্র নস্কর স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পতিরাম রায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তপশীলীভুক্ত না হওয়ার জন্য মামলা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় জাতি বলেই তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হতে চায় নি। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের বিভাগ করো

ও শাসন করো নীতিতে অটল থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবীকে উপেক্ষা করে। এর বিরুদ্ধে মহাত্মা রাইচরণ সরদার মামলার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বর্গলাভ করেন। তারপর তাঁর পুত্র ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আদালতের দীর্ঘসূত্রতায় মামলাটি নিস্পত্তি হয়নি। এই প্রচেষ্টা ছিল ক্ষত্রিয় সুলভ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কেন 'রাজার জাতি' বলা হয়, তার গভীরে গেলে দেখা যায় যে এটি কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয় নয়, বরং এটি একটি মানসিক স্থিতি। রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রক্তের উত্তরাধিকার বহন করা এই জাতি মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ়।

১. **ভূমির একচ্ছত্র মালিকানা:** পৌণ্ড্ররা প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মাটির সাথে যুক্ত। তাঁরা কেবল কর সংগ্রাহক ছিলেন না, বরং জমিদারের মতো ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলেও তাঁদের অনেকে জোতদার ও বড় জমিদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

২. **প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা:** পুণ্ড্রবর্ধনের শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই পরমতসহিষ্ণুতা এক রাজকীয় গুণের পরিচায়ক।

৩. **বিপত্তিতে অটল সাহস:** সুন্দরবনের হিংস্র পরিবেশের সাথে লড়াই করে যারা নতুন জনপদ গড়ে তোলে, তাদের মধ্যে যে জন্মগত বীরত্ব থাকে, তা-ই তাঁদের ক্ষত্রিয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

৪. **শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা:** 'ক্ষত্রিয়' মানে কেবল তরবারি চালানো নয়, বরং সমাজকে পথ দেখানো। কপিল মুনির সাংখ্য দর্শন এবং পরবর্তীকালের মহাত্মা রাইচরণ সরদারের শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই জাতি প্রমাণ করেছে যে জ্ঞানই হলো তাঁদের প্রকৃত রাজদণ্ড। ভবিষ্যতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মূল লক্ষ্য হলো: **মহর্ষি কপিল মুনি ও মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:** শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর এক অঙ্গীকার।

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রসার: নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপি সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করা।

রাজনৈতিক সংহতি: সংসদীয় গণতন্ত্রে নিজেদের সংখ্যার ভিত্তিতে ন্যায্য অধিকার আদায় করা।

'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডলের মতে, এই সমাজকে এখন অনাথ বা অভিভাবকহীন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং নিজেদের

মহাপুরুষদের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কেন রাজার জাতি—তার উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁদের হাজার বছরের ইতিহাস, অদম্য বীরত্ব এবং লড়াকু জীবনবোধের মধ্যে। তাঁরা কেবল একটি ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন একটি উন্নত সভ্যতার নির্মাতা। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজপ্রাসাদ থেকে সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করা পর্যন্ত—প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁরা তাঁদের রাজকীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

যদিও মধ্যযুগের কিছু সামাজিক অস্থিরতা এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের ভ্রান্ত নীতির কারণে তাঁদের সামাজিক অবস্থানে সাময়িক অবনমন ঘটেছিল, কিন্তু বিশ শতাব্দীর নবজাগরণ তাঁদের সেই হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। আজকের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সুশিক্ষিত, আত্মনির্ভর এবং নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাঁদের এই পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে, রাজকীয় রক্ত কেবল সিংহাসনে থাকে না, তা থাকে একটি জাতির সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং আত্মমর্যাদাবোধের গভীরে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির এই ইতিবাচক ইতিহাস আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার এক অন্তহীন উৎস হয়ে থাকবে। তাঁদের জয়যাত্রা কেবল অতীতেই ছিল না, সুশিক্ষিত ও সংহতিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে—এটাই এই 'রাজার জাতি'র অমোঘ ভবিতব্য।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সকল সদস্যকে আজ সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ছত্রতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তারা তাদের ক্ষত্রিয় পরিচয় ভুলে গেছে বলেই আজ সমাজে পিছিয়ে পড়েছে। যদি তারা তাদের ক্ষত্রিয় চেতনা জাগ্রত করে তাহলে তারা হবে ভারতের চালিকা শক্তি। ক্ষত্রিয় পথ দেখায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, জাতির সেবা করে। **ক্ষত্রিয় কখনও অপরের মুখাপেক্ষী থাকেনা।** সে তাঁর নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নেয় দেশ ও জাতির সেবায় ও রক্ষায়। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নিজেদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা জাগ্রত করুণ এবং নিজেরা যে রাজার জাতি সেই চেতনাকে সার্থক রূপ দিন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



এই সংখ্যার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ

বৈদিক সাহিত্যে ক্ষত্রিয়

- শ্রীসৎকৃত বেদাঙ্গ

বৈদিক সমাজব্যবস্থায় 'ক্ষত্রিয়' বা 'রাজন্য' শ্রেণির অবস্থান ও ভূমিকা একটি বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার ফসল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের সামাজিক কাঠামোর যে রূপরেখা ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে অথর্ববেদে প্রতিফলিত হয়েছে, সেখানে শাসনক্ষমতা, সামরিক শৌর্য এবং রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতেন ক্ষত্রিয়রা। **সংস্কৃত 'ক্ষত্র' শব্দ থেকে এই পদের উৎপত্তি, যার আক্ষরিক অর্থ হলো আধিপত্য, শাসন বা কর্তৃত্ব ।** বৈদিক সাহিত্যে ক্ষত্রিয়দের কেবল একজন সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করা হয়নি, বরং তারা ছিলেন 'ধর্ম'-এর রক্ষক এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলার (ঋত) পার্থিব প্রতিনিধি ।

ঋগ্বেদীয় সমাজে ক্ষত্রিয় ও রাজন্যের আদি রূপরেখা

ঋগ্বেদ হলো বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম স্তর, যেখানে ক্ষত্রিয় শ্রেণির প্রাথমিক বিকাশ ও পরিবর্তনের চিত্রটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ঋগ্বেদীয় সমাজ মূলত একটি পশুপালনভিত্তিক সমাজ ছিল, যেখানে শাসনব্যবস্থা ছিল বিকেন্দ্রীকৃত এবং গোষ্ঠীভিত্তিক।

রাজন ও আদি বৈদিক রাজনৈতিক কাঠামো

ঋগ্বেদের আদি মন্ডলগুলিতে (বিশেষত ২য় থেকে ৭ম মন্ডল) 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণ বা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সময় 'রাজন' বা রাজা ছিলেন একটি 'জন' বা গোষ্ঠীর নেতা। রাজার প্রধান কাজ ছিল তার গোষ্ঠীর গবাদি পশু রক্ষা করা এবং যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব দেওয়া। ঋগ্বেদীয় রাজন কোনো সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন না; তার ক্ষমতা 'সভা' এবং 'সমিতি' নামক পরিষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সমিতিতে নারী ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারত, যা আদি বৈদিক সমাজে ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার ওপর গণতান্ত্রিক বা গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ দেয় ।

তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা মূলত ব্যক্তিগত শৌর্য এবং গোষ্ঠীগত সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাজা নির্বাচিত হতেন এবং তার পদমর্যাদা সর্বদা বংশগত ছিল না। যুদ্ধের সময় তিনি সাধারণ যোদ্ধাদের বা 'বিশ'-দের নেতৃত্ব দিতেন। এই যুগে 'ক্ষত্র' বলতে বোঝাত বিশেষ বীরত্ব বা রক্ষার সামর্থ্য ।

পুরুষ সূক্ত এবং রাজন্যের মহাজাগতিক উৎপত্তি

ঋগ্বেদের দশম মন্ডলকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের সংযোজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই মন্ডলের ৯০তম সূক্তটি 'পুরুষ সূক্ত' নামে পরিচিত, যেখানে প্রথমবারের মতো চতুর্বর্ণের বা চারটি সামাজিক বর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাজাগতিক বর্ণনায় আদি পুরুষের যজ্ঞ থেকে বিভিন্ন বর্গের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে:

আদি পুরুষের অঙ্গ	উদ্ভূত বর্ণ	ভূমিকার প্রতীকী তাৎপর্য
মুখ (Mouth)	ব্রাহ্মণ	জ্ঞান, প্রার্থনা এবং পবিত্র শব্দ
বাহু (Arms)	রাজন্য (ক্ষত্রিয়)	শক্তি, সুরক্ষা, শাসন এবং রণশৈলী
উরু (Thighs)	বৈশ্য	অর্থনৈতিক ভিত্তি, কৃষি এবং বাণিজ্য
পদযুগল (Feet)	শূদ্র	সেবা, শ্রম এবং সমাজের ভিত্তি

এই বর্ণনায় 'ক্ষত্রিয়'-এর পরিবর্তে 'রাজন্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাহু থেকে রাজন্যের উৎপত্তি নির্দেশ করে যে, শাসক শ্রেণির মূল ভিত্তি হলো দৈহিক ও সামরিক শক্তি। বাহু যেমন শরীরকে রক্ষা করে, তেমনি রাজন্যের দায়িত্ব ছিল সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করা। পণ্ডিতদের মতে, এই সূক্তটি একটি 'চার্টার মিথ' বা সামাজিক সনদ হিসেবে কাজ করেছিল, যা শাসনকর্তা শ্রেণির কর্তৃত্বকে একটি দৈব বৈধতা দান করে ।

ইন্দ্র: ক্ষত্রিয়ের স্বর্গীয় আদর্শ

ঋগ্বেদীয় দেবতাকুলে ইন্দ্র হলেন ক্ষত্রিয়ের চরম আদর্শ। তিনি 'বৃত্র' নামক অসুরকে বধ করে জল উন্মুক্ত করেন এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ইন্দ্রের এই বিজয়ী রূপ মর্ত্যের ক্ষত্রিয়দের জন্য একটি যুদ্ধের নৈতিকতা এবং শৌর্যের কাঠামো তৈরি করেছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে 'বজ্রবাহু' এবং 'পুরন্দর' (দুর্গ ধ্বংসকারী) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা ক্ষত্রিয়ের লড়াকু মানসিকতারই স্বর্গীয় প্রতিফলন।

যজুর্বেদে ক্ষত্রিয়ের রাজকীয় আনুষ্ঠানিকতা ও সার্বভৌমত্ব

যজুর্বেদ মূলত কর্মকাণ্ডের বা যজ্ঞীয় আনুষ্ঠানিকতার সংহিতা। ঋগ্বেদে যে ক্ষত্রিয় শ্রেণির সূচনা হয়েছিল, যজুর্বেদে এসে তা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক রূপ ধারণ করে। এই বেদে রাজপদকে কেবল একটি পদ হিসেবে নয়, বরং একটি

পবিত্র অঙ্গীকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজসূয় এবং বাজপেয় যজ্ঞের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার যে উচ্চতা প্রদর্শিত হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

রাজসূয় যজ্ঞ: অভিষেক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব

যজুর্বেদ এবং বিশেষত শুক্ল যজুর্বেদের শাখাভুক্ত 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ রাজসূয় যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এটি কেবল একটি সাধারণ অভিষেক অনুষ্ঠান ছিল না, বরং এটি ছিল একজন ক্ষত্রিয়ের সার্বভৌম সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া।

রাজসূয় যজ্ঞের পর্যায়গুলো ক্ষত্রিয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ক্ষমতার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে:

রত্নিনাম্ হবীংষি (Ratninām̐ haviṃsi): রাজাকে তার রাজ্যের ১১ জন 'রত্নি' বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বাড়িতে গিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হতো। এই রত্নিদের মধ্যে সেনাপতি, পুরোহিত, প্রধান মহিষী, সারথি (সুত) এবং গ্রামপ্রধান (গ্রামণি) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি নির্দেশ করে যে, বৈদিক ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না; বরং তাকে তার পরিষদ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ওপর নির্ভর করতে হতো। রত্নিদের সমর্থন ছাড়া রাজা সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন না।

অভিষেচনীয় (Abhiṣecanīya): এটি ছিল রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অংশ, যেখানে রাজাকে ১৭ প্রকার পবিত্র জল দিয়ে স্নান করানো হতো। এই জল সরস্বতী নদী, সমুদ্র, কূপ এবং বৃষ্টির ধারা থেকে সংগ্রহ করা হতো। এই ভিন্নধর্মী জলরাশি রাজার মধ্যে বিভিন্ন গুণ—যেমন তেজ, স্থায়িত্ব এবং সম্পদ—সঞ্চার করবে বলে বিশ্বাস করা হতো ।

দিগ্বিজয় ও রথচালনা: যজ্ঞ চলাকালীন রাজাকে প্রতীকীভাবে একটি রথ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হতো এবং তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হতো। এটি ক্ষত্রিয়ের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও গতির প্রতীক। এছাড়াও রাজা প্রতীকীভাবে একটি 'গো-অন্বেষণ' বা গবাদি পশু অভিযানের মহড়া দিতেন, যা তার প্রজাদের সম্পদ রক্ষার সামর্থ্য প্রদর্শন করত।

অক্ষ-ক্রীড়া (Game of Dice): যজ্ঞের শেষে একটি পাশা খেলার আয়োজন করা হতো যেখানে রাজাকে সর্বদা বিজয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এটি মহাজাগতিক শৃঙ্খলার ওপর রাজার নিয়ন্ত্রণ এবং ভাগ্যের ওপর তার কর্তৃত্বের প্রতীক।

বাজপেয় যজ্ঞ: সম্রাটের মর্যাদা লাভ

যজুর্বেদে ক্ষত্রিয়ের জন্য আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞ হলো 'বাজপেয়'। যেখানে রাজসূয় যজ্ঞ একজনকে 'রাজা' করে, সেখানে বাজপেয় যজ্ঞের মাধ্যমে তিনি **'সম্রাট' বা 'সর্বজনীন শাসক'** হিসেবে স্বীকৃত হন। এই যজ্ঞে ১৭ সংখ্যার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়—১৭টি রথ, ১৭টি ড্রাম এবং ১৭ দিনের অনুষ্ঠান।

বাজপেয় যজ্ঞের একটি অনন্য আচার হলো **'রোহ' বা আরোহণ**। রাজা এবং তার মহিষী একটি যজ্ঞীয় মই বেয়ে যজ্ঞস্তম্ভের শীর্ষে আরোহণ করতেন। স্তম্ভের শীর্ষে পৌঁছে রাজা ঘোষণা করতেন, **"আমি জ্যোতি লাভ করেছি, আমি অমর হয়েছি।"** এটি ক্ষত্রিয়ের পার্থিব শাসনকে আধ্যাত্মিক ও স্বর্গীয় জগতের সাথে সংযুক্ত করত। এরপর রাজাকে 'উদুম্বর' কাঠের সিংহাসনে বসানো হতো এবং তাকে অন্ন ও সম্পদের অধিপতি হিসেবে ঘোষণা করা হতো।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব

যজুর্বেদীয় সাহিত্যে রাজাকে **'ধর্মপতি'** হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম হলো প্রজা পালন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, **রাজা যদি অন্যায় করেন বা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন, তবে তিনি তার রাজকীয় তেজ হারিয়ে ফেলবেন**। অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় রাজাকে একটি পবিত্র তলোয়ার বা দণ্ড প্রদান করা হতো, যা শাসনের প্রতীক। তবে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আচার ছিল যেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে হালকাভাবে স্পর্শ করতেন, যা নির্দেশ করত যে রাজা আইনের ঊর্ধ্বে নন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের (ব্রাহ্মণ) কাছে তিনি নতিস্বীকার করবেন।

নিচে যজুর্বেদীয় যজ্ঞের তুলনা দেওয়া হলো:

যজ্ঞের নাম	লক্ষ্য	ক্ষত্রিয়ের অর্জিত পদমর্যাদা
রাজসূয় (Rājasūya)	অভিষেক ও রাজনৈতিক বৈধতা	রাজা (Rājā)
বাজপেয় (Vājapeya)	সাম্রাজ্যিক ক্ষমতা ও তেজ	সম্রাট (Samrāt)
অশ্বমেধ (Ashvamedha)	সার্বভৌমত্ব ও দিগ্বিজয়	সার্বভৌম অধিপতি

সামবেদে ক্ষত্রিয়ের মহিমা ও বীরত্বের সুর

সামবেদ মূলত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে সুরারোপিত করে গীতিময় রূপ দান করার বেদ। ক্ষত্রিয়ের জীবনে সামবেদের গুরুত্ব এর Liturgical বা যজ্ঞীয় প্রয়োগের মধ্যে নিহিত। রাজকীয় যজ্ঞ এবং যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সাম বা গানগুলি গাওয়া হতো, তা ক্ষত্রিয়ের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি এবং স্বর্গীয় শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করত।

বৃহৎ সাম ও রথান্তর সাম: রাজকীয় রক্ষাকবচ

সামবেদে 'বৃহৎ সাম' (Bṛhat Sāma) এবং 'রথান্তর সাম' (Rathāntara Sāma) নামক দুটি প্রধান গীতি বা সামের উল্লেখ আছে, যা ক্ষত্রিয়ের বীরত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বৃহৎ সাম: এটি ঋষি ভরদ্বাজ কর্তৃক দ্রষ্ট এবং ইন্দ্রের মহিমা কীর্তনে ব্যবহৃত হতো। এটি ক্ষত্রিয়ের তেজ, শৌর্য এবং আধিপত্যের প্রতীক। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন "বেদানাম্ সামবেদোস্মি" (বেদের মধ্যে আমি সামবেদ), তখন তিনি সামবেদের শ্রেষ্ঠ স্তোত্র হিসেবে 'বৃহৎ সাম'-এর কথাই উল্লেখ করেন। এটি ক্ষত্রিয়ের আত্মিক শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো।

রথান্তর সাম: এই সামটি রথের চাকা এবং গতির সাথে যুক্ত। যুদ্ধের সময় রথে ওঠার আগে এই মন্ত্র পাঠ করা হতো। এটি ক্ষত্রিয়ের স্থিরতা এবং বিজয়ের সংকল্পকে দৃঢ় করত।

বিজয় ও যুদ্ধের গান

সামবেদের গানগুলি **'উদগাতা'** নামক পুরোহিতরা যজ্ঞের সময় গাইতেন। বিশেষ করে সোম যজ্ঞের সময় ক্ষত্রিয়ের বিজয় কামনায় 'আর্চিক' বা মন্ত্রগুলি বিশেষ সুরে গাওয়া হতো। সামবেদের মন্ত্রে ইন্দ্রকে বারংবার 'বৃত্র-সংহারক' এবং 'ধন-দাতা' হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে, যা ক্ষত্রিয়ের রণ-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। **সামবেদের সুরগুলি ক্ষত্রিয়ের মনে 'সত্ত্ব' গুণের উদ্রেক করত বলে বিশ্বাস করা হতো, যাতে তিনি যুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যেও 'ধর্ম' থেকে বিচ্যুত না হন।**

অথর্ববেদে ক্ষত্রিয়ের সুরক্ষা ও 'রাজকর্মাণি'

অথর্ববেদকে প্রায়শই 'ক্ষত্রবেদ' বা ক্ষত্রিয়ের উপযোগী বেদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ এই বেদে ক্ষত্রিয়ের রাজকীয় জীবন, সামরিক কৌশল, এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্র ও আচারের আধিক্য দেখা যায়। অথর্ববেদের 'রাজকর্মাণি'

সুক্তগুলি সরাসরি রাজার শাসন ও ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

রাজকর্মাণি সুক্ত ও রাজকীয় সুরক্ষা

অথর্ববেদে রাজাকে অভিষিক্ত করার সময় এবং তার শাসনের স্থায়িত্বের জন্য অসংখ্য আশীর্বচন ও মন্ত্র রয়েছে । একটি সুক্তে বলা হয়েছে, "ইন্দ্র এই রাজাকে রক্ষা করুন, মিত্র ও বরুণ তাকে শক্তি দিন এবং অগ্নি তার সামনে পথ প্রশস্ত করুন"। ক্ষত্রিয়ের রাজদণ্ডকে বজ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা শত্রুর বিনাশ এবং অশুভ শক্তির পরাজয় নিশ্চিত করে।

রাজার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন তুকতাক ও মন্ত্রপূত কবচ বা 'মণি' ব্যবহারের বিধান অথর্ববেদে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে:

অভিবর্ত মণি: এই মণিটি রাজার বিজয় এবং আধিপত্যের জন্য ব্যবহৃত হতো । এটি ধারণ করলে রাজার শব্দ সূর্যের মতো প্রভাবশালী হয় এবং তিনি অপরাজেয় বীর হিসেবে বীরত্ব প্রদর্শন করেন ।

পর্ণ মণি (Palāśa): এটি রাজাকে তেজ এবং উজ্জ্বলতা প্রদান করে বলে বিশ্বাস করা হতো।

যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রের শক্তিবর্ধন

অথর্ববেদের যুদ্ধ সংক্রান্ত সুক্তগুলি (যেমন ১.২৭ এবং ১.১৯) ক্ষত্রিয়ের রণকৌশলের একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চিত্র উপস্থাপন করে । যুদ্ধের আগে অস্ত্রের 'শক্তিবর্ধন' বা Energizing করার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এখানে বর্ণিত হয়েছে:

ধনুক ও তীরের অর্ঘ্য: যে কাঠ দিয়ে ধনুক তৈরি হয়েছে, সেই একই কাঠের জ্বালানি দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যজ্ঞ করা হতো ।

পৈশাচিক অস্ত্র বনাম দৈব অস্ত্র: শত্রুর অস্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য বরুণ ও ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হতো। একটি মন্ত্রে তীরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, **"তুমি পর্জন্যের (বৃষ্টির দেবতা) পুত্র এবং পৃথিবীর সন্তান"।** এইভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে অস্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা হতো যাতে ক্ষত্রিয়ের রণনৈপুণ্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

অর্বুদি ও ন্যার্বুদি: এগুলি ছিল বিশেষ সামরিক মন্ত্র বা রূপক অস্ত্র, যা শত্রুপক্ষের মনে ভয় এবং বিভ্রান্তি তৈরি করত ।

পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের সম্পর্ক

অথর্ববেদে রাজার প্রধান পুরোহিতের (পৌরোহিত্য) ভূমিকা অত্যন্ত শক্তিশালী। পুরোহিত কেবল ধর্মীয় কাজই করতেন

না, বরং তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়ের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং যুদ্ধের সময় তার আধ্যাত্মিক বর্ম। পুরোহিতের মন্ত্রের মাধ্যমেই ক্ষত্রিয়ের তেজ বা 'ক্ষত্র' বৃদ্ধি পায় বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বেদে রাজাকে তার প্রজাদের ('বিশ') সাথে সুসম্পর্ক রাখার এবং কর ('বলি') আদায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নৈতিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চারটি বেদের তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য শ্রেণির একটি সুস্পষ্ট বিবর্তনীয় রেখা লক্ষ্য করা যায়। এই বিবর্তন কেবল যুদ্ধের কৌশলে নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক দর্শনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

আদি বৈদিক বনাম পরবর্তী বৈদিক রূপান্তর

ঋগ্বেদের আদি যুগে ক্ষত্রিয়ের পদমর্যাদা ছিল নমনীয় এবং মূলত বীরত্বের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের যুগে তা একটি স্থায়ী এবং বংশগত সামাজিক বর্গে পরিণত হয় ।

ক্ষত্রিয়ের দ্বৈত ভূমিকা: শাসন ও যজ্ঞ

বৈদিক সাহিত্যে ক্ষত্রিয়ের ভূমিকা কেবল তরবারি ধারণেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ছিলেন **'যজমান' বা যজ্ঞের প্রধান পৃষ্ঠপোষক**। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ পরিচালনা করলেও, ক্ষত্রিয়ের উপস্থিতি এবং অর্থায়ন ছাড়া মহৎ যজ্ঞগুলি সম্ভব ছিল না। এই সহাবস্থানই বৈদিক সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা করত। **ক্ষত্রিয়দের জন্য শিক্ষা বা উপনয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেখানে তারা অস্ত্রবিদ্যার পাশাপাশি দণ্ডনীতি এবং ধর্মীয় বিধানগুলি শিক্ষা গ্রহণ করত।**

ক্ষত্রিয়ের নারী ও পারিবারিক জীবন

বেদের কিছু অংশে ক্ষত্রিয় নারীদের বা 'রাজন্য কন্যা'-দের বীরত্বের কথাও আভাসিত হয়েছে। তারা রণকৌশল এবং প্রশাসনিক কাজে পারদর্শী ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় পরিবারগুলি তাদের বংশধারা বা 'গোত্র' রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল, যাতে সিংহাসনের উত্তরসূরিদের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে ।

বৈদিক সাহিত্যের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য একটি অত্যন্ত গৌরবময় এবং দায়িত্বশীল শ্রেণির নাম। ঋগ্বেদে যে শৌর্যের বীজ বপন করা হয়েছিল, যজুর্বেদে তা রাজকীয় ঐশ্বর্যে বিকশিত হয়, সামবেদে সুরের মাধুর্যে মহিমান্বিত হয় এবং অথর্ববেদে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষায় পূর্ণতা লাভ করে। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন বৈদিক সভ্যতার রক্ষক; তাদের বাহুশক্তি যেমন বহিঃশত্রু থেকে সমাজকে রক্ষা করত, তেমনি তাদের ধর্মনিষ্ঠা আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি

নিশ্চিত করত। বেদে বর্ণিত ক্ষত্রিয়ের এই আদর্শ কেবল শাসনের ইতিহাস নয়, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার রাজনৈতিক ও নৈতিক ভিত্তিপ্রস্তর। যদিও পরবর্তী যুগে বর্ণপ্রথা কঠিন আকার ধারণ করেছিল, কিন্তু বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয়ের মূল পরিচিতি ছিল তার রক্ষা করার সামর্থ্য এবং 'ধর্ম' বা ন্যায়ের প্রতি অবিচল আনুগত্যের মধ্যে। বৈদিক ক্ষত্রিয়ের এই চিত্রটি পরবর্তী ভারতীয় রাজধর্ম এবং বীরত্বের গাথাগুলোর চিরন্তন উৎস হিসেবে গণ্য হয়।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।



বৈদিক সংহিতায় ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতি রণপ্রিয়া রায়

বৈদিক যুগের সমাজকাঠামো এবং লিঙ্গীয় সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাসে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় নারীদের অবস্থান এক অনন্য ও বলিষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রাচীন ভারতের এই সুদীর্ঘ সময়কালে নারীরা কেবল গার্হস্থ্য বলয়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং রাজনৈতিক, সামরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাঁদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ—এই চারটি বৈদিক সংহিতার নিবিড় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় নারীরা সেই সময়ের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও এক প্রকার সমান্তরাল ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করতেন। বিশেষ করে রাজকীয় পরিবারের নারীরা বা ‘রাজন্য’ নারীরা শিক্ষার মাধ্যমে প্রজ্ঞার শিখরে আরোহণ করতেন এবং প্রয়োজনে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের শৌর্য প্রদর্শন করতেন। সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের আত্মিক ও সামাজিক সমতার যে ধারণা বেদে বিদ্যমান ছিল, তা পরবর্তী যুগের পৌরাণিক বা স্মার্ত অনুশাসনের তুলনায় অনেক বেশি উদার এবং অধিকারভিত্তিক ছিল। প্রতিটি বেদে ক্ষত্রিয় নারীদের চিত্রায়ণ এবং তাঁদের

অধিকারের স্বতন্ত্র রূপরেখাটি নিম্নে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

ঋগ্বেদ সংহিতায় ক্ষত্রিয় নারী

ঋগ্বেদ বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম স্তর হিসেবে তৎকালীন আর্য সমাজের এক স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। এখানে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নারীদের চিত্রায়ণে বীরত্ব, প্রজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদীয় সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় নারীরা কেবল পতি বা পুত্রের পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না, বরং **'ব্রহ্মবাদিনী' এবং 'বীরাঙ্গনা'** হিসেবেও তাঁদের এক স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল।

সামরিক দক্ষতা ও রণক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ

ঋগ্বেদের যুগে ক্ষত্রিয় নারীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করতেন এবং সরাসরি রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করতেন। এটি সেই সময়ের এক ঐতিহাসিক সত্য যা পরবর্তী যুগের সাহিত্যে অনেকাংশেই ম্লান হয়ে গেছে। ক্ষত্রিয় পরিবারের কন্যারা শৈশব থেকেই অস্ত্রচালনা এবং রথ চালনার প্রশিক্ষণ লাভ করতেন।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ ও ১১৮ নম্বর সূক্তে বর্ণিত **বিশপলার বীরত্বগাথা** এর একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। রাজা খেলের পত্নী বিশপলা যুদ্ধে তাঁর একটি পা হারান। তৎকালীন আর্য চিকিৎসাবিদ্যার সহায়তায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে একটি লৌহনির্মিত কৃত্রিম পা (আয়সী জঙ্ঘা) প্রদান করেন, যার সাহায্যে তিনি পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেন। এই ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয় নারীদের সামরিক অবদান কেবল সহায়কের ভূমিকায় ছিল না, বরং তাঁরা সম্মুখ সমরেও অংশ নিতেন।

অনুরূপভাবে, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০২ নম্বর সূক্তে **মুদগলানি বা ইন্দ্রসেনার** উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর স্বামী রাজা মুদগলের সাথে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে অংশ নিয়েছিলেন এবং রণক্ষেত্রে রথের চালক হিসেবে অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। মুদগলানি কেবল রথ চালনাই করেননি, বরং শত্রুর গো-ধন উদ্ধারে স্বামীর প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলো প্রমাণ করে যে, ঋগ্বেদীয় সমাজে ক্ষত্রিয় নারীদের শারীরিক সক্ষমতা এবং সাহসিকতাকে পুরুষদের সমকক্ষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হতো।

আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও ক্ষত্রিয় ঋষিকা

ঋগ্বেদে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের অধিকার কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্ষত্রিয় পরিবারের কন্যারাও বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা বা ঋষিকা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত

রাজন্য বংশোদ্ভূত নারীদের দ্বারা রচিত বা দৃষ্ট।

রাজা কাক্ষীবানের কন্যা **ঘোষা** এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি ছিলেন একজন 'ব্রহ্মবাদিনী' এবং ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ নম্বর সূক্ত দুটির রচয়িতা। তাঁর রচিত মন্ত্রগুলোতে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘোষার মতো রাজন্য বংশীয় নারীরা শাস্ত্রীয় বিতর্কেও সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং তাঁদের বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন। ক্ষত্রিয় নারীদের এই উচ্চতর শিক্ষার অধিকার এবং মন্ত্র রচনার ক্ষমতা নির্দেশ করে যে, বৈদিক যুগে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য ছিল না।

সামাজিক ও আইনি অধিকারের স্বরূপ

ঋগ্বেদীয় সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় নারীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক অধিকার ছিল অত্যন্ত সুসংহত। বিবাহের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় কন্যাদের স্বীয় পতি নির্বাচনের অধিকার ছিল, যা **'স্বয়ংবর'** প্রথা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ঋগ্বেদের ১০.২৭.১২ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, বিদুষী এবং সুন্দরী কন্যা নিজে তাঁর মিত্র বা জীবনসঙ্গীকে বেছে নিতে পারেন।

সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও রাজন্য কন্যাদের একটি বিশেষ অবস্থান ছিল। ঋগ্বেদে **'পুত্রিকা'** প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে পুত্রহীন পিতার একমাত্র কন্যা পুত্রের ন্যায় আইনি মর্যাদা লাভ করতেন এবং পিতার সম্পত্তি ও বংশধারা রক্ষা করতেন। ঋগ্বেদীয় সমাজে নারীর এই আইনি ও অর্থনৈতিক অধিকার তাঁকে স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ করে দিত।

যজুর্বেদ সংহিতায় রাজন্য নারী

যজুর্বেদ মূলত যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে রচিত। এখানে ক্ষত্রিয় নারীদের, বিশেষ করে রাজমহিষীদের প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় আচারিক ক্ষমতা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যজুর্বেদের সংহিতা অংশে ক্ষত্রিয়দের শক্তিকে **'ত্রিষ্টুভ'** ছন্দের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা বীরত্ব ও প্রতাপের প্রতীক।

রাজকীয় যজ্ঞ ও মাহিষীর মর্যাদা

যজুর্বেদে বর্ণিত অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞে প্রধান মহিষীর (মাহিষী) উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। এই যজ্ঞগুলোতে রাজার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় মহিষীর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। যজুর্বেদের মতে, যজ্ঞে রাজার সাথে মহিষীর অংশগ্রহণ কেবল লৌকিক আচার ছিল না, বরং এটি ছিল রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এবং প্রজানুরঞ্জনের এক আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া।

শুক্ল যজুর্বেদের ২০.৯ মন্ত্রে নারী ও পুরুষের সমভাবে রাষ্ট্রীয় শাসক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যজুর্বেদে ক্ষত্রিয় নারীদের **'সিংহি' বা সিংহী** হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে (৫.১২), যা তাঁদের তেজস্বিতা এবং নির্ভীকতার পরিচায়ক। প্রশাসনিক কার্যে নারীদের মেধা ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব বুঝাতে তাঁদের 'সরস্বতী'র সাথে তুলনা করা হয়েছে।

সামরিক সংগঠন ও নারী বাহিনী

যজুর্বেদের ১৬.৪৪ মন্ত্রে একটি অত্যন্ত দূরদর্শী এবং আধুনিক ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়—সেখানে **'নারী বাহিনী'** বা নারীদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। রাজন্য নারীরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ প্রশিক্ষণই নিতেন না, বরং রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে তাঁদের একটি সংগঠিত অবস্থান ছিল। যজুর্বেদীয় দর্শনে ক্ষত্রিয় নারীকে কেবল সন্তানদাত্রী হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্রের রক্ষক হিসেবেও দেখা হয়েছে।

যজুর্বেদ ২০.৮৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে, **"বিদুষী নারী তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা আমাদের জীবনকে পবিত্র করেন। তাঁর কর্মের মাধ্যমে তিনি সমাজের কার্যধারাকে শুদ্ধ করেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ করে তোলেন।"** এই মন্ত্রটি প্রমাণ করে যে, যজুর্বেদীয় যুগে ক্ষত্রিয় নারীদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজন্য নারীদের ক্রমবিন্যাস ও অধিকার

যজুর্বেদের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনায় রাজপরিবারের নারীদের একটি বিশেষ ক্রমবিন্যাস দেখা যায়, যা তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিচায়ক: ১. **মাহিষী:** প্রধান মহিষী বা সম্রাজ্ঞী, যিনি যজ্ঞের প্রধান কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। ২. **বাবাতা:** রাজার প্রিয়তমা পত্নী, যাঁর একটি বিশেষ আচারিক অবস্থান ছিল। ৩. **পরিবৃত্তী:** রাজার উপেক্ষিত পত্নী, যাঁর অধিকারও যজ্ঞীয় কাঠামোতে স্বীকৃত ছিল। ৪. **পালাগলী:** নিম্নতর স্তরের রাজন্য নারী।

এই নারীরা যজ্ঞের ঘোড়াটিকে ঘৃত দিয়ে অভিষেক করার সময় ভিন্ন ভিন্ন অংশের দায়িত্ব পালন করতেন, যা রাজ্যের বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক স্তরের ওপর রাজকীয় পরিবারের কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ। যদিও এই যজ্ঞের কিছু আচার পরবর্তীকালে বিতর্কিত হয়েছে, তবে বৈদিক প্রেক্ষাপটে এগুলো ছিল বীর সন্তান লাভ এবং রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার একটি পবিত্র মাধ্যম।

সামবেদ সংহিতা: যজ্ঞীয় সংগীত ও রাজন্য আভিজাত্য

সামবেদ মূলত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোর সুরারোপিত রূপ। যদিও এখানে ক্ষত্রিয় নারীদের নিয়ে আলাদা কোনো দীর্ঘ আখ্যান নেই, তবে এর গায়ন পদ্ধতি এবং যজ্ঞীয় প্রয়োগে রাজন্য নারীদের উপস্থিতির এক নান্দনিক দিক ফুটে ওঠে ৷

সংগীত ও রাজকীয় আভিজাত্যের সংযোগ

সামবেদের মন্ত্রগুলো যজ্ঞের সময় **‘উদ্গাতা’** নামক পুরোহিতরা গান করতেন। রাজকীয় যজ্ঞগুলোতে ক্ষত্রিয় নারীরা এই সংগীতের আবহে যজ্ঞীয় কৃত্য সম্পন্ন করতেন। সামবেদের সুরগুলো রাজ্যের শান্তি এবং রাজকীয় পরিবারের কল্যাণের জন্য গীত হতো। এখানে রাজমহিষীকে **‘বাগদীপ্তা’** বা বাকশক্তিতে তেজস্বিনী হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে, যাতে তাঁর নির্দেশ প্রজাদের দ্বারা মান্য হয়।

সামবেদের ‘আরণ্য গান’ এবং ‘গ্রাম গেয় গান’—উভয় পদ্ধতিতেই রাজার বিজয় এবং রানীদের সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ সুর প্রয়োগ করা হতো। সামবেদের প্রথম মন্ত্রেই ‘অগ্নি’কে নেতা এবং শাসক হিসেবে আবাহন করা হয়েছে, যা পরোক্ষভাবে ক্ষত্রিয় ধর্মের নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি। এই নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় নারীরাও পুরুষদের সাথে সমান অংশীদার ছিলেন।

ছন্দের প্রতীকী প্রভাব ও নারীর মর্যাদা

সামবেদে ব্যবহৃত স্বর এবং লয় রাজকীয় আভিজাত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ক্ষত্রিয় নারীদের কণ্ঠস্বর এবং তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত ধর্মীয় কার্যাবলিকে সামবেদের সুমধুর ছন্দের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা সমাজে তাঁদের উপস্থিতির এক সৌম্য অথচ দৃঢ় রূপ প্রকাশ করে। যজ্ঞীয় সভায় সামগান চলাকালীন রাজন্য নারীদের উপস্থিতি পুরো পরিবেশকে একটি আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক গাম্ভীর্য প্রদান করত। সামবেদের এই গীতধারা রাজন্য পরিবারের নারীদের সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক রুচির পরিচায়ক হিসেবে গণ্য হতো।

অথর্ববেদ সংহিতা: রাষ্ট্রীয় ও গার্হস্থ্য সার্বভৌমত্বের উৎস

অথর্ববেদ বৈদিক সাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ, সমাজনীতি এবং পারিবারিক সম্পর্কের গভীর চিত্র পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় নারীদের জন্য অথর্ববেদ অত্যন্ত ইতিবাচক এবং শক্তিশালী এক রূপরেখা প্রদান করেছে, যেখানে তাঁদের **‘সম্রাজ্ঞী’**

বা সম্রাজ্ঞী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে।

সম্রাজ্ঞী ও গৃহকর্ত্রী হিসেবে সার্বভৌমত্ব

অথর্ববেদের ১৪শ মণ্ডলে বিবাহের সূক্তগুলোতে ক্ষত্রিয় কন্যাদের 'সম্রাজ্ঞী' হওয়ার আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৪.১.৪৩-৪৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে, **"হে বধু, তুমি স্বামীর গৃহে গিয়ে সম্রাজ্ঞী হও। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ এবং দেবরদের ওপর তোমার রাজকীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক"**। এই কর্তৃত্ব বলতে কেবল পারিবারিক আধিপত্য নয়, বরং পরিবারের পরিচালক এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর উচ্চ মর্যাদা বোঝানো হয়েছে।

ক্ষত্রিয় নারীদের জন্য অথর্ববেদে **'বাশিনী'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হলো—যিনি বাকপটু এবং যাঁর কথা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে মান্য করা হয়। জনসভায় বা 'বিদাথা'তে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করা ছিল ক্ষত্রিয় নারীদের অন্যতম প্রধান গুণ।

শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও বৌদ্ধিক অধিকার

অথর্ববেদে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত জোরালোভাবে ঘোষিত হয়েছে। ১১.৫.১৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে, "কন্যা ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে বা বেদ শিক্ষা সমাপ্ত করে তবেই উপযুক্ত যুবককে পতি হিসেবে লাভ করেন।" রাজন্য কন্যাদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা ছিল বহুমুখী—তাঁদের একদিকে যেমন বেদ ও দর্শন শিখতে হতো, অন্যদিকে যুদ্ধবিদ্যা এবং ধনুর্বিদ্যার প্রশিক্ষণ নিতে হতো।

অথর্ববেদ পিতামাতাকে উপদেশ দেয় যে, তাঁরা যেন কন্যাকে বিদায় দেওয়ার সময় **'জ্ঞানের যৌতুক'** (Dowry of Knowledge) প্রদান করেন। ১৪.১.৬ মন্ত্রে উল্লেখ আছে যে, পিতামাতা কন্যাকে বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান করে তুলবেন, যাতে তিনি স্বামীর গৃহে গিয়ে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারেন।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক নেতৃত্ব

অথর্ববেদের ৭.৩৮.৪ এবং ১২.৩.৫২ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নারীরা আইনসভা বা বিধানসভায় (Legislative Chambers) অংশগ্রহণ করবেন এবং সেখানে নিজের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করবেন। ক্ষত্রিয় নারীদের বীরত্ব কামনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেন **'বীরসূ'** বা বীর পুত্রের জননী হন, যা কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং সাহসী ও নীতিবান নাগরিক গড়ার সামাজিক দায়িত্বকে নির্দেশ করে।

অথর্ববেদের ৭.৪৭.১ মন্ত্রে নারীকে **'সকল প্রকার কর্মের জ্ঞানের ভাণ্ডার'** হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই বর্ণনা নির্দেশ করে যে, রাজন্য নারীরা কেবল রাজকীয় আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকতেন না, বরং তাঁরা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানমূলক বিষয়েও গভীর জ্ঞান রাখতেন।

বৈদিক ক্ষত্রিয় নারীর স্বরূপ

চারটি বেদের তথ্যসূত্র একীভূত করলে ক্ষত্রিয় নারীদের অবস্থান সম্পর্কে কতগুলো গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় যা সেই সময়ের সমাজ-মনস্তত্ত্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

১. নেতৃত্বের ধারণা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব

বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয় নারীর 'সম্রাজ্ঞী' পদমর্যাদা কেবল লৌকিক উপাধি ছিল না। ঋগ্বেদ (১.৪৮.৮) অনুযায়ী, মহীয়সী নারীরা সমাজের নেতা এবং প্রজ্ঞার উৎস। যজুর্বেদের ২০.৮৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, বিদুষী নারী তাঁর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সমাজকে পবিত্র করেন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেন। এটি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেয় যে, বৈদিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজন্য নারীদের প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী ক্ষমতা ছিল।

২. শিক্ষা ও উপনয়ন সংস্কার

বৈদিক সমাজে ক্ষত্রিয় কন্যাদের জন্য **'উপনয়ন' বা বেদাধ্যয়নের প্রারম্ভিক সংস্কার** প্রচলিত ছিল। তাঁরা গুরুকুলে গিয়ে শিক্ষা লাভ করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতর দার্শনিক তর্কের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শিক্ষার এই সমানাধিকার তাঁদেরকে সমাজে পুরুষদের সাথে সমমর্যাদায় আসীন করেছিল। 'ব্রহ্মবাদিনী' হিসেবে জীবন অতিবাহিত করার স্বাধীনতা তাঁদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়।

৩. সামরিক শৌর্য ও আত্মরক্ষা

ক্ষত্রিয় নারীদের জন্য যুদ্ধবিদ্যা ছিল তাঁদের শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশপলা বা মুদগলানির মতো বীরাঙ্গনাদের কাহিনী কেবল রূপকথা নয়, বরং সেই সময়ের বাস্তব রণকৌশলের প্রতিফলন। যজুর্বেদে বর্ণিত **'নারী বাহিনী'র** ধারণাটি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

৪. আইনি ও অর্থনৈতিক অধিকার

সম্পত্তির ক্ষেত্রে বৈদিক সংহিতাগুলো অত্যন্ত উদার ছিল। ঋগ্বেদ অনুযায়ী, পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায় কন্যারও অধিকার স্বীকৃত ছিল। বিয়ের সময় প্রাপ্ত উপহার বা **'স্ত্রীধন'** ছিল সম্পূর্ণভাবে

নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, যা তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করত। এছাড়াও, 'পুত্রিকা' হিসেবে তিনি বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন।

৫. পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা

পারিবারিক জীবনে ক্ষত্রিয় নারীকে 'গৃহপত্নী' নয়, বরং 'সম্রাজ্ঞী' হিসেবে দেখা হয়েছে। তাঁর মতামতকে পরিবারের সকল স্তরে গুরুত্ব দেওয়া হতো। বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দের মর্যাদা ছিল (স্বয়ংবর), যা নির্দেশ করে যে বৈদিক যুগে নারীর মানবিক সত্তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হতো।

উপসংহার

বেদের সংহিতা অংশগুলোর সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নারীরা ছিলেন সমাজের এক অপরাজেয় এবং মহীয়সী শক্তি। তাঁরা যেমন রণাঙ্গনে শত্রু দমন করতে পারতেন, তেমনি যজ্ঞীয় বেদিতে বসে পবিত্র মন্ত্র পাঠ করে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা করতে পারতেন। তাঁদের মর্যাদা কেবল অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সভা, সমিতি এবং বিদাথা'র মতো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা জনসমক্ষে প্রকাশিত হতো।

ঋগ্বেদের বীরত্ব, যজুর্বেদের প্রশাসনিক তেজ, সামবেদের আধ্যাত্মিক সুষমা এবং অথর্ববেদের সামাজিক সার্বভৌমত্ব—এই চারটির সমন্বয়ে বৈদিক ক্ষত্রিয় নারীর যে প্রতিকৃতি ফুটে ওঠে, তা অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং গৌরবময়। পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনের ধারায় এই অধিকারগুলো অনেকাংশে সংকুচিত হলেও, মূল বৈদিক সংহিতা কিন্তু নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং নেতৃত্বের পক্ষেই সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। সুতরাং, বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয় নারীরা ছিলেন একাধারে শাস্ত্রবিদ, রণনিপুণা এবং রাষ্ট্রের যোগ্য কর্ণধার, যা আজও আমাদের ইতিহাসের এক অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের এই সকল বৈদিক গুণাবলী রপ্ত করতে হবে যাতে তারা আধুনিক যুগের যোগ্যতম নারী হয়ে উঠতে পারেন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



উপনিষদে ক্ষত্রিয়

শ্রীউপেন্দ্র বৈদ্য

প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসে উপনিষদীয় যুগ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। এই যুগে বৈদিক কর্মকাণ্ড এবং যজ্ঞীয় আচার-সর্বস্বতার সমান্তরালে এক গভীর অন্তর্মুখী জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণের উন্মেষ ঘটে, যার মূল লক্ষ্য ছিল 'ব্রহ্ম' এবং 'আত্মা'র স্বরূপ উদ্ঘাটন । প্রথাগতভাবে বৈদিক ঐতিহ্যে ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক একাধিপত্য স্বীকৃত থাকলেও, উপনিষদীয় সাহিত্যে এক বিস্ময়কর রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। এখানে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ কেবল শাসনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং ব্রহ্মবিদ্যার নিগূঢ় প্রবক্তা এবং আধ্যাত্মিক সত্যের শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন। এই রূপান্তর কেবল সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বৌদ্ধিক বিপ্লব যা প্রথাগত বর্ণাশ্রমের কাঠামোর মধ্যে জ্ঞানের নতুন পথ উন্মোচন করেছিল। উপনিষদে ক্ষত্রিয়দের এই ভূমিকা কেবল ইতিহাসের একটি অংশ নয়, বরং এটি আধুনিক হিন্দু দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি বা বেদান্তের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।

ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তি ও উপনিষদীয় প্রেক্ষাপটে সামাজিক অবস্থান - উপনিষদীয় সাহিত্যে 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি কেবল একটি যোদ্ধৃগোষ্ঠী বা শাসক শ্রেণীকে নির্দেশ করে না, বরং এটি এক বিশেষ গুণ, সামর্থ্য এবং আধ্যাত্মিক অধিকারের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'ক্ষত্র' শব্দটির মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো শক্তি, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা। তবে উপনিষদীয় দর্শনে এই ক্ষমতা কেবল জাগতিক শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক ও মহাজাগতিক শৃঙ্খলার (Dharma) সুরক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।

উপনিষদীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণের অস্তিত্ব থাকলেও ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক, অন্যদিকে তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যার নিবিড় গবেষক ও উদ্ভাবক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ক্ষত্রিয়দের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি বিশেষ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **আদি ব্রহ্ম যখন নিজেকে কেবল ব্রাহ্মণ রূপে প্রকাশ করে পর্যাপ্ত শক্তিশালী মনে করেননি, তখন তিনি আরও শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ এক শক্তির প্রয়োজন অনুভব করেন এবং 'ক্ষত্র' বা ক্ষত্রিয় শক্তি সৃষ্টি করেন।** এই কারণেই প্রাচীন যজ্ঞীয় প্রথায়, বিশেষত রাজসূয় যজ্ঞের সময়, ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় রাজার নিচে বসতে দেখা যায়, যা

রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি এক প্রকার আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি। এই বর্ণনা স্পষ্ট করে যে, উপনিষদীয় চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রশাসনিক শৌর্য—উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়ের এক বিশেষ ও অনন্য স্থান স্বীকৃত ছিল।

উপনিষদের অনেক আখ্যানে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁদের শৌর্য এবং বীরত্বের চেয়েও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার জন্য বেশি সমাদৃত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষত্রিয়দের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করা ছিল পরম গৌরবের, কিন্তু উপনিষদীয় ধারায় তাঁরা পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই রূপান্তরটিই উপনিষদকে বৈদিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করে এক উচ্চতর স্তরে স্থাপন করেছে।

যজ্ঞীয় আচারবাদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বৌদ্ধিক জাগরণ ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব - উপনিষদীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বৈদিক যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন। মুণ্ডক উপনিষদে এই যজ্ঞীয় ক্রিয়াকর্মকে 'অদৃঢ় নৌকা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি দিতে বা মোক্ষ লাভে সহায়তা করতে অক্ষম। এই প্রেক্ষাপটে ক্ষত্রিয়দের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি সামাজিক ও বৌদ্ধিক জাগরণ। তাঁরা দাবি করেছিলেন যে, কেবলমাত্র আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল যজ্ঞের মাধ্যমে পরম সত্য বা পরমাত্মাকে লাভ করা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন গভীর অন্তর্মুখী সাধনা, ধ্যান এবং নিগূঢ় জ্ঞান ।

এই বৌদ্ধিক জাগরণে ক্ষত্রিয় রাজারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উপনিষদীয় সাহিত্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঋষিরা নিগূঢ় সত্য এবং ব্রহ্মবিদ্যা শেখার জন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে বিনীতভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন। এটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একটি আমূল পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, যেখানে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব কেবল জন্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত না হয়ে বরং প্রকৃত প্রজ্ঞা এবং উপলব্ধির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে শুরু করেছিল। এই রূপান্তরকে অনেক গবেষক 'ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বৌদ্ধিক জাগরণ' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। এর ফলে জ্ঞানের এক প্রকার উদারীকরণ বা উদারপন্থা তৈরি হয়েছিল, যা প্রথাগত বর্ণাশ্রমের সীমানা পেরিয়ে সত্যের সন্ধানকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি এবং পঞ্চাগ্নি বিদ্যার নিগূঢ় দর্শন - ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাঞ্চালরাজ

প্রবাহণ জৈবলির উপাখ্যানটি ক্ষত্রিয়দের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞানের বিশেষ অধিকারের এক অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কাহিনীটি কেবল ক্ষত্রিয়র জ্ঞানগত উৎকর্ষ নয়, বরং একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক সত্যের ওপর তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

শ্বেতকেতুর ব্যর্থতা ও ক্ষত্রিয় জ্ঞানের রহস্য

ঋষি উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু বারো বছর গুরুকুলে অধ্যয়ন শেষ করে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি মনে করেছিলেন যে তিনি বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন । কিন্তু যখন তিনি পাঞ্চালের রাজা প্রবাহণ জৈবলির রাজসভায় উপস্থিত হন, তখন রাজা তাঁকে **পাঁচটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন:**

1. **মানুষের মৃত্যুর পর তারা কোন লোকে গমন করে?**
2. **তারা কীভাবে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে**

আসে বা পুনর্জন্ম লাভ করে?

3. **দেবযান ও পিতৃযান—এই দুই পথের বিভাজন কোথায় এবং কীভাবে ঘটে?**
4. **কেন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও পরলোক বা স্বর্গলোক পূর্ণ হয়ে যায় না?**
5. **পঞ্চম আহুতিতে 'জল' (বা রেত) কীভাবে পুরুষ বা মানুষ নামে অভিহিত হয়?**

শ্বেতকেতু এই প্রশ্নগুলোর কোনোটিরই উত্তর দিতে পারেননি এবং অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁর পিতার কাছে ফিরে যান। তিনি অভিযোগ করেন যে তাঁর পিতা তাঁকে অসম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মহাজ্ঞানী উদ্দালক আরুণিও এই উত্তরগুলো জানতেন না। তখন স্বয়ং উদ্দালক আরুণি বিনীতভাবে রাজা প্রবাহণ জৈবলির কাছে শিষ্য হিসেবে উপস্থিত হন।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা: মহাজাগতিক যজ্ঞের স্তরবিন্যাস

রাজা প্রবাহণ উদ্দালককে বরণ করে জানান যে, **এই বিশেষ জ্ঞান ইতিপূর্বে কখনও কোনো ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল না; এটি কেবল ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই বংশপরম্পরায় প্রচলিত ছিল।** তিনি যে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন তা **'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা'** (Doctrine of the Five Fires) নামে পরিচিত। এই বিদ্যায় সৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়া এবং পুনর্জন্মের চক্রকে পাঁচটি স্তরের যজ্ঞ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে:

যজ্ঞীয় অগ্নি (স্তর)	জ্বালানি ও উপচার	ফলাফল/ রূপান্তর
প্রথম অগ্নি: স্বর্গলোক	সূর্য (জ্বালানি), শ্রদ্ধা (আহুতি)	সোম রাজা (অমৃত বা সূক্ষ্ম দেহ)
দ্বিতীয় অগ্নি: পর্জন্য (মেঘ)	বায়ু (জ্বালানি), সোম (আহুতি)	বৃষ্টি
তৃতীয় অগ্নি: পৃথিবী	বৎসর (অগ্নি), বৃষ্টি (আহুতি)	অন্ন (খাদ্যশস্য)
চতুর্থ অগ্নি: পুরুষ	বাক বা জিহ্বা (অগ্নি), অন্ন (আহুতি)	রেত বা বীর্য (প্রাণের বীজ)
পঞ্চম অগ্নি: নারী	জরায়ু (অগ্নি), রেত (আহুতি)	গর্ভস্থ সন্তান বা মানুষ

এই তত্ত্বের মাধ্যমে প্রবাহণ জৈবলি প্রমাণ করেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তর একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। **জীবনের উৎপত্তি কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি মহাজাগতিক যজ্ঞের ফল যেখানে আকাশ, বায়ু, পৃথিবী এবং মানুষ—সবই অংশগ্রহণ করে।** ক্ষত্রিয়দের এই বিজ্ঞানসম্মত ও প্রতীকী দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, তাঁরা কেবল রণকৌশলী ছিলেন না, বরং জীবন ও জগতের গূঢ় রহস্যের আদি উদ্ভাবক ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছিলেন। এই বিদ্যাটিই পরবর্তীতে হিন্দুধর্মের **'পুনর্জন্ম' ও 'কর্মফল'** তত্ত্বে এক বৈপ্লবিক মাত্রা যোগ করে।

বিদেহরাজ জনক: ব্রহ্মজ্ঞানী রাজর্ষির আদর্শ

উপনিষদীয় সাহিত্যে ক্ষত্রিয়দের ভূমিকার আলোচনায় বিদেহরাজ জনকের নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি ছিলেন একাধারে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং অন্যদিকে গভীর ব্রহ্মজ্ঞানী এক মহাপুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনকের রাজসভা ছিল তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও তত্ত্বজ্ঞানীদের মিলনস্থল। সেখানে তিনি কেবল একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, বরং নিজে একজন দক্ষ বিতর্ককারী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হিসেবে আলোচনার নেতৃত্ব দিতেন।

জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ: পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মেলবন্ধন

যাজ্ঞবল্ক্য এবং জনকের কথোপকথন ব্রহ্মবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সম্পদ। একটি বিখ্যাত আখ্যানে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য যখন জনকের সভায় উপস্থিত হন, জনক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি সম্পদ (গবাদি পশু) না দর্শন—কীসের জন্য এসেছেন । যাজ্ঞবল্ক্য

উত্তর দেন, "উভয়ের জন্যই, হে রাজন" । এই উত্তরটি উপনিষদীয় ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির এক বিশেষ দিক উন্মোচন করে—যেখানে পার্থিব সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান একে অপরের পরিপূরক হতে পারে।

জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে এমন সব প্রশ্ন করেন যা মানুষের অস্তিত্বের মূল শিকড়কে স্পর্শ করে। তাঁদের সংলাপে **'আত্মজ্যোতি'র ধারণাটি** অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যখন সূর্য অস্ত যায়, চন্দ্র অস্ত যায়, অগ্নি নির্বাপিত হয় এবং এমনকি শব্দও স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষের পথপ্রদর্শক আলো কী? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেন যে, সেই সময় 'আত্মা' নিজেই নিজের জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই গভীর উপলব্ধিটি জনকের মতো একজন ক্ষত্রিয় রাজার প্রশ্নের মাধ্যমেই জগতের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল।

ক্ষত্রিয় দাতা ও জ্ঞানের সাধক

জনক কেবল তত্ত্ব শুনতেন না, তিনি জ্ঞানের বিনিময়ে মুক্তহস্তে দান করতেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সহস্র স্বর্ণখচিত ধেনু দান করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের বিশাল সাম্রাজ্য ও নিজেকেও ঋষির সেবায় উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এই ত্যাগের মানসিকতা প্রমাণ করে যে, ক্ষত্রিয় রাজারা ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও ব্রহ্মজ্ঞানের কাছে মাথা নত করতে দ্বিধা করতেন না। জনক **'বৈশ্বানর বিদ্যায়'** অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ঋষিরাও তাঁর কাছ থেকে এই বিশেষ বিদ্যার পাঠ নিতে আসতেন। তাঁর জীবন দর্শন 'কর্মযোগ' এবং 'জ্ঞানযোগ'-এর এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল, যা পরবর্তীতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনার মূলে স্থান করে নেয়।

কাশীরাজ অজাতশত্রু: অহংকারী ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা-বিজয়

কৌষীতকি এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে কাশীরাজ অজাতশত্রুর উপাখ্যানটি ক্ষত্রিয়দের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রাহ্মণ্য গর্বের অবসানের এক শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরে। এখানে ঋষি দৃপ্ত বালাকী (গর্গ গোত্রীয়) নামক এক দাম্ভিক ব্রাহ্মণ রাজার কাছে ব্রহ্মজ্ঞান দান করার প্রস্তাব নিয়ে আসেন ।

বালাকীর অপূর্ণ জ্ঞান ও অজাতশত্রুর সংশোধক ভূমিকা

বালাকী একের পর এক প্রাকৃতিক শক্তির পুরুষকে (সূর্যের পুরুষ, চন্দ্রের পুরুষ, বিদ্যুতের পুরুষ ইত্যাদি) ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করেন এবং সেগুলোর উপাসনার কথা বলেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে অজাতশত্রু বিনীতভাবে দেখিয়ে দেন যে, এগুলো ব্রহ্মের আংশিক বা সীমাবদ্ধ রূপ মাত্র, এগুলো পরম সত্য নয়। বালাকী যখন তাঁর জ্ঞানের অসারতা

বুঝতে পারেন, তখন তাঁর সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি ক্ষত্রিয় অজাতশত্রুর কাছে শিষ্য হিসেবে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

অজাতশত্রু তখন মন্তব্য করেন যে, এটি প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত (Pratiloam) যে একজন ব্রাহ্মণ একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। তা সত্ত্বেও তিনি বিনীত বালাকীকে হাত ধরে নিয়ে যান এবং সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর ঘুমের রহস্যের মাধ্যমে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে, **ঘুমের সময় মানুষের ইন্দ্রিয় ও মন যেভাবে সংকুচিত হয়ে হৃদয়ের 'হিত' নামক নাড়িতে অবস্থান করে এবং পরে সেখান থেকেই পুনরায় জাগ্রত হয়, তেমনি এই পরমাত্মা থেকেই বিশ্বের সমস্ত প্রাণ ও শক্তির উৎপত্তি।** এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ক্ষত্রিয়রা তখন ব্রহ্মবিদ্যার এমন এক উচ্চতর ও সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছেছিলেন যা অনেক প্রথাগত বৈদিক পণ্ডিতের ধারণার অতীত ছিল।

রাজা অশ্বপতি কৈকেয় এবং বৈশ্বানর আত্মার বিশ্বজনীন রূপ

ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা অশ্বপতি কৈকেয়র কাহিনীটি ক্ষত্রিয়দের আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এখানে পাঁচজন বিখ্যাত ঋষি এবং মহাজ্ঞানী উদ্দালক আরুণি পরমাত্মার স্বরূপ বা **'বৈশ্বানর আত্মা'** সম্পর্কে জানতে ব্যর্থ হয়ে রাজা অশ্বপতির শরণাপন্ন হন ।

অশ্বপতির আদর্শ রাজ্য ও নৈতিক মহত্ত্ব

অশ্বপতি কেবল একজন দার্শনিক রাজা ছিলেন না, তাঁর রাজত্ব ছিল নৈতিকতার এক অনন্য উদাহরণ। তিনি ঋষিদের সামনে গর্ব করে বলতে পারতেন, **"আমার রাজ্যে কোনো চোর নেই, কোনো কৃপণ নেই, কোনো মদ্যপ নেই, কোনো নিরক্ষর নেই এবং কোনো ব্যভিচারী পুরুষ বা নারী নেই"।** এই নৈতিক দৃঢ়তা প্রমাণ করে যে, ক্ষত্রিয়দের আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেবল তাত্ত্বিক ছিল না, বরং তা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিফলিত হতো।

আংশিক উপাসনা বনাম পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা

ঋষিরা যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হন, অশ্বপতি তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা কোন রূপের উপাসনা করছেন। কেউ আকাশকে, কেউ সূর্যকে, কেউ বায়ুকে উপাসনা করার কথা বললে রাজা তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেন। তিনি জানান যে, তাঁরা প্রত্যেকে পরমাত্মার একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের বা আংশিক রূপের উপাসনা করছেন এবং সেই কারণেই তাঁদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তিনি তাঁদের **'বৈশ্বানর আত্মা'র** ধারণা

দেন, যেখানে সমগ্র মহাবিশ্বকে একটি অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে দেখা হয়েছে:

পরমাত্মার অঙ্গ (মহাজাগতিক)	ঋষিদের পূর্ববর্তী উপাসনার বিষয়	অশ্বপতির সংশোধিত রূপক
মস্তক (Head)	আকাশ বা দ্যুলোক	বৈশ্বানর আত্মার মস্তক
চক্ষু (Eye)	সূর্য	বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু
প্রাণ (Breath)	বায়ু	বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ
দেহ বা কায়া (Body)	মহাকাশ বা আকাশ	বৈশ্বানর আত্মার কায়া
মূত্রাশয় (Bladder)	জল	বৈশ্বানর আত্মার মূত্রাশয়
পাদদেশ (Feet)	পৃথিবী	বৈশ্বানর আত্মার পাদদেশ

অশ্বপতি কৈকেয় শেখান যে, পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে বাইরে কোথাও খোঁজার প্রয়োজন নেই; নিজের শরীরের ভেতরেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অনুভূত হতে পারে। এই **মহাজাগতিক একত্ববোধ** (Macro-Microcosmic Identity) ক্ষত্রিয় চিন্তাধারার এক অতুলনীয় অবদান, যা উপনিষদীয় দর্শনের মূল ভিত্তি ।

চিত্র গাঙ্গ্যায়নি এবং পরলোকতত্ত্বের গভীর রহস্য

কৌষীতকি উপনিষদে **চিত্র গাঙ্গ্যায়নি (বা গার্গ্যায়নি)** নামক এক ক্ষত্রিয় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল শ্বেতকেতু ও উদ্দালকের মতো ঋষিদের কল্পনার অতীত। তিনি কেবল জাগতিক শাসনকর্তা ছিলেন না, বরং মৃত্যুর পরবর্তী আত্মার গতিবিধি সম্পর্কে এক রহস্যময় ও সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বের অধিকারী ছিলেন।

চিত্র গাঙ্গ্যায়নি ব্যাখ্যা করেন যে, ইহলোক ত্যাগকারী সমস্ত জীব প্রথমে চন্দ্রলোকে গমন করে। সেখানে তাদের কর্ম ও জ্ঞানের পরীক্ষা হয়। যারা সত্যের সঠিক উত্তর দিতে পারে না, তারা বৃষ্টির ধারার মাধ্যমে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তাদের কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন যোনিতে (যেমন কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সিংহ, মানুষ ইত্যাদি) জন্ম গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, যারা ব্রহ্মজ্ঞানী তারা দেবযান পথে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন লোক অতিক্রম করে অবশেষে ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হয় এবং জরাহীন (বিজর) নদী পার হয়ে অমরত্ব লাভ করে। এই যাত্রাপথের বিশদ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ক্ষত্রিয়রা কেবল রণকৌশল জানতেন না, বরং

তাঁরা পরকাল ও চেতনার বিবর্তন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রখর ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

পুনর্জন্ম ও কর্মফলের তত্ত্বে ক্ষত্রিয়দের প্রবর্তক ভূমিকা

উপনিষদীয় দর্শনের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটি স্তম্ভ হলো **'কর্মফল' (Karma) এবং 'পুনর্জন্ম'** (Rebirth)। আধুনিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক গবেষণায় এটি প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই তত্ত্বগুলোর মূলে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের বিশেষ অবদান ছিল। প্রাচীন বৈদিক সংহিতায় পুনর্জন্মের ধারণা ততটা সুস্পষ্ট বা বিকশিত ছিল না; সেখানে মূলত স্বর্গের সুখ বা পিতৃলোকের কল্পনা প্রাধান্য পেত। কিন্তু উপনিষদীয় যুগে ক্ষত্রিয়রাই প্রথম অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও যৌক্তিকভাবে প্রচার করেন যে, মানুষের বর্তমান জীবনের সামাজিক ও শারীরিক অবস্থা তার পূর্বজন্মের কর্মের অমোঘ ফল।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫.১০.৭ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, **যারা এ পৃথিবীতে ভালো আচরণ করে তারা পরবর্তী জন্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।** অন্যদিকে যারা অকুশল বা পাপ কর্ম করে, তারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল যোনিতে জন্ম লাভ করে। ক্ষত্রিয় রাজারা এই তত্ত্বটি কেবল আধ্যাত্মিক কারণেই নয়, বরং সমাজের নৈতিক ভারসাম্য ও শাসন ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্যও প্রবর্তন করেছিলেন বলে অনেক গবেষক মনে করেন। এটি একটি এমন দার্শনিক বিপ্লব ছিল যা পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারায় সম্পূর্ণভাবে আত্মীকৃত হয় এবং ভারতের সমগ্র ধর্মীয় কাঠামোর মূল শিকড় হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতর্দন দৈবোদাসি: প্রাণের ব্রহ্মত্ব ও যোদ্ধার প্রজ্ঞা

কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন ছিলেন এক মহান বীর ও রণকুশলী যোদ্ধা। উপনিষদীয় উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি স্বীয় শৌর্য ও বিক্রমে ইন্দ্রের লোকে (স্বর্গে) পৌঁছেছিলেন। ইন্দ্র তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললে প্রতর্দন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ও বিজ্ঞের মতো বলেন, **"হে ইন্দ্র, আপনিই আমার জন্য সেই বর চয়ন করুন যা মানুষের জন্য সবচেয়ে হিতকর"।**

ইন্দ্র তখন প্রতর্দনকে **'প্রাণ' বা জীবনীশক্তির আধ্যাত্মিক রহস্য** শিক্ষা দেন। ইন্দ্র বলেন, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা। আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করো" । এখানে 'প্রাণ' শব্দটি কেবল বায়ুর প্রবাহকে বোঝায় না, বরং

এটি সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে নির্দেশ করে যা জীবনের মূল উৎস। প্রতর্দন এই শিক্ষার মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে, মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ (বাক, চক্ষু, কর্ণ) বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে না; এগুলোর মূলে রয়েছে প্রাণ বা প্রজ্ঞা। একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা হয়েও প্রতর্দন যেভাবে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন, তা উপনিষদীয় ঐতিহ্যে ক্ষত্রিয়ের বৌদ্ধিক সামর্থ্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত ।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ: রাজকীয় বিনয় ও জ্ঞানের প্রতি ব্যাকুলতা

ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের কাহিনীটি ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের একটি মানবিক দিক উন্মোচন করে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, দাতা এবং প্রজাহিতৈষী রাজা। কিন্তু একদিন হংসদের (জ্ঞানী পুরুষের প্রতীক) মুখে রৈক্ক নামক এক সামান্য শকট-চালকের (Cart-driver) প্রশংসা শুনে তিনি নিজের জ্ঞানের দৈন্য অনুভব করে বিচলিত হন।

জানশ্রুতি প্রচুর ধন-সম্পদ, গবাদি পশু এবং রথ নিয়ে রৈক্কের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য যান। কিন্তু রৈক্ক তাঁকে 'শূদ্র' বলে সম্বোধন করে তাঁর উপহার ফিরিয়ে দেন। **এখানে 'শূদ্র' শব্দটি জন্মগত বর্ণকে নয়, বরং রাজার 'শোক' (Grief) বা মানসিক অশান্তিকে নির্দেশ করে বলে ভাষ্যকাররা মনে করেন।** জানশ্রুতি তখন তাঁর রাজকীয় অহংকার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বিনীতভাবে রৈক্কের কাছে পুনরায় ফিরে যান। অবশেষে রৈক্ক তাঁর বিনয়ে তুষ্ট হয়ে তাঁকে **'সংবর্গ বিদ্যা' (Absorption)** শিক্ষা দেন, যা বায়ু ও প্রাণের লয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। এই উপাখ্যানটি প্রমাণ করে যে, উপনিষদীয় ক্ষত্রিয় রাজারা সত্যের সন্ধানে কেবল সম্পদ নয়, বরং নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও রাজকীয় আভিজাত্যও তুচ্ছ করতে জানতেন।

উপনিষদীয় ক্ষত্রিয় শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষার ধরণ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি অনন্য ও বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা থেকে ভিন্ন ছিল:

১. বাস্তবমুখী ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি

ব্রাহ্মণদের শিক্ষা যেখানে অনেক সময় মন্ত্রের বিশুদ্ধতা এবং যজ্ঞীয় প্রক্রিয়ার জটিলতার ওপর জোর দিত, ক্ষত্রিয়দের শিক্ষা ছিল অনেক বেশি যুক্তিনির্ভর এবং জীবনমুখী। তাঁরা প্রাণের কার্যকারিতা, ঘুমের প্রকৃতি এবং বিশ্বের উৎস হিসেবে আকাশ বা বায়ুর মতো প্রত্যক্ষ উপাদানগুলোকে দার্শনিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতেন ।

২. মহাজাগতিক একাত্মতা (Universal Monism)

অশ্বপতি কৈকেয় বা প্রবাহণ জৈবলির শিক্ষায় একটি বিশ্বজনীন একাত্মতার ভাব অত্যন্ত প্রবল। তাঁরা আত্মাকে কেবল দেহের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। **'বৈশ্বানর আত্মা'র** ধারণাটি এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ।

৩. জীবন ও মৃত্যুর রহস্য ভেদে অগ্রণী

উপনিষদীয় গ্রন্থসমূহ নিজেই স্বীকার করেছে যে, জন্মান্তরবাদ ও পরলোকের গূঢ় রহস্য ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছেই সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল। এমনকি শ্রেষ্ঠ ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু বা মহাজ্ঞানী উদ্দালক আরুণিও এই বিদ্যায় ক্ষত্রিয় রাজাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ৷

ক্ষত্রিয় শিক্ষক	প্রধান উপনিষদ	প্রবর্তিত তত্ত্ব/বিদ্যা
প্রবাহণ জৈবলি	ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক	পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (পুনর্জন্ম ও সৃষ্টির স্তর)
অজাতশত্রু	কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক	সুষুপ্তি তত্ত্ব ও ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ
জনক বিদেহ	বৃহদারণ্যক	আত্মজ্যোতি ও ব্রহ্মের সর্বব্যাপ্ততা
অশ্বপতি কৈকেয়	ছান্দোগ্য	বৈশ্বানর বিদ্যা (মহা-প্রাণের ধারণা)
চিত্র গাঙ্গ্যায়নি	কৌষীতকি	পিতৃযান ও দেবযান পথের গতিপথ
প্রতর্দন	কৌষীতকি	প্রাণ-ব্রহ্মের অভিন্নতা

ঐতিহাসিক বিবর্তন: ক্ষত্রিয়দের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের কারণসমূহ

উপনিষদীয় যুগে ক্ষত্রিয়দের এই অসাধারণ বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক সক্রিয়তার পেছনে কিছু গভীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। বৈদিক সমাজের প্রাথমিক স্তরে যজ্ঞ ছিল সমৃদ্ধির প্রধান মাধ্যম। কিন্তু কালক্রমে যজ্ঞীয় ব্যয়, পশুবলি এবং ব্রাহ্মণ্য আচার-সর্বস্বতা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শাসক শ্রেণীর কাছেও প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করে ।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষত্রিয় রাজারা, যাঁরা প্রশাসনিকভাবে জনজীবনের সরাসরি দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা এমন এক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা বাহ্যিক আড়ম্বরের বদলে ব্যক্তিগত উপলব্ধি,

নৈতিকতা এবং ধ্যানের ওপর জোর দেয়। রাজন্যবর্গ যেহেতু তখন আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের হাতে অবসরের সময় ছিল, তাই তাঁরা বৌদ্ধিক চর্চায় অনেক বেশি মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের যে অনড় কাঠামো ছিল তাতে ফাটল ধরে এবং এক উদারপন্থী চিন্তার উদয় হয়। এই উদারপন্থা কেবল ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি পরবর্তীতে নারী ও তথাকথিত নিচু বর্ণের মানুষের জন্যও জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করতে সহায়ক হয়েছিল। রিচার্ড গার্বে এবং পাল ডয়সেনের মতো গবেষকরা মনে করেন, উপনিষদীয় এই জ্ঞানকাণ্ডের মূল ভিত্তিটি মূলত ক্ষত্রিয়দের হাতেই তৈরি হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ভারতের সমগ্র দার্শনিক ও নৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে ।

উপসংহার: ক্ষত্রিয়দের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

উপনিষদে ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা ও অবদান বিশ্লেষণ করলে এটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা কেবল সমাজ ও রাজ্যের রক্ষক ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ **'ব্রহ্মবিদ্যা'র** অন্যতম প্রধান স্রষ্টা ও পরিপোষক। প্রবাহণ জৈবলি থেকে শুরু করে জনক বা অজাতশত্রু পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষত্রিয় শিক্ষকই প্রমাণ করেছেন যে, **আধ্যাত্মিক সত্য বা পরম উপলব্ধি কোনো নির্দিষ্ট বর্ণের একচ্ছত্র সম্পত্তি হতে পারে না।**

ক্ষত্রিয়দের এই সক্রিয় অবদানের ফলেই ভারতীয় দর্শন বৈদিক যজ্ঞের ধোঁয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে আত্মার আলোকজ্জ্বল ও চিরন্তন সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তাঁরা যে পুনর্জন্ম, কর্মফল এবং বৈশ্বানর আত্মার ধারণা প্রদান করেছিলেন, তা আজও বেদান্ত দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে টিকে আছে। উপনিষদীয় ক্ষত্রিয় রাজারা দেখিয়ে গেছেন যে, একজন রাজা হয়েও কীভাবে অন্তরে সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্ততা এবং জ্ঞানীর মতো প্রজ্ঞা লালন করা সম্ভব। এই **'রাজর্ষি'** আদর্শই পরবর্তীতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। উপনিষদে ক্ষত্রিয়দের এই মহিমময় উপস্থিতি ও তাঁদের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ ভারতীয় প্রজ্ঞার ইতিহাসে এক স্বর্ণালী অধ্যায় এবং এক চিরন্তন বৌদ্ধিক জাগরণের স্মারক ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা উপনিষদীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। নিজেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য উপনিষদীয় শিক্ষা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।

সংহিতা বা স্মৃতি গ্রন্থে ক্ষত্রিয়

- শ্রীবিষ্ণু বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয়রা ছিলেন শৌর্য, বীরত্ব এবং প্রজা পালনের প্রতীক। বিভিন্ন সংহিতা বা স্মৃতিগ্রন্থে ক্ষত্রিয়দের কথা বলা হয়েছে। এগুলি পাঠ করলে ক্ষত্রিয় বর্ণের যে চিত্রটি ফুটে ওঠে, তা মূলত ত্যাগ, প্রজাবাৎসল্য এবং কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সমন্বয়। বিভিন্ন সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য ও জীবিকা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মোট ২০ টি সংহিতা বা স্মৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গির, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ-সংহিতা। এই সংহিতাসমূহে ক্ষত্রিয় বা রাজন্যদের কেবল একটি যোদ্ধা শ্রেণী হিসেবে নয়, বরং সমাজের প্রধান রক্ষক, ন্যায়বিচারের স্তম্ভ এবং শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

এই সংহিতাগুলোর আলোচনায় 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি মূলত 'ক্ষত্র' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো শাসনক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা আধিপত্য। যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব এবং গৌতমের মতো ঋষিদের সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় স্তর হিসেবে গণ্য করা হলেও তাদের দায়িত্বকে অত্যন্ত মহিমান্বিত করা হয়েছে। তারা মূলত আভিজাত্য ও শক্তির অধিকারী (Rajanya), যাদের প্রধান কাজ হলো সমাজের বৈষয়িক ও নৈতিক অখণ্ডতা রক্ষা করা।

সংহিতা অনুযায়ী, ক্ষত্রিয়রা হলেন 'দ্বিজ' বা দ্বিতীয়বার জন্মপ্রাপ্ত, যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং যজ্ঞ করার অধিকার রাখেন। তাদের এই মর্যাদা কেবল জন্মের ওপর নয়, বরং সমাজকে সুরক্ষা দেওয়ার মহান ব্রতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে মূল বক্তব্য গুলি তুলে ধরা হল -

১. উশনা সংহিতা: মহর্ষি উশনা ক্ষত্রিয়দের কর্মতৎপরতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, অলসতা ক্ষত্রিয়ত্বের পরিপন্থী। "অস্ত্রোপজীবিনঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়ানাং প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (উশনা সংহিতা, ১/১৯) অর্থাৎ, সকল ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম হলো অস্ত্রের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করা এবং সমাজ রক্ষা করা। তিনি আরও বলেছেন যে, রাজা বা ক্ষত্রিয় যদি অপরাধীকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হন, তবে তিনি মহাপাপের ভাগী হন।

২. হারিত সংহিতা: হারিত সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের বাহুবলের পাশাপাশি আত্মিক শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এখানে ক্ষত্রিয়কে 'দানশীল' এবং 'বিদ্বান' হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হারিত সংহিতা অনুযায়ী, ক্ষত্রিয়রা অধ্যয়ন করবেন কিন্তু অধ্যাপনা

করবেন না। যজ্ঞ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। প্রজাদের রক্ষার বিনিময়ে তারা যে কর গ্রহণ করবেন, তা যেন ন্যায়সঙ্গত হয়। "প্রজানাং রক্ষণাদ্ রাজঃ স্বর্গপ্রাপ্যতি সুনিশ্চিতম্।" (হারিত সংহিতা, শ্লোক সংখ্যা - ২/৭) অর্থাৎ, প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করলে রাজার (ক্ষত্রিয়) স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

৩. আপস্তম্ব সংহিতা: আপস্তম্ব সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের জন্য অত্যন্ত মহৎ ও মানবিক যুদ্ধনীতির উল্লেখ রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, তৎকালীন ক্ষত্রিয় বীরত্ব ছিল নৈতিকতা ভিত্তিক। আপস্তম্বের মতে, যারা যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বা নিরস্ত্র, যারা পলায়ন করছে কিংবা যারা অন্য কাজে ব্যস্ত—এমন শত্রুকে ক্ষত্রিয়রা আঘাত করবেন না। **"ন চ প্রমত্তং ন বিসংজ্ঞং ন বিবস্ত্রং ন নিরাষুধম্।" অর্থাৎ, অসতর্ক, সংজ্ঞাহীন, নগ্ন বা অস্ত্রহীন ব্যক্তির ওপর অস্ত্র চালনা করা ক্ষত্রিয় বীরত্বের কলঙ্ক।**

৪. শঙ্খ ও লিখিত সংহিতা: শঙ্খ ও লিখিত সংহিতা দুটিতে ক্ষত্রিয় রাজাদের বিচারবিভাগীয় দায়িত্বের ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। রাজা সর্বদা সত্যবাদী হবেন এবং ব্রাহ্মণদের পরামর্শ গ্রহণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। দণ্ডদানকালে তিনি যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হন। প্রজাদের সুখেই ক্ষত্রিয়ের সুখ এবং প্রজাদের বৃদ্ধিতেই ক্ষত্রিয়ের বৃদ্ধি।

৫. সম্বর্ত্ত সংহিতা: সম্বর্ত্ত সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের জন্য দানোৎসবের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সংহিতা অনুযায়ী, যে ক্ষত্রিয় অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অকাতরে দান করেন এবং শরণাগতকে অভয় প্রদান করেন, তিনি স্বশরীরে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। ক্ষত্রিয়দের জন্য 'অভয় দান' বা ভয়ার্তকে নিরাপত্তা দান করাই হলো শ্রেষ্ঠ দান।

৬. দক্ষ সংহিতা: দক্ষ সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের সময়ের সদ্ব্যবহার এবং কর্মকুশলতার প্রশংসা করা হয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজাকে দিনের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে শাসন, বিচার এবং প্রজা মিলনের সময় নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। অলস রাজা কখনো শত্রুকে জয় করতে পারেন না।

৭. শাতাতপ সংহিতা: শাতাতপ সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও শুদ্ধিকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয় যদি ভুলবশত কোনো পাপ করেন, তবে কঠোর ব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে পুনরায় বীরত্বের গৌরব ফিরে পেতে পারেন।

৮. অত্রি সংহিতাঃ অত্রি সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ হিসেবে প্রজাপালন ও দুষ্টের দমনের কথা বলা হয়েছে। **"প্রজানাং পালনং ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য প্রকীর্ত্তিতঃ।"** (অত্রি সংহিতা, শ্লোক ১৩) অর্থাৎ, প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দের পরম

ধর্ম। এছাড়া চোরদের নিগ্রহ করা এবং অস্ত্রধারণ করাকে তাঁর স্বাভাবিক কাজ বলা হয়েছে।

৯. বিষ্ণু সংহিতাঃ বিষ্ণু সংহিতা অনুযায়ী ক্ষত্রিয়দের জীবন বীরত্ব এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। এই সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে রাজার (ক্ষত্রিয়) কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, সম্মুখ সমরে মৃত্যু ক্ষত্রিয়র জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে (বিষ্ণু সংহিতা, ৩/৪৪)। **প্রজাদের রক্ষার বিনিময়ে তিনি ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণের অধিকারী।**

১০. যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাঃ যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয়দের জন্য শৌর্য ও বিনয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। **"প্রজানাং পালনে যুক্তো ধর্ম্মেনানুষ্ঠিতঃ স্বয়ম্।"** (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১/৩২৩) অর্থাৎ, রাজা নিজে ধর্ম পালন করবেন এবং প্রজাপালনে যুক্ত থাকবেন। যাজ্ঞবল্ক্য মতে, ব্রাহ্মণের মতোই ক্ষত্রিয়দেরও যজ্ঞ করা এবং দান করা অবশ্য কর্তব্য।

১১. অঙ্গিরা সংহিতাঃ অঙ্গিরা সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের তেজস্বিতা ও বীরত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। এই সংহিতা অনুযায়ী, ক্ষত্রিয়রা যদি অধর্মের পথে চলেন তবে তাঁদের তেজ নষ্ট হয়। প্রজাদের অভয় দান করাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ তপস্যা।

১২. যম সংহিতাঃ যম সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের দণ্ডদাতা ও বিচারক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। যম সংহিতার বিধান অনুযায়ী, যে ক্ষত্রিয় প্রজাদের রক্ষা না করে কর গ্রহণ করেন, তিনি নরকগামী হন। রক্ষাকর্তা হিসেবে ক্ষত্রিয়কে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

১৩. পরাশর সংহিতাঃ পরাশর সংহিতা কলিযুগের ক্ষত্রিয় ধর্মের নির্দেশিকা। "ক্ষত্রিয়ো হি ধনুষ্পাণিঃ প্রজাপালনতৎপরঃ।" (পরাশর সংহিতা, ১/৬৫) অর্থাৎ, হাতে ধনু নিয়ে প্রজাপালনে তৎপর থাকাই তাঁর কাজ। এছাড়া পরাশর মতে, শত্রুকে জয় করা ক্ষত্রিয়র পরম ধর্ম।

১৪. ব্যাস সংহিতাঃ ব্যাস সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের কৃষিকাজ বা বাণিজ্যে লিপ্ত না হয়ে বীরত্বের পথে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের ২৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয় যজ্ঞ করবেন কিন্তু যাজন (পুরোহিত্য) করবেন না।

১৫. গৌতম সংহিতাঃ গৌতম সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের বিশেষাধিকার ও কর্তব্যের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। দশম অধ্যায়ের শ্লোক ১-৫ এ বলা হয়েছে, রাজা বা ক্ষত্রিয় সকলের অধিপতি হবেন এবং ত্রয়ীবিদ্যা (তিন বেদ) অধ্যয়ন করবেন।

১৬. বসিষ্ঠ সংহিতাঃ বসিষ্ঠ ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে রাজ্য শাসনের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪-১৫ নং শ্লোকে ক্ষত্রিয়দের জন্য দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞ করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

১৭. কাত্যায়ন সংহিতাঃ কাত্যায়ন সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের প্রশাসনিক

ন্যায়পরায়ণতা এবং রাজধর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ হলো ন্যায়বিচার করা। রাজা যদি লোভ ত্যাগ করে প্রজা পালন করেন, তবে তিনি পরম পদ লাভ করেন। কাত্যায়ন ক্ষত্রিয়দের জন্য প্রজাদের অভাব দূর করাকে শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলেছেন।

১৮. বৃহস্পতি সংহিতাঃ বৃহস্পতি সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের বীরত্ব ও উদ্যমের প্রশংসা করা হয়েছে। বৃহস্পতির মতে, অলসতা ক্ষত্রিয়দের প্রধান শত্রু। **"উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।"** (বৃহস্পতি সংহিতা, নীতি অংশ) যদিও এটি সাধারণ নীতি, ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলা হয়েছে যাতে তারা সর্বদা রণক্ষেত্রে ও রাজ্যশাসনে সজাগ থাকেন।

১৯. **মনুসংহিতাঃ** মনুসংহিতা বা 'মানবধর্মশাস্ত্র' হলো প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। মহর্ষি মনু ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি, কর্তব্য এবং জীবনধারা সম্পর্কে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট বিধান দিয়েছেন। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার জন্য পরমেশ্বর তাঁর বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে শৌর্য (বীরত্ব), তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা এবং যুদ্ধে অপরাজিত থাকার মানসিকতা।

মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষত্রিয়দের জন্য প্রধানত ছয়টি কর্ম বা কর্তব্যের উল্লেখ রয়েছে:

প্রজাপালন: প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাঁদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকা।

দান: যোগ্য পাত্রে (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও অভাবীদের) অকাতরে দান করা।

যজন: শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা।

অধ্যয়ন: বেদ এবং অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করা।

বিষয়াসক্ত না হওয়া: ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন না হয়ে সংযমী জীবন যাপন করা।

শস্ত্রধারণ: দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য সর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকা।

মনুর মতে, রাজধর্ম বা ক্ষত্রিয় ধর্মের মূল ভিত্তি হলো **'দণ্ড'**। রাজা যদি সঠিক সময়ে এবং সঠিক পাত্রে দণ্ড (শাস্তি) প্রয়োগ না করেন, তবে সমাজে অরাজকতা বা 'মাৎস্যন্যায়' (বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, তেমনি শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করবে) তৈরি হবে। একজন ক্ষত্রিয়কে সর্বদা ন্যায়পরায়ণ বিচারক হতে হবে।

ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধের ক্ষেত্রে মনু কঠোর কিছু নৈতিক নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন:

- যুদ্ধে পলায়ন করা ক্ষত্রিয়র জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং পাপের কাজ।
- ঘুমন্ত, নিরপরাধ, শরণাগত বা অস্ত্রহীন শত্রুর ওপর আঘাত করা নিষিদ্ধ।
- বিষাক্ত বা অগ্নিদায়ক বাণ ব্যবহার করা অধর্ম বলে গণ্য করা হয়েছে।

কর গ্রহণ সম্পর্কে মনু বলেছেন - প্রজাদের রক্ষার বিনিময়ে রাজা বা ক্ষত্রিয়রা প্রজাদের উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগ) কর হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। তবে এই কর আদায়ের সময় যেন প্রজাদের কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একে অপরের পরিপূরক। শাস্ত্রজ্ঞান ও বাহুবল যখন মিলিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব। **মনুসংহিতা অনুযায়ী, একজন ক্ষত্রিয়র জীবনের সার্থকতা কেবল রাজ্য জয়ে নয়, বরং সত্য রক্ষা এবং আর্তের সেবায়।** যদি কোনো ক্ষত্রিয় প্রজাপালনে অবহেলা করেন, তবে তিনি নরকগামী হন; পক্ষান্তরে, কর্তব্য পালনকারী রাজা ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন।

সংহিতা বা স্মৃতি গ্রন্থে নারী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারী ছিল শক্তির আধার এবং গৃহের লক্ষ্মী। নারীদের সুরক্ষাদান, তাঁদের ভরণপোষণ এবং পারিবারিক জীবনে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত ইতিবাচক ও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। সংহিতাগুলিতে নারীকে কেবল গৃহকর্ত্রী নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও মাঙ্গলিক কার্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। **অত্রি সংহিতায়** নারীর পবিত্রতা নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক কথা বলা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে যে, **নারীরা কখনও অপবিত্র হন না**; জল যেমন বহমান থাকলে পবিত্র থাকে, নারীও তেমনই স্বভাবত শুদ্ধ। **"স্ত্রিয়ঃ পবিত্রাঃ সর্বদা নাপবিত্রা ভবন্তি হি।"** (অত্রি সংহিতা, শ্লোক ১৯০-১৯১-এর ভাবার্থ)। **বিষ্ণু সংহিতায়** মাতাকে পিতার চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, উপাধ্যায় বা আচার্যের চেয়ে পিতা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু **পিতার চেয়েও সহস্রগুণ অধিক মাননীয়া হলেন মাতা।** নারীদের আর্থিক সুরক্ষার বিষয়ে সংহিতাগুলি অত্যন্ত আধুনিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। **যাজ্ঞবল্ক্য** 'স্ত্রীধন' বা নারীর নিজস্ব সম্পত্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবাহকালে বা বিবাহের পর আত্মীয়দের কাছ থেকে নারী যা লাভ করেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সম্পদ। **"পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্নুপাগতং। আধিব্বেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২/১৪৩) অর্থাৎ মাতা, পিতা, পতি বা ভ্রাতা কর্তৃক প্রদত্ত ধন এবং বিবাহের অগ্নির সামনে যা পাওয়া যায়, তাই হলো স্ত্রীধন।** যাজ্ঞবল্ক্য

আরও বলেন, নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে সর্বাগ্রে পত্নীর অধিকার থাকবে। নারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় ক্ষত্রিয় ও পুরুষদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। **বসিষ্ঠের** মতে, **কোনো অবস্থাতেই নারীকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।** এমনকি কোনো বিপথগামী নারীকেও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পুনরায় মূলধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান তিনি দিয়েছেন। (বসিষ্ঠ সংহিতা, ২৮শ অধ্যায়)। পরাশর নারী সুরক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, **বিপদে পড়া বা অনাথ নারীকে রক্ষা করা সমাজের প্রধান দায়িত্ব।** নারীদের অনুপস্থিতিতে কোনো মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন হয় না বলে সংহিতাগুলিতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **মহর্ষি ব্যাস গার্হস্থ্য জীবনে নারীর উপস্থিতিকে স্বর্গসুখের সমান বলেছেন।** তিনি বলেন, যেখানে নারীগণ সুখে থাকেন এবং সম্মানিত হন, সেখানে দেবতারা আনন্দিত থাকেন। **দক্ষ সংহিতায়** আদর্শ পত্নীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে নারী দক্ষভাবে গৃহ পরিচালনা করেন এবং পতির প্রতি অনুরাগী থাকেন, তিনিই প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী। (দক্ষ সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়)

সবগুলো সংহিতার সাধারণ সুর হলো—**মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।** মাতাকে অপমান করা বা সেবা না করাকে মহাপাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। **শঙ্খের** মতে, **মাতাকে ভোজন না করিয়ে নিজে ভোজন করা পাপ।** মাতা সর্বদা পূজনীয়া এবং ক্ষমার পাত্রী। মহর্ষি হারিত নারীদের দুটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং তাঁদের ব্রহ্মবাদিনী (যারা শাস্ত্র চর্চা করেন) ও সদ্যোবধূ (যারা বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেন) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। **হারিত সংহিতায়** বলা হয়েছে যে, **নারীরাও যজ্ঞোপবীত ধারণ ও বেদাধ্যয়ন করার যোগ্য। তবে গৃহস্থ নারীদের জন্য স্বামী ও পরিবারের সেবাই হলো প্রধান তপস্যা। গৌতম সংহিতায়** নারীদের আইনি অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গৌতমের মতে, পথ চলার সময় যেমন ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দিতে হয়, তেমনি অন্তঃসত্ত্বা নারী বা ভারবাহী নারীকেও অগ্রাধিকার দিয়ে পথ ছেড়ে দেওয়া রাজধর্মের অংশ। গৌতম সংহিতায় বলা হয়েছে, কুমারী বা অনির্ধারিত কন্যাদের পিতৃসম্পত্তিতে অধিকার থাকবে। এছাড়া স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য অধিকারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। (গৌতম সংহিতা, ২৮ অধ্যায়)। নারীর নিজস্ব সম্পদের (স্ত্রীধন) ওপর **কাত্যায়ন** অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। **"ন ভর্তা নৈব চ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ। আদানং বা বিসর্গং বা স্ত্রীধনে প্রভবষ্ণবঃ ॥" অর্থাৎ, পতি, পুত্র, পিতা বা ভ্রাতা—কারও অধিকার নেই নারীর স্ত্রীধন গ্রহণ করার বা তা খরচ করার।**

যদি কেউ বলপূর্বক তা গ্রহণ করে, তবে তাকে দণ্ড দিতে হবে। কাত্যায়ন নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্যতম প্রবক্তা। অঙ্গিরা সংহিতায় নারীর অন্তর্নিহিত শুদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে। **অঙ্গিরা বলেন**, চন্দ্র নারীদের শৌচ (পবিত্রতা) দিয়েছেন, গন্ধর্বরা শুভ বাক্য দিয়েছেন এবং অগ্নি সর্বমেধত্ব দিয়েছেন। **তাই নারীরা সর্বদা পবিত্র।** কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে নারী কলঙ্কিত হলেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তিনি পুনরায় পবিত্র হন—নারীর প্রতি এই ক্ষমাশীল ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্গিরা সংহিতায় প্রধান। **যম সংহিতার মতে, যে পরিবারে নারীরা শোকাতুর থাকেন, সেই পরিবার ও রাষ্ট্র অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। শাতাতপ সংহিতায় বলা হয়েছে,** বিধবা বা স্বামীহীনা নারীকে সমাজ ও আত্মীয়দের দ্বারা সযত্নে রক্ষা করতে হবে। তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব রাজাকে (শাসককে) নিতে হবে। **সম্বর্ত্ত সংহিতায়** দাম্পত্য জীবনে নারীর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সম্বর্ত্তের মতে, **পতি ও পত্নী মিলে যে দান বা ধর্মকার্য করেন, তার ফল অক্ষয় হয়।** পত্নীকে "অর্ধশরীরের" মর্যাদা দিয়ে তিনি পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। **পরাশর সংহিতা** নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়েছে। পরাশর মতে, যুদ্ধে বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত নারীদের সমাজচ্যুত না করে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পুনরায় সম্মানের সাথে পরিবারে গ্রহণ করতে হবে। (পরাশর সংহিতা, ১০ম অধ্যায়)। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হবে ক্ষমাশীল ও রক্ষামূলক, ঘৃণামূলক নয়। **দক্ষ সংহিতায়** আদর্শ পত্নীর দক্ষতা বর্ণনা করা হয়েছে। **"অনুকূলা ন বাদিণী... সা স্ত্রী শ্রীশ্চ ন সংশয়ঃ।"** (দক্ষ সংহিতা, ৪/৭)। যে নারী মিষ্টভাষিণী, গৃহকর্মে নিপুণা এবং পরিবারের অনুকূল, তিনিই গৃহের লক্ষ্মী—এতে কোনো সংশয় নেই। সংহিতার সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারী কেবল গৃহের অলঙ্কার নন, বরং তিনি ছিলেন ধর্মের সহচরী। প্রতিটি সংহিতা একবাক্যে ঘোষণা করেছে যে, নারীর সম্মান ও অধিকার রক্ষা করাই হলো প্রকৃত সমাজধর্ম। তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (স্ত্রীধন), সামাজিক মর্যাদা (মাতৃত্ব) এবং আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই সংহিতাগুলি একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের চিত্র তুলে ধরেছে। সংহিতার আলোকে এটি স্পষ্ট যে, নারী ছিলেন পরিবারের মূল চালিকাশক্তি। শাস্ত্রকারগণ নারীদের কেবল গৃহকোণে আবদ্ধ রাখেননি, বরং তাঁদের স্ত্রীধন ও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে আর্থিক স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং মাতৃত্বের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সামাজিক সম্মান প্রদান করেছেন। সংহিতাগুলিতে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সহমর্মী এবং সম্মানজনক।

সংহিতার এই বিশদ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষত্রিয় চরিত্র ছিল শৌর্য ও করুণার এক সংমিশ্রণ। তাঁরা কেবল শক্তির উপাসক ছিলেন না, বরং শাস্ত্র ও ন্যায়ের অনুশাসনে আবদ্ধ থেকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে ব্রতী ছিলেন। প্রজাদের সুখ ও নিরাপত্তাই ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।





পুরাণে ক্ষত্রিয়

- শ্রীআত্মবান সাধু

ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত বর্ণাশ্রম প্রথা এবং তার অন্তর্ভুক্ত ক্ষত্রিয় বর্ণের ভূমিকা পুরাণ সাহিত্যে অত্যন্ত মহিমান্বিতভাবে চিত্রিত হয়েছে। পুরাণ কেবল প্রাচীন কাহিনী বা উপকথা নয়, বরং এটি একটি জাতির নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দর্শনের ধারক। এই বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারে ক্ষত্রিয় বর্ণকে মহাজাগতিক শৃঙ্খলার রক্ষক, ধর্মের ধারক এবং প্রজার কল্যাণকামী শাসক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। 'ক্ষত্রিয়' শব্দের উৎপত্তি, তাদের দৈব সৃষ্টিতত্ত্ব, রাজধর্মের সূক্ষ্ম বিধান এবং যুদ্ধক্ষেত্রের নৈতিকতা—এই সবকিছুই প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় ক্ষত্রিয়ের উপস্থিতি ছিল সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এক অপরিহার্য শক্তি ।

ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তি ও দার্শনিক ভিত্তি

ক্ষত্রিয় পরিচয়ের মূলে রয়েছে 'ক্ষত্র' নামক এক গভীর দার্শনিক ও রাজকীয় ধারণা। সংস্কৃত 'ক্ষত্র' ধাতু থেকে উদ্ভূত এই শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, শাসন বা আধিপত্য। তবে পুরাণের প্রেক্ষাপটে এই ক্ষমতা কেবল

পেশিশক্তির প্রদর্শন নয়, বরং এটি হলো সেই সার্বভৌম শক্তি যা সমাজকে অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য এবং বাহ্যিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বিন্যস্ত।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও ক্ষত্রিয় বর্ণের দৈব উদ্ভব

পুরাণ সাহিত্য ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তিকে কোনো আকস্মিক সামাজিক ঘটনা হিসেবে দেখে না, বরং একে একটি মহাজাগতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বর্ণনা করে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষসূক্ত' থেকে শুরু করে বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টির যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রতীকী এবং অর্থবহ।

বিষ্ণু পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব: নেতিবাচক শক্তির বিনাশ

বিষ্ণু পুরাণে একটি অত্যন্ত চমৎকার আখ্যান পাওয়া যায় যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি কার্য শুরু করেন, তখন তাঁর শরীর থেকে নির্গত নেতিবাচক শক্তি থেকে কিছু অশুভ আত্মা বা রাক্ষসের উদ্ভব হয় যারা স্বয়ং ব্রহ্মাকেই উৎপীড়ন করতে শুরু করে। এই সংকটকালে ভগবান বিষ্ণু পরামর্শ দেন যে, জগতকে রক্ষা করার জন্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি বিশেষ শক্তিশালী মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজন থেকেই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করেন যারা সাহস ও শক্তির মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে দমন করবে। এই কাহিনীটি ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে মহিমান্বিত করে—তারা কেবল শাসন করার জন্য নয়, বরং **পৃথিবীকে অধর্মের গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।**

বর্ণ সৃষ্টির সময়কাল ও গুণের বিন্যাস

পুরাণ অনুসারে, সৃষ্টির চার বর্ণ দিনের চার সময়ে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রাহ্মণরা ঊষাকালে (ভোর), ক্ষত্রিয়রা মধ্যাহ্নে (দুপুর), বৈশ্যরা অপরাহ্নে (বিকেল) এবং শূদ্ররা রাত্রিকালে উৎপন্ন হয়েছেন। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য ক্ষত্রিয়ের তেজ ও বীরত্বের প্রতীক, যা সমস্ত অন্ধকারকে দূর করার ক্ষমতা রাখে। এই দৈব উৎপত্তি ক্ষত্রিয়কে এক বিশেষ পবিত্রতা দান করে, যা তাকে কেবল একজন সাধারণ যোদ্ধা নয়, বরং ভগবানের আদেশের বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

বর্ণ	উৎপত্তির উৎস (বিরাট পুরুষ)	গুণগত বৈশিষ্ট্য	প্রতীকী সময়
ব্রাহ্মণ	মুখ	সত্ত্ব (জ্ঞান)	ঊষা (ভোর)
ক্ষত্রিয়	বাহু	রজস (তেজ ও	মধ্যাহ্ন (দুপুর)

বর্ণ	উৎপত্তির উৎস (বিরাট পুরুষ)	গুণগত বৈশিষ্ট্য	প্রতীকী সময়
		বীরত্ব)	
বৈশ্য	উরু	রজস ও তমস (বাণিজ্য)	অপরাহ্ন (বিকেল)
শূদ্র	পা	তমস (সেবা)	রাত্রি

রাজধর্ম: ক্ষত্রিয়ের শাসনতান্ত্রিক ও নৈতিক দর্শন

পুরাণের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুগুলোর একটি হলো **রাজধর্ম (Rajadharma),** যা একজন ক্ষত্রিয় রাজার শাসন পরিচালনার নৈতিক কাঠামো তৈরি করে। রাজধর্ম কেবল রাজনীতি নয়, এটি হলো আধ্যাত্মিকতা ও প্রশাসনের এক অপূর্ব সমন্বয়। **পুরাণের মতে,** একজন রাজার প্রধান সাফল্য কেবল দিগ্বিজয় নয়, বরং তার প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

প্রজাপালনের মহিমা

বিষ্ণু পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, **রাজা হলেন প্রজাদের পিতা।** 'প্রজাপালক' হিসেবে রাজার দায়িত্ব হলো সমাজ থেকে ভয় দূর করা এবং প্রতিটি বর্ণের মানুষকে তাদের নিজস্ব কর্তব্য পালনে সহায়তা করা। একজন ক্ষত্রিয় রাজা যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি শপথ নেন যে তিনি প্রজাদের কল্যাণকেই নিজের কল্যাণ হিসেবে গণ্য করবেন। এই দর্শনটি আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের (Welfare State) আদি রূপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

দণ্ডনীতি ও ন্যায়বিচার

ক্ষত্রিয়ের শাসনের অন্যতম হাতিয়ার হলো 'দণ্ড' (Danda)। দণ্ড মানে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা, কিন্তু পুরাণে একে ধর্মের রক্ষক হিসেবে দেখা হয়েছে। **দণ্ডনীতি ছাড়া সমাজ 'মাৎস্যন্যায়' বা নৈরাজ্যের কবলে পড়ে, যেখানে বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলে। ক্ষত্রিয় রাজা এই দণ্ডের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করেন।** দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজাকে অত্যন্ত সংযত এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অনুসারী হতে হয়।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্পর্ক: জ্ঞান ও শক্তির মেলবন্ধন

পুরাণগুলোতে রাজা বা ক্ষত্রিয়ের সাথে ব্রাহ্মণের সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও ক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক

ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তারা সর্বদা অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ঋষি বা ব্রাহ্মণদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এই সম্পর্কের মূল কথা হলো—পেশিশক্তি (Kshatra) যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান (Brahma) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সমাজ সমৃদ্ধ হয়। দশরথের পরামর্শক হিসেবে বশিষ্ঠ বা কুরু বংশের উপদেষ্টা হিসেবে কৃপাচার্যর ভূমিকা এই সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। ক্ষত্রিয় রাজার জন্য এটি আবশ্যিক ছিল যে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক পুণ্য অর্জন করবেন ।

যুদ্ধনীতি ও ধর্মযুদ্ধ: মহাকাব্যিক শৌর্য ও মানবিকতা

পুরাণ সাহিত্যে যুদ্ধের বর্ণনা কেবল ধ্বংসের আখ্যান নয়, বরং এটি বীরত্বের এক আধ্যাত্মিক সংজ্ঞা। **ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ করা ছিল এক প্রকার যজ্ঞ, যাকে 'রণযজ্ঞ' বলা হতো।** তবে এই যুদ্ধ কোনো অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত নয়, বরং তা ছিল কঠোর নৈতিক বিধিতে আচ্ছন্ন ।

ধর্মযুদ্ধ বনাম কূটযুদ্ধ

পুরাণে যুদ্ধের দুটি ধারা বর্ণিত হয়েছে—**ধর্মযুদ্ধ (Fair War) এবং কূটযুদ্ধ (Treacherous War)।** একজন আদর্শ ক্ষত্রিয়ের কাছে ধর্মযুদ্ধই ছিল একমাত্র বরণীয় পথ। ধর্মযুদ্ধের মূল ভিত্তি ছিল **সাম্যাবস্থা।** অর্থাৎ, একজন রথী কেবল রথীর সাথে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সাথে এবং পদাতিক কেবল পদাতিকের সাথে যুদ্ধ করবে। এটি আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের তুলনায় অনেক বেশি উচ্চতর নৈতিক অবস্থান, কারণ এটি যুদ্ধের মধ্যেও মানবিক মর্যাদা বজায় রাখত।

অ-যোদ্ধা ও শরণাগত সুরক্ষা

অগ্নি পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে যুদ্ধক্ষেত্রে যে মানবিক বিধিনিষেধগুলো পাওয়া যায়, তা আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (IHL) সাথে চমৎকারভাবে তুলনীয় । ক্ষত্রিয়ের জন্য নিষিদ্ধ ছিল:

- অস্ত্রহীন বা আহত শত্রুকে আঘাত করা।
- রণক্ষেত্র থেকে পলায়নরত ব্যক্তিকে আক্রমণ করা।
- অসতর্ক বা ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর হামলা চালানো।
- শরণাগত বা 'আমি তোমার' বলে আশ্রয় চাওয়া ব্যক্তিকে ক্ষমা না করা।
- যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন সাধারণ মানুষকে উত্ত্যক্ত করা।

এই শৌর্যগাথা প্রমাণ করে যে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব ছিল কৃপাপূর্ণ এবং নীতিবদ্ধ। যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা ক্ষত্রিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মান হিসেবে গণ্য হতো, যা তাকে **'বীরস্বর্গ'** বা উচ্চতর লোকে আসীন করত ।

যুদ্ধনীতির নিয়ম	পুরাণের বর্ণনা (অগ্নি পুরাণ/মহাভারত)	আধুনিক সমান্তরাল (IHL)
সমতা	রথী বনাম রথী; পদাতিক বনাম পদাতিক	আনুপাতিক শক্তি ব্যবহার
সুরক্ষা	নিরস্ত্র, শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষা	অ-যোদ্ধা (Non-combatant) সুরক্ষা
ক্ষমা	শরণাগতকে প্রাণদান	যুদ্ধবন্দীদের (POW) অধিকার
অস্ত্র	বিষাক্ত বা অন্যায় অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ রাসায়নিক/পারমাণবিক অস্ত্র

আদর্শ ক্ষত্রিয় বংশ ও চরিত্রসমূহ: পুরাণের চিরন্তন উত্তরাধিকার

পুরাণগুলো প্রধানত দুটি মহান ক্ষত্রিয় রাজবংশের ইতিহাস বর্ণনা করে—সূর্যবংশ (Suryavansha) এবং চন্দ্রবংশ (Chandravansha)। এই বংশগুলোর কাহিনী ভারতীয় জাতির সাংস্কৃতিক ডিএনএ তৈরি করেছে ।

সূর্যবংশ ও সত্যের জয়গান

সূর্যবংশ হলো নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। এই বংশের সবচেয়ে মহান শাসক **শ্রীরামচন্দ্র**, যিনি 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' হিসেবে পূজিত হন। রামের চরিত্র ক্ষত্রিয়ের সেই আদর্শকে তুলে ধরে যেখানে ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে প্রজাদের ইচ্ছা ও সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাজা **হরিশচন্দ্রের** কাহিনীও এই বংশের অন্যতম গৌরব, যিনি সত্য রক্ষার জন্য নিজের পরিবার এবং রাজ্য উৎসর্গ করেছিলেন। এই কাহিনীগুলো প্রমাণ করে যে **ক্ষত্রিয়ের আভিজাত্য কেবল রক্তে নয়, বরং তার সত্যনিষ্ঠায়।**

চন্দ্রবংশ ও বীরত্বের বহুত্ববাদ

চন্দ্রবংশ তার বিশালতা এবং বীরত্বগাথার জন্য পরিচিত। কুরু, পাণ্ডু এবং যদু বংশ—এই সবকিছুই চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতের যুদ্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো যেমন—ভীষ্ম, অর্জুন এবং যুধিষ্ঠির—ক্ষত্রিয় ধর্মের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও ত্যাগ এবং অর্জুনের গাণ্ডীব চালনা ক্ষত্রিয়ের শারীরিক ও মানসিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করে দেখিয়েছেন যে

কীভাবে জ্ঞানের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ের শৌর্যকে ধর্মের সাথে যুক্ত করতে হয়।

অন্যান্য রাজবংশ ও আঞ্চলিক প্রভাব

পুরাণে কেবল উত্তর ভারতের রাজবংশ নয়, বরং সমগ্র আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের রাজবংশগুলোর কাহিনীও পাওয়া যায়। সগর রাজার কাহিনী, যিনি সমুদ্র খনন করেছিলেন, কিংবা রাজা ভরত, যাঁর নামানুসারে আমাদের দেশের নাম হয়েছে 'ভারতবর্ষ'—এঁরা সবাই ছিলেন ক্ষত্রিয় বীরত্বের অনন্য নিদর্শন । পুরাণে বর্ণিত এই বংশতালিকাই পরবর্তীকালে রাজপুত বা মারাঠাদের মতো বীর জাতিগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছে। বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দেরও অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

ক্ষত্রিয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন: দ্বিজত্ব এবং যজ্ঞানুষ্ঠা - ক্ষত্রিয়রা ছিলেন সমাজের 'দ্বিজ' বা দুইবার জন্ম নেওয়া বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। তাদের জীবনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সংস্কারের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পুরাণের মতে, ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্মীয় কাজগুলো হলো বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দানশীলতা ।

বেদাধ্যয়ন ও শিক্ষা

একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমারকে বাল্যকাল থেকেই ব্রাহ্মণের আশ্রমে পাঠিয়ে বেদ, শাস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হতো। যদিও তারা ব্রাহ্মণদের মতো শাস্ত্র পাঠদান (Adhyapana) করতে পারতেন না, কিন্তু শাস্ত্রে তাদের গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যিক ছিল যাতে তারা বিচারকার্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। **বিষ্ণু পুরাণ উল্লেখ করে যে, একজন রাজা তখনই প্রকৃত রাজা যখন তিনি শাস্ত্রের নীতি মেনে চলেন ।**

যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাজসূয়

ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক ছিল অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞগুলো কেবল রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতীক ছিল না, বরং এগুলো ছিল বিশ্বশান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা। যজ্ঞের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় রাজা ঋষিদের সন্তুষ্ট করতেন এবং প্রজাদের মধ্যে অকাতরে সম্পদ বিলিয়ে দিতেন। দান বা 'দানম্' ছিল ক্ষত্রিয়ের অন্যতম ভূষণ; তারা বিশ্বাস করতেন যে **পৃথিবী থেকে সম্পদ কেবল ত্যাগের মাধ্যমেই সার্থক হয়।**

ক্ষত্রিয় নারীর বীরত্ব ও মর্যাদা

পুরাণে ক্ষত্রিয় নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তারা কেবল অন্তঃপুরের বাসিন্দা ছিলেন না, বরং প্রয়োজন পড়লে অস্ত্রধারণ এবং দেশ রক্ষার শিক্ষাও গ্রহণ করতেন । কৈকেয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা দশরথকে সাহায্য করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে ক্ষত্রিয় নারীরা কতটা সাহসী ছিলেন। এছাড়াও

স্বয়ম্বর প্রথার মাধ্যমে ক্ষত্রিয় নারীদের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল, যা সেই সময়ের সামাজিক প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর ।

সামাজিক বিবর্তন ও ক্ষত্রিয়ের ঐতিহাসিক রূপান্তর

পুরাণগুলোতে ক্ষত্রিয় বর্ণের যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা অত্যন্ত কৌতূহলী। শুরুতে এই বর্ণ কেবল গুণ ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতো, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা বংশানুক্রমিক রূপ ধারণ করে ।

গুণ ও কর্ম থেকে বংশানুক্রমিকতা

বৈদিক যুগে বিশ্বামিত্রের মতো অনেক ঋষি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে এই ব্যবস্থা ছিল নমনীয়। তবে সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা বংশপরম্পরায় বজায় রাখার স্বার্থে পুরাণ যুগে এটি কঠোর হতে শুরু করে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এটি ছিল এক প্রকারের শ্রম বিভাজন যা সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করত।

ক্ষত্রিয় ও বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম

পুরাণ পরবর্তী কালে যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়, তখন দেখা যায় যে মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ—উভয়ই ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত। অনেক ক্ষত্রিয় রাজা যেমন অশোক বা হর্ষবর্ধন এই নতুন ধর্মীয় চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। পুরাণগুলো অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে 'কলিযুগের' প্রভাব হিসেবে বর্ণনা করলেও, ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব ও শাসনের ধারা কখনোই স্তিমিত হয়নি।

সংস্কৃতির প্রসার ও একীকরণ

পুরাণের কাহিনীগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলো বিভিন্ন স্থানীয় জনজাতিকে 'ক্ষত্রিয়' মর্যাদায় উন্নীত করে এক বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এই 'সংস্কৃতিকরণ' বা Cultural Synthesis ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।

স্থাপত্য, শিল্প ও জ্ঞানচর্চায় ক্ষত্রিয়ের অবদান

ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলো ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল। পুরাণের একটি বিশাল অংশ জুড়েই মন্দির নির্মাণ, নগর পরিকল্পনা এবং শিল্পের কলাকৌশল আলোচিত হয়েছে।

মন্দির স্থাপত্য ও আগম শাস্ত্র

অগ্নি পুরাণ, মৎস্য পুরাণ এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে মন্দির স্থাপত্যের যে বিশাল নির্দেশিকা পাওয়া যায়, তা

কার্যকর করার জন্য ক্ষত্রিয় রাজারা অকাতরে অর্থ ও ভূমি দান করতেন । গুপ্ত রাজা থেকে শুরু করে চালুক্য বা চোল রাজবংশ—সবাই তাদের বিশাল প্রশাসনিক ক্ষমতার একাংশ ব্যয় করতেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে মহিমান্বিত মন্দির তৈরিতে। খাজুরাহো, হাম্পি বা মহাবলীপুরমের যে স্থাপত্য আজ আমরা দেখি, তার মূলে ছিল ক্ষত্রিয় রাজাদের সেই আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশ

রাজসভাগুলো ছিল পণ্ডিত ও কবিদের মিলনস্থল। কালিদাস থেকে শুরু করে আর্যভট্ট—সবাই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অমর সৃষ্টিগুলো রেখে গেছেন। ক্ষত্রিয় শাসকরা শিক্ষাকেন্দ্র বা 'ঘটিকাসুত্র' পরিচালনা করতেন যেখানে দর্শন, গণিত এবং চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা হতো। নালন্দা ও বিক্রমশীলার মতো মহাবিদ্যালয়গুলো ছিল ক্ষত্রিয় শাসনের সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের সাক্ষী ।

ক্ষত্রিয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

পুরাণ সাহিত্য ক্ষত্রিয়দের এমন কিছু চারিত্রিক গুণের কথা উল্লেখ করেছে যা তাদের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই গুণগুলো কেবল জন্মসূত্রে পাওয়া নয়, বরং এগুলো অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন হতো ।

সাহসিকতা ও বীরত্ব

ক্ষত্রিয়ের প্রথম ও প্রধান গুণ হলো শৌর্য। ভয়কে জয় করাই তার ধর্ম। পুরাণে বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয় কখনো যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসে না। এই নির্ভীকতা কেবল শারীরিক শক্তির ওপর নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতো ।

ক্ষমা ও মহত্ত্ব

প্রকৃত বীর সেই যে ক্ষমা করতে জানে। রামায়ণে রাম যখন রাবণকে পরাজিত করার সুযোগ পেয়েও তাকে অস্ত্রহীন অবস্থায় ছেড়ে দেন এবং পরদিন আবার যুদ্ধ করতে বলেন, তখন ক্ষত্রিয়ের সেই বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষমাশীলতা ক্ষত্রিয়কে এক দেবতুল্য মর্যাদা প্রদান করে ।

আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয় বিজয়

একজন রাজাকে কেবল রাজ্য নয়, নিজের ইন্দ্রিয়কেও জয় করতে হতো। **পুরাণে 'রাজর্ষি' (Rajarshi) শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়, যার অর্থ হলো এমন এক রাজা যিনি ঋষির মতো সংযমী।** রাজা জনক বা রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন এই গুণের আধার। তারা

ভোগবিলাসের মাঝে থেকেও ত্যাগের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন ।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা

যদিও আজ প্রাচীন রাজতন্ত্র বা বর্ণপ্রথা তার আগের রূপে নেই, কিন্তু পুরাণে বর্ণিত ক্ষত্রিয়ের মূল্যবোধগুলো আজও আধুনিক বিশ্বের নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নৈতিক নেতৃত্ব (Ethical Leadership)

পুরাণের রাজধর্ম আমাদের শেখায় যে ক্ষমতা কোনো অধিকার নয়, বরং এটি একটি পবিত্র সম্পদ। আজকের দিনের রাজনীতিবিদ বা প্রশাসকরা যদি ক্ষত্রিয়ের সেই 'প্রজাপালন' এবং 'নিষ্ঠা'র আদর্শ গ্রহণ করেন, তবে সমাজ থেকে দুর্নীতি ও অন্যায় দূর হওয়া সম্ভব ।

প্রতিরক্ষা ও দেশপ্রেম - আধুনিক সামরিক বাহিনীতে যে শৃঙ্খলার কথা বলা হয়, তার আদিরূপ পুরাণের ক্ষত্রিয় ধর্মে নিহিত। দেশের সীমানা রক্ষা করা এবং আর্তের জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার যে মানসিকতা, তা সরাসরি ক্ষত্রিয়ের সেই সনাতন ঐতিহ্য থেকে আসে।

সামাজিক ন্যায়বিচার - দুর্বলকে সুরক্ষা দেওয়ার যে ক্ষত্রিয় আদর্শ, তা আধুনিক মানবাধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্ষত্রিয়ের সেই 'দণ্ডনীতি' যা অন্যায়ের বিনাশ করে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, তা আজও আমাদের বিচার ব্যবস্থার অনুপ্রেরণা হতে পারে।

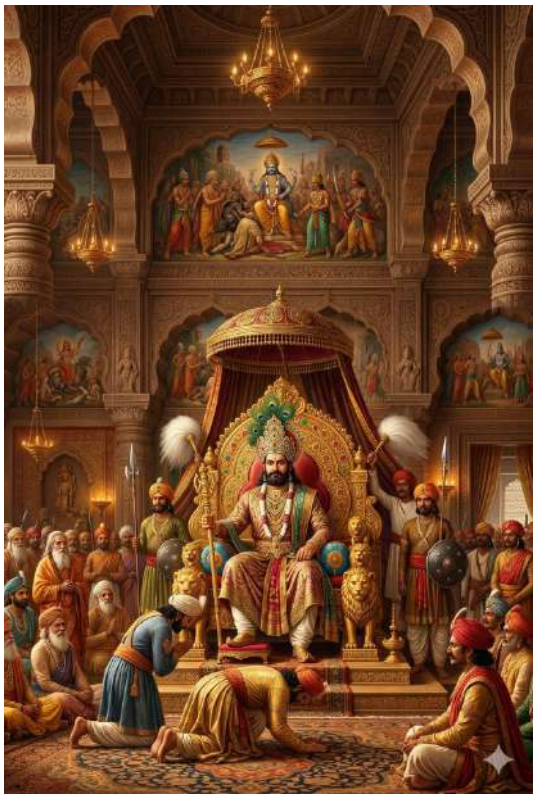
ক্ষত্রিয়ের শাশ্বত মহিমা

পুরাণে ক্ষত্রিয় কেবল একটি সামাজিক শ্রেণী নয়, এটি হলো এক মহিমান্বিত আদর্শ। তারা ছিলেন সমাজের সেই ধারক শক্তি যারা না থাকলে জ্ঞানচর্চা বা বাণিজ্য কিছুই সম্ভব হতো না। বাহুর মতো সমাজকে রক্ষা করা, মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো তেজ ছড়িয়ে দেওয়া এবং বৃষ্টির মতো প্রজাদের ওপর কল্যাণ বর্ষণ করাই ছিল ক্ষত্রিয়ের সার্থকতা।

বিষ্ণু পুরাণ থেকে ভাগবত পুরাণ—প্রতিটি গ্রন্থই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শক্তি যখন ধর্মের পথে পরিচালিত হয়, তখনই তা কল্যাণকর হয়। রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, অর্জুনের একাগ্রতা এবং ভীষ্মের ত্যাগ ভারতীয় মানসকে আজও উদ্দীপ্ত করে। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন ভারতীয় সভ্যতার সেই প্রদীপ যা হাজার বছরের অন্ধকার ও ঝঞ্ঝার মাঝেও সংস্কৃতির আলোকে অমলিন রেখেছিল। তাদের এই ইতিবাচক ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আমাদের শেখায় যে সাহসের সাথে দয়া এবং শক্তির সাথে যখন ন্যায়ের মিলন ঘটে, তখনই একটি সার্থক জাতি গঠন

সম্ভব হয়। পুরাণের সেই বীর ক্ষত্রিয়দের উত্তরাধিকার আজও আমাদের রক্তে ও চিন্তায় বহমান, যা আমাদের সর্বদা ন্যায়ের পথে লড়াই করার প্রেরণা জোগায়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের এই আদর্শের অনুসারী হয়ে কাজ করতে হবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।





অষ্টাদশ মহাপুরাণে ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতী প্রাণদা পাত্র

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সাহিত্যের বিশাল ক্যানভাসে অষ্টাদশ মহাপুরাণ কেবল ধর্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্বের সংকলন নয়, বরং এটি একটি সুসংহত সামাজিক দর্পণ যা প্রাচীন ভারতের লিঙ্গীয় সমতা, নারীর বৌদ্ধিক স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে ক্ষত্রিয় নারীদের প্রশাসনিক ও দার্শনিক অবদানের এক মহিমান্বিত চিত্র উপস্থাপন করে। প্রচলিত মহাকাব্য রামায়ণ বা মহাভারতের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রগুলোর প্রভাব এতটাই ব্যাপক যে, পুরাণে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত ক্ষত্রিয় নারী চরিত্রগুলো অনেক সময় সাধারণ পাঠকদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ বা মৎস্য পুরাণের গভীরে প্রবেশ করলে এমন কিছু ক্ষত্রিয় নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও সাহসের দ্বারা তৎকালীন সমাজের গতিপথ নির্ধারণ করেছিলেন।

মহাপুরাণগুলি মূলত **'পঞ্চলক্ষণ' (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত)** ভিত্তিক হলেও এগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটি বিশ্বকোষের মতো কাজ করে। পুরাণের যুগে ক্ষত্রিয় নারীদের ভূমিকা কেবল অন্তঃপুরবাসিনী হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা ছিলেন

'সাম্রাজিনী' বা গৃহের রাণী এবং রাজকীয় ক্ষমতার অংশীদার। পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায়, ক্ষত্রিয় কন্যারা কেবল শিল্পকলায় পারদর্শী ছিলেন না, বরং তাঁরা রণকৌশল, রাজনীতি এবং উচ্চতর দর্শন বা ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত হতেন।

পুরাণসমূহের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল নারীদের ধর্মীয় অধিকারে প্রবেশাধিকার দেওয়া, যা বৈদিকোত্তর যুগে কিছুটা সংকুচিত হয়ে এসেছিল । পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় নারীরা তাঁদের তপোবল এবং বৌদ্ধিক সামর্থ্যের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি কঠিন সামাজিক সমস্যা সমাধানেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন । এই পটভূমিতে আমরা প্রধান চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ শুরু করতে পারি।

মদালসা:

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত রাণী মদালসার চরিত্রটি সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যে নারীত্বের উচ্চতম শিখরের নিদর্শন। গন্ধর্ব রাজ বিশ্বাবসুর কন্যা এবং রাজা ঋতধ্বজের মহিষী মদালসা কেবল একজন অনুগত স্ত্রী বা স্নেহময়ী মাতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক এবং রাজধর্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা ।

মদালসার সবচেয়ে বৈপ্লবিক অবদান হলো তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি। তাঁর প্রথম তিন পুত্র—বিক্রান্ত, সুবাহু এবং শত্রুর্দন—যখন শৈশবে কাঁদতেন, মদালসা তাঁদের সাধারণ লৌকিক প্রলোভন দিয়ে শান্ত করতেন না। পরিবর্তে, তিনি তাঁদের জন্য যে 'মদালসা উপদেশ' বা ঘুমপাড়ানি গান গেয়েছিলেন, তা ছিল বিশুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তের নির্যাস ।

মদালসার উপদেশের প্রধান তত্ত্বসমূহ	দার্শনিক ও প্রশাসনিক তাৎপর্য
শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি	মানুষকে তাঁর দেহের অতীত যে বিশুদ্ধ চেতনা বা আত্মা, সেই সম্পর্কে সচেতন করা ।
নাম-হীনতা	নাম যে কেবল একটি বাহ্যিক কল্পনা এবং প্রকৃত সত্তা যে নামহীন, তা শৈশবেই শিখিয়ে দেওয়া ।
পঞ্চতত্ত্বের অতীত সত্তা	শরীর যে কেবল পাঁচটি উপাদানের সমষ্টি এবং আত্মা যে তার থেকে স্বতন্ত্র, এই বোধ জাগানো ।
নিরাসক্তি ও রাজধর্ম	আসক্তি ত্যাগের মাধ্যমে নির্ভীকভাবে রাজ্য শাসন করার মানসিকতা তৈরি করা ।

এই শিক্ষার প্রভাবে তাঁর প্রথম তিন পুত্রই জাগতিক ঐশ্বর্যের মোহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একজন ক্ষত্রিয় জননী হিসেবে মদালসা প্রমাণ করেছিলেন যে, **ক্ষত্রিয়ত্বের অর্থ কেবল সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, বরং আত্মবিজয়।** এটি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর গভীর দার্শনিক প্রভাবের একটি অনন্য উদাহরণ।

অলর্ক ও রাজধর্মের গূঢ় শিক্ষা

রাজা ঋতধ্বজ যখন চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে বংশরক্ষার জন্য কেউ থাকবে না, তখন মদালসা তাঁর চতুর্থ পুত্র অলর্ককে রাজধর্মের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। এখানে মদালসা কেবল একজন মা হিসেবে নন, বরং একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি অলর্ককে শিখিয়েছিলেন যে একজন আদর্শ রাজাকে অবশ্যই তাঁর **'অরিষড়বর্গ'** (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) জয় করতে হবে।

মদালসার প্রশাসনিক নির্দেশাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি অলর্ককে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং অত্যন্ত ব্যবহারিক পরামর্শ দিয়েছিলেন:

প্রজাপালন: প্রজাদের সন্তুষ্টি বিধানই রাজার প্রধান কাজ। যেমন ইন্দ্র বৃষ্টির মাধ্যমে জগৎকে তুষ্ট করেন, রাজাকেও তেমন দানের মাধ্যমে প্রজাদের তুষ্ট করতে হবে ।

কর গ্রহণ: সূর্যের মতো কর গ্রহণ করা উচিত, যাতে প্রজারা কষ্ট না পায় কিন্তু রাজকোষ পূর্ণ থাকে ।

সঙ্কট ব্যবস্থাপনা: তিনি অলর্ককে একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয় দিয়েছিলেন যার ভেতরে লেখা ছিল— "যদি সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সমাজ তোমাকে গ্রাস করতে চায়, তবে সাধুসঙ্গ গ্রহণ করো এবং আত্মিক শান্তিতে নিমগ্ন হও" ।

মদালসার এই চরিত্রটি প্রমাণ করে যে পুরাণের ক্ষত্রিয় নারীরা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং তাঁদের প্রশাসনিক জ্ঞান সমসাময়িক রাজনীতিকদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না ।

দেবাহূতি:

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত দেবাহূতির কাহিনী একজন ক্ষত্রিয় নারীর জ্ঞানতৃষ্ণা এবং দার্শনিক সামর্থ্যের আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবাহূতি রাজকীয় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ঋষি কর্দমের সাথে অরণ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবন ছিল ত্যাগ এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার এক অপূর্ব সমন্বয়।

দেবাহূতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর বুদ্ধিমত্তা। তিনি যখন অনুভব করেন

যে জাগতিক ভোগ তাঁকে শান্তি দিচ্ছে না, তখন তিনি তাঁর পুত্র কপিলদেবের (যিনি বিষ্ণুর অবতার হিসেবে বর্ণিত) কাছে জীবনের পরম সত্য সম্পর্কে জানতে চান । তাঁর এই জিজ্ঞাসা থেকেই জন্ম নেয় বিখ্যাত **'সাংখ্য দর্শন'**।

দেবাহূতি কপিলদেবকে যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন, তা কোনো সাধারণ ভক্তের প্রশ্ন ছিল না, বরং তা ছিল একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিকের জিজ্ঞাসা:

"হে ভগবান, মন কিভাবে বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হয়?"

"প্রকৃতি এবং পুরুষের বিভাজন এবং মিলন কিভাবে সৃষ্টিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে?"

"ভক্তিযোগের মাধ্যমে কিভাবে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাকে লাভ করা সম্ভব?"

কপিলদেব তাঁর মাকে যে সাংখ্য দর্শন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে **'কপিলোপদেশ'** নামে পরিচিত। একজন নারী হিসেবে দেবাহূতির এই আধ্যাত্মিক আভিজাত্য এবং জটিল দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা পুরাণে ক্ষত্রিয় নারীর মেধাশক্তির এক ইতিবাচক স্বীকৃতি।

দেবাহূতি দেখিয়েছেন যে, ক্ষত্রিয় রক্ত কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও সমান তেজস্বী। তিনি তাঁর তপশ্চর্যার মাধ্যমে 'অহংকার' জয় করেছিলেন এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরম মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই যাত্রা প্রমাণ করে যে, পুরাণের যুগে ক্ষত্রিয় নারীরা কেবল সংসার পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন মোক্ষকামী সাধক এবং উচ্চতর জ্ঞানের আধার।

সুনীতি ও সুরুচি:

বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে বর্ণিত ধ্রুবের কাহিনীতে রাজা উত্তানপাদের দুই মহিষী—সুনীতি ও সুরুচি—ক্ষত্রিয় নারীদের মনস্তাত্ত্বিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তার দুটি ভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সুনীতি: নৈতিক নেতৃত্বের জয়গান

সুনীতি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই 'নীতির পথ অনুসারী'। রাজার অবহেলা ও সুরুচির অপমান সহ্য করেও তিনি তাঁর পুত্র ধ্রুবকে কখনো প্রতিহিংসার শিক্ষা দেননি। বরং তিনি তাঁকে পরমেশ্বরের আশ্রয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর উক্তি— "বিমাতা সুরুচি যা বলেছেন তা কঠোর হলেও সত্য, কারণ আমি দুর্ভাগা নারী; তুমি যদি সিংহাসন চাও তবে নারায়ণের আরাধনা করো"—একজন ক্ষত্রিয় জননীর ধৈর্য এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। সুনীতির এই ইতিবাচক চারিত্রিক দৃঢ়তাই ধ্রুবকে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছিল।

সুরুচি: অধিকারবোধ ও ব্যক্তিত্বের তেজ - প্রথাগতভাবে সুরুচিকে নেতিবাচক দেখানো হলেও, আধুনিক বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং তাঁর সন্তানের অধিকার রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাজার ওপর তাঁর প্রভাব এবং রাজবাড়িতে তাঁর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রমাণ করে যে ক্ষত্রিয় নারীরা তৎকালীন রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতেন। সুরুচির সেই কঠোর বাক্যই প্রকৃতপক্ষে ধ্রুবের আধ্যাত্মিক জীবনের চালিকাশক্তি হয়েছিল।

মৎস্য পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে ক্ষত্রিয় নারীর শিক্ষাগত ও সামাজিক অধিকার

মৎস্য পুরাণ এবং অগ্নি পুরাণের মতো গ্রন্থগুলি ক্ষত্রিয় নারীদের সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থানের উপর আলোকপাত করে। সেখানে দেখা যায় যে, কিছু ক্ষত্রিয় নারী **'ব্রহ্মবাদিনী'** (Brahmavadini) হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন, যাঁরা আজীবন শাস্ত্রচর্চা ও তপশ্চর্যায় লিপ্ত থাকতেন ।

সন্নতীর দৃষ্টান্ত - মৎস্য পুরাণে **রাজা ব্রহ্ম দত্তের পত্নী সন্নতীর** (Sannati) উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত নারী এবং ধর্মীয় তত্ত্বে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায়, সন্নতীর বৌদ্ধিক শক্তি এতই প্রবল ছিল যে তিনি রাজার বিভিন্ন প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কাজে প্রধান পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতেন। সন্নতী কেবল একজন পতিব্রতা নারীই ছিলেন না, বরং তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে, ব্রহ্ম দত্ত যখন পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারার বর লাভ করেন, তখন সন্নতী তাঁকে তাঁর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন।

বিবাহের স্বাধীনতা ও স্বয়ম্বরা প্রথা - পুরাণে ক্ষত্রিয় নারীদের বৈবাহিক স্বাধীনতার বিষয়েও অত্যন্ত ইতিবাচক তথ্য পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণ অনুসারে, যদি কোনো কন্যা তাঁর পিতার গৃহে তিনটি ঋতুকাল অতিবাহিত করার পরেও বিবাহিত না হন, তবে তিনি নিজেই নিজের স্বামী নির্বাচন করার অধিকার রাখতেন। **এই 'স্বয়ম্বর' প্রথা কেবল একটি উৎসব ছিল না, বরং এটি ছিল ক্ষত্রিয় নারীর ব্যক্তিগত এজেন্সি বা স্বাধীন ইচ্ছার এক শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ।** শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কাহিনীতে (যা পুরাণে বিস্তারিত বর্ণিত) দেখা যায় যে নারীরা তাঁদের প্রেমের প্রস্তাব সরাসরি দিতে পারতেন এবং তাঁদের পছন্দের ক্ষেত্রে রাজার হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় নারীর পরোক্ষ ভূমিকা - যদিও পুরাণের

মূল কাহিনীগুলো প্রায়ই আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রিক, তবুও 'বংশানুচরিত' এবং 'রাজধর্ম' অধ্যায়গুলিতে রাজমহিষীদের প্রশাসনিক প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় নারীরা যে কেবল গৃহিণী ছিলেন না, বরং তাঁরা রণকৌশল এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে পারদর্শী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অগ্নি পুরাণ ও বায়ু পুরাণে ।

পুরাণের অনেক বর্ণনায় দেখা যায় যে, অসুরদের সাথে যুদ্ধে বা সংকটের সময় ক্ষত্রিয় নারীরা তপশ্চর্যার মাধ্যমে অলৌকিক শক্তি অর্জন করতেন যা রাজাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করত। যেমন মৎস্য পুরাণে **দিতির** (Diti) কঠোর তপশ্চর্যার কাহিনী দেখা যায়, যিনি রাজনৈতিক কারণে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। এটি প্রকাশ করে যে ক্ষত্রিয় নারীরা তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পরিশ্রমী ছিলেন।

বংশরক্ষায় ক্ষত্রিয় নারীর অবদান
পুরাণের বংশাবলীতে ইলা (Ila) চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চন্দ্রবংশের উৎস হিসেবে পরিচিত। ইলার কাহিনীটি অত্যন্ত জটিল হলেও এটি প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক চিন্তায় নারীর নেতৃত্ব এবং বংশের আদিম উৎস হিসেবে নারীর ভূমিকাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা হতো ।

ব্রতকথা ও ক্ষত্রিয় নারীর ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসন - পুরাণের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ব্রত (Vratas) এবং উপবাসের বর্ণনা। এই ব্রতগুলি ক্ষত্রিয় নারীদের জীবনে কেবল ধর্মীয় আচার ছিল না, বরং এটি ছিল তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদর্শনের একটি মাধ্যম।

অগ্নি পুরাণ এবং গরুড় পুরাণে এমন অনেক ব্রতের উল্লেখ আছে যা রাজমহিষীরা পালন করতেন। এই ব্রত পালনের মাধ্যমে তাঁরা কেবল স্বামীর দীর্ঘায়ু নয়, বরং রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন। এই ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলো ক্ষত্রিয় নারীদের জনসমক্ষে আসার এবং তাঁদের সামাজিক নেতৃত্ব প্রদর্শনের একটি সুযোগ করে দিত।

পৌরাণিক ক্ষত্রিয় নারী চরিত্র	প্রধান অবদান/বৈশিষ্ট্য	পুরাণের উৎস
মদালসা	রাজধর্ম ও অদ্বৈত বেদান্তের শিক্ষাদান ।	মার্কণ্ডেয় পুরাণ
দেবহূতি	সাংখ্য দর্শন ও ভক্তিযোগের দার্শনিক	ভাগবত পুরাণ

পৌরাণিক ক্ষত্রিয় নারী চরিত্র	প্রধান অবদান/বৈশিষ্ট্য	পুরাণের উৎস
	জিজ্ঞাসা ।	
সুনীতি	নৈতিক দৃঢ়তা এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা ।	বিষ্ণু/ভাগবত পুরাণ
সন্নতী	শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য ও রাজকার্যে পরামর্শদান ।	মৎস্য পুরাণ
পীবরী	যোগসাধনা ও উচ্চতর আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ।	মৎস্য পুরাণ

পুরাণে ক্ষত্রিয় নারীর আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা

পুরাণের অনেক শ্লোকে ক্ষত্রিয় নারীদের সুরক্ষা এবং তাঁদের সম্মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গরুড় পুরাণ এবং **অগ্নি পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, নারীকে সব সময় রক্ষা করতে হবে এবং তাঁদের কোনোভাবেই কষ্ট দেওয়া চলবে না ।**

সুরক্ষার দায়িত্ব: শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র কর্তৃক সুরক্ষার যে কথা বলা হয়েছে, তা অনেক সময় পরাধীনতা হিসেবে দেখা হলেও পুরাণের প্রেক্ষাপটে এটি ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তার একটি গ্যারান্টি ।

অহিংসা ও মর্যাদা: পুরাণে বলা হয়েছে যে অপরাধী হলেও নারীকে হত্যা করা অনুচিত, যা তৎকালীন আইনের অত্যন্ত মানবিক এবং ইতিবাচক দিক ।

সম্পত্তির অধিকার: যদিও সাধারণ আইনি বিধিগুলো পুরুষকেন্দ্রিক ছিল, কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন ভ্রাতৃহীন কন্যা বা অপুত্রক রাজা) ক্ষত্রিয় নারীদের প্রশাসনিক ও সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি পুরাণে পাওয়া যায় ।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় নারীরা কেবল মহাকাব্যের অলঙ্কার ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির বৌদ্ধিক ও নৈতিক স্তম্ভ। রাণী মদালসার শিক্ষায় আমরা দেখি একজন আদর্শ শাসকের গুণাবলী, যা আজও আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতে প্রাসঙ্গিক। দেবহূতির মাধ্যমে আমরা পাই সেই বিশ্লেষণধর্মী মন যা পরম সত্য অনুসন্ধানে ভয় পায় না। সুনীতির জীবন আমাদের শেখায় প্রতিকূলতার মাঝেও কিভাবে নিজের নীতি ও ধর্ম রক্ষা করতে হয়।

এই নারী চরিত্রগুলো প্রমাণ করে যে, পৌরাণিক ভারতে ক্ষত্রিয় নারীরা ছিলেন অত্যন্ত স্বাবলম্বী, উচ্চশিক্ষিত এবং

আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান। তাঁরা ঘর এবং রাজ্য উভয়কেই তাঁদের প্রজ্ঞা ও তেজ দ্বারা আলোকিত করেছিলেন। পুরাণের এই ইতিবাচক বর্ণনাগুলো আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। ক্ষত্রিয় নারীর এই গৌরবময় অধ্যায়টি কেবল অতীতের কাহিনী নয়, বরং এটি আমাদের আধুনিক সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৌদ্ধিক স্বাধীনতার এক চিরন্তন অনুপ্রেরণা। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীরা পুরাণের এইসব মহান নারীদের আদর্শ অনুসরণ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে মজবুত করে তুলবেন এই কামনা করি।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



বাল্মীকি রামায়ণে ক্ষত্রিয়

- শ্রীসীতাপতি পাইক

বাল্মীকি রামায়ণ কেবল একটি মহাকাব্য নয়, এটি প্রাচীন ভারতীয় আর্য সভ্যতার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক কাঠামোর এক প্রামাণ্য দলিল। এই মহাকাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্ষত্রিয় বর্ণ, যাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল শাসনকার্য পরিচালনা, প্রজাপালন এবং অধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। বাল্মীকির লেখনীতে ক্ষত্রিয়রা কেবল সমরকুশলী যোদ্ধা হিসেবেই নয়, বরং উচ্চ নৈতিকতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অনুশাসন এবং আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন।

ইক্ষ্বাকু বংশ এবং ক্ষত্রিয়ের আদর্শগত ভিত্তি

রামায়ণের মূল আখ্যানভাগ আবর্তিত হয়েছে ইক্ষ্বাকু রাজবংশকে কেন্দ্র করে, যা বৈবস্বত মনু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজবংশটি **সূর্যবংশ** নামেও পরিচিত এবং এর রাজারা তাদের সত্যনিষ্ঠা, বীরত্ব এবং প্রজাহিতৈষণার জন্য সমগ্র বিশ্বে বন্দিত ছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে অযোধ্যা নগরীর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা একটি আদর্শ ক্ষত্রিয়-শাসিত রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি ।

অযোধ্যার ক্ষত্রিয়রা ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং বিভিন্ন মরণাস্ত্রে পারদর্শী। তাদের **'মহারথী'** হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যারা এককভাবে দশ সহস্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন। তবে তাদের এই অমিত শক্তি ছিল সর্বদাই নীতি ও ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাল্মীকির বর্ণনায়, অযোধ্যার ক্ষত্রিয়রা কখনও অসহায়, নিঃশস্ত্র, পলায়নপর বা একাকী শত্রুর ওপর আঘাত করতেন না। এই চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নৈতিক মানদণ্ডই ইক্ষ্বাকু বংশের ক্ষত্রিয়দের অন্য সমস্ত সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল ।

ইক্ষ্বাকু রাজবংশের চারিত্রিক ও প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের গুণাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল সামরিক শক্তির আধিক্যে ছিল না, বরং তাদের চরিত্রের অখণ্ডতা এবং প্রজাদের প্রতি তাদের গভীর দায়বদ্ধতার মধ্যে নিহিত ছিল।

শ্রীরামচন্দ্র: ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও 'বিগ্রহবান ধর্ম'

বাল্মীকি রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে **'রামো বিগ্রহবান ধর্মঃ' বা ধর্মের মূর্ত প্রতীক** হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে । নারদের বর্ণনায় রামের মধ্যে এমন ষোলোটি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের (Maryada Purushottam) জন্য কাঙ্ক্ষিত। রামের ক্ষত্রিয় সত্তা কেবল রাজকীয় ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং তা ছিল তাঁর চরিত্রবলের বহিঃপ্রকাশ।

রামের কাছে ক্ষত্রিয়ের সংজ্ঞা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট: "ক্ষত্রিয়রা অস্ত্র ধারণ করেন যাতে পৃথিবী থেকে 'আর্ত' বা পীড়িত শব্দটিকে চিরতরে মুছে ফেলা যায়"। এই উক্তিটি ক্ষত্রিয় বর্ণের মূল সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনকে প্রতিফলিত করে। রামের বীরত্ব কেবল রাক্ষস দমনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সত্যনিষ্ঠায়, যখন তিনি পিতার বাক্য রক্ষার্থে বিনা দ্বিধায় সিংহাসন ত্যাগ করে বনবাসে গমন করেছিলেন ।

রামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম ছিল তাঁর স্থিতিপ্রজ্ঞতা বা সুখ ও দুঃখে সমানভাবে অবিচল থাকার ক্ষমতা । তিনি যখন বনবাসে যাচ্ছিলেন বা যখন রাবণকে পরাজিত করে লঙ্কা জয় করেছিলেন, কোনো অবস্থাতেই তাঁর বিনয় ও ধৈর্য বিচ্যুত হয়নি । এই নৈতিক উচ্চতাই রামকে সাধারণ যোদ্ধার স্তর থেকে উন্নীত করে এক ঐশ্বরিক সত্তায় পরিণত করেছে, যদিও বাল্মীকির মূল রামায়ণে তাঁকে একজন আদর্শ মানুষ ও

রাজা হিসেবেই প্রধানত চিত্রিত করা হয়েছে ।

রাজধর্ম: ক্ষত্রিয় শাসনের নীতি ও সুশাসন (Rama Rajya)

রামায়ণে রাজধর্ম বা একজন শাসকের কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে অযোধ্যা কাণ্ডের ১০০তম সর্গে, যা 'কশ্চিৎ সর্গ' নামে পরিচিত, সেখানে রাম বনবাসে অবস্থানকালীন ভরতকে রাষ্ট্র পরিচালনার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। রাজধর্মের মূল লক্ষ্য হলো **'যোগক্ষেম'** বা প্রজাদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

রামের মতে, একজন রাজার সাফল্যের চাবিকাঠি হলো তাঁর মন্ত্রণা বা পরামর্শ গ্রহণ করার ক্ষমতা। রাজা যেন এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না নেন এবং তাঁর গোপন আলোচনা যেন কোনোভাবেই জনসমক্ষে প্রকাশ না পায়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। **একজন প্রাজ্ঞ মন্ত্রীর গুরুত্ব সহস্র মূর্খ কর্মীর চেয়েও বেশি বলে রাম উল্লেখ করেছেন।**

রামরাজ্যের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো

'রামরাজ্য' হলো সুশাসনের সেই আদর্শ অবস্থা যেখানে প্রজাদের মধ্যে কোনো হিংসা, দারিদ্র্য বা অকাল মৃত্যু ছিল না । এই সাফল্য অর্জনের জন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের কিছু নির্দিষ্ট প্রশাসনিক নীতি অনুসরণ করতে হতো।

সমর-নীতি ও যুদ্ধ ধর্ম (Yuddha-dharma)

বাল্মীকি রামায়ণে ক্ষত্রিয়দের জন্য সমর-নীতি বা 'যুদ্ধ ধর্ম' ছিল অত্যন্ত অলঙ্ঘনীয়। যুদ্ধকে কেবল বিজয় লাভের উপায় হিসেবে নয়, বরং একটি নৈতিক পরীক্ষা হিসেবে দেখা হতো। ক্ষত্রিয়দের জন্য সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছিল স্বর্গের পথ, আর রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন ছিল চরম লজ্জার বিষয়। রামায়ণে 'ধর্মযুদ্ধ' ও 'অধর্মযুদ্ধ'-এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। রাম যখন রাবণের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি প্রতিনিয়ত যুদ্ধের নৈতিক নিয়মগুলো মেনে চলেছিলেন। এমনকি যখন রাবণ নিঃশস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন, তখন রাম তাঁকে হত্যা না করে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন—এটি সমর-ইতিহাসে এক বিরল উদাহরণ ৷

রামায়ণের যুদ্ধবিদ্যার প্রধান নিয়মাবলী (Ethics of Combat)

ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের জন্য বাল্মীকি যে সকল সমর-বিধির উল্লেখ করেছেন, তা

আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (IHL) সাথে তুলনীয় । এই নিয়মগুলো নিম্নরূপ:

সমমর্যাদার লড়াই: রথী রথীর সাথে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সাথে এবং পদাতিক পদাতিকের সাথে যুদ্ধ করবে ।

অযোদ্ধাদের সুরক্ষা: যারা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত নয়, যেমন পরিচারক, বাদ্যকর বা পাহারাদার, তাদের ওপর আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ।

শরণাগতরক্ষা: শত্রু যদি অস্ত্র ত্যাগ করে বা ঘাস মুখে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে, তবে তাকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম ।

অস্ত্রের সীমাবদ্ধতা: বিষাক্ত বা প্রজ্জ্বলিত তীরের ব্যবহার বর্জনীয়, কারণ তা প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করে ।

শত্রুর প্রতি সম্মান: শত্রু নিহত হলেও তার দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং যথাযথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা বিজয়ী রাজার কর্তব্য। রাম রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণকে তাঁর অন্ত্যেষ্টি করতে বাধ্য করেছিলেন এই বলে যে, **"মরণান্তানি বৈরাণি"—মৃত্যুর সাথেই বৈরিতার অবসান ঘটে।**

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সম্পর্ক: ভারসাম্য ও সংঘাত

রামায়ণের সামাজিক কাঠামোতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক নির্ভরতা ও শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন শাসনদণ্ডের ধারক, আর ব্রাহ্মণরা ছিলেন ধর্মের ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের রক্ষক। রাজপরিবারের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে রাজগুরু বা কুলপুরোহিতের (যেমন বশিষ্ঠ) ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

তবে এই সম্পর্কের মধ্যে মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই বা সংঘাতও দেখা দিত। বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কাহিনী এই সম্পর্কের এক জটিল দিক উন্মোচন করে। রাজা বিশ্বামিত্র যখন তাঁর পার্থিব শক্তি বা 'ক্ষত্রবল' দিয়ে বশিষ্ঠের আধ্যাত্মিক শক্তি বা 'ব্রহ্মবল'-কে পরাভূত করতে ব্যর্থ হন, তখন তিনি অনুধাবন করেন যে অস্ত্রের শক্তির চেয়ে তপোবল বা আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী।

বিশ্বামিত্রের রূপান্তর: ক্ষত্রিয় থেকে ব্রহ্মর্ষি

বিশ্বামিত্রের কাহিনীটি প্রমাণ করে যে, রামায়ণের যুগে বর্ণপ্রথা একেবারে অনমনীয় ছিল না। একজন ক্ষত্রিয় তাঁর কর্ম ও সাধনার মাধ্যমে উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হতে পারতেন। বিশ্বামিত্রের এই দীর্ঘ তপস্যা এবং অবশেষে বশিষ্ঠ কর্তৃক

তাঁকে 'ব্রহ্মর্ষি' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা ক্ষত্রিয় বীরত্বের এক আধ্যাত্মিক বিবর্তনকে নির্দেশ করে। এটি কেবল একজন ব্যক্তির রূপান্তর নয়, বরং এটি ক্ষত্রিয়ের অহংকার বিসর্জন দিয়ে সত্যের পথে অগ্রসরের এক আখ্যান।

রাজকীয় অনুষ্ঠান: অশ্বমেধ ও রাজ্যাভিষেক

একজন ক্ষত্রিয়ের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও ধর্মীয় নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৷ বাল্মীকি রামায়ণে এই অনুষ্ঠানগুলোর অত্যন্ত নিখুঁত ও পদ্ধতিগত বর্ণনা পাওয়া যায়, যা তৎকালীন রাজকীয় ঐতিহ্যের পরিচয় দেয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল মূলত দিগ্বিজয়ের একটি প্রতীকী রূপ। যখন কোনো শক্তিশালী রাজা অশ্বমেধের ঘোড়া ছেড়ে দিতেন, তখন তার অর্থ ছিল তিনি অন্য সকল রাজাকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানাচ্ছেন। যারা সেই ঘোড়াকে আটকাত, তাদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়াই ছিল ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উপায়। রাম তাঁর রাজত্বকালে এই যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষ সগর রাজাও এই যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া (Rituals of Coronation)

রাজ্যাভিষেক ছিল একজন যুবরাজের ক্ষত্রিয় দায়িত্ব গ্রহণের আনুষ্ঠানিক সূচনা। অযোধ্যা কাণ্ডে রামের অভিষেকের যে প্রস্তুতি বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় :

পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী: সহস্র সুবর্ণ কলস, গঙ্গা ও সাগরের জল, ব্যাঘ্রচর্ম, শ্বেতছত্র এবং শ্বেত চামর।

ধর্মীয় আচার: অভিষেক অনুষ্ঠানের পূর্বে রাজা ও রাণীকে উপবাস করতে হতো এবং কুশ শয্যায় শয়ন করতে হতো।

সামাজিক অংশগ্রহণ: এই অনুষ্ঠানে কেবল রাজন্যবর্গ নয়, বরং বণিক (বৈশ্য) এবং সাধারণ প্রজাদেরও উপস্থিতি নিশ্চিত করা হতো।

দান-দক্ষিণা: ব্রাহ্মণদের সহস্র গরু, ভূমি এবং স্বর্ণ মুদ্রা দান করা ছিল এই অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ।

ক্ষত্রিয়ের নৈতিক সংকট ও জটিলতা (Ethical Dilemmas)

বাল্মীকি রামায়ণে ক্ষত্রিয়দের জীবন কেবল বীরত্বগাথা নয়, বরং এটি অনেক সময় গভীর নৈতিক সংকটেরও সম্মুখীন হয়েছে। রামের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে

দেখা যায় যে, তিনি অনেক সময় রাজধর্ম ও ব্যক্তিগত নীতির দ্বন্দ্বে পড়েছেন।

বালী বধ ও বীরত্বের মানদণ্ড

কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে রামের দ্বারা বালীকে বৃক্ষের আড়াল থেকে হত্যা করার ঘটনাটি ক্ষত্রিয় সমর-নীতির প্রেক্ষিতে বিতর্কিত। বালীর অভিযোগ ছিল যে, রাম একজন বীর ক্ষত্রিয় হয়েও কেন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে গোপন আঘাত করলেন। রামের উত্তর ছিল অত্যন্ত রাজনৈতিক ও বিচারিক; তিনি নিজেকে ভরত শাসনের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে বালীকে অধর্মাচারী (ভ্রাতৃবধূর প্রতি অন্যায় আচরণকারী) হিসেবে দণ্ড দিয়েছেন। এটি ক্ষত্রিয়ের ব্যক্তিগত বীরত্বের চেয়ে সমষ্টিগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদাহরণ।

শম্বুক বধ ও বর্ণগত অনুশাসন

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে বর্ণিত শম্বুক বধের কাহিনীটি তৎকালীন ক্ষত্রিয় শাসনের কঠোরতাকে নির্দেশ করে। যখন এক ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটে, তখন নারদ মুনি রামকে জানান যে রাজ্যে ধর্মের বিপর্যয় ঘটেছে এবং কোনো এক অনধিকারী ব্যক্তি তপস্যা করছে। রাম তদন্ত করে শম্বুক নামক এক শূদ্রকে তপস্যারত অবস্থায় পান এবং তাকে শিরশ্ছেদ করেন। এই ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয়রা বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণকে তাদের অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতেন। রাম এই কাজের জন্য প্রশংসিত হন।

সীতার বিসর্জন ও প্রজাসন্তুষ্টি

রাবণ বধের পর সীতাকে গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে জনরবের কারণে তাঁকে পুনরায় বনবাসে পাঠানো রামের জীবনের সবচেয়ে কঠিন ক্ষত্রিয় কর্তব্য ছিল। রাম জানতেন সীতা পবিত্র, কিন্তু একজন রাজা হিসেবে তাঁর কাছে 'প্রজাসন্তুষ্টি' ও রাজবংশের কলঙ্কহীনতা ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ব্যক্তিগত প্রেম ও আবেগের উর্ধ্বে উঠে রাজধর্ম পালন করা ক্ষত্রিয়ের এক চরম ও ট্র্যাজিক পরীক্ষা হিসেবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

ভ্রাতৃপ্রেম ও ক্ষত্রিয়ের ঐক্য: লক্ষ্মণ, ভরত

রামায়ণে ক্ষত্রিয় আদর্শ কেবল রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর তিন ভ্রাতাও ক্ষত্রিয়ের বিভিন্ন মহৎ গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। লক্ষ্মণ ছিলেন উগ্র ক্ষত্রতেজের প্রতীক, যিনি রামের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ছিল রামের প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল। চৌদ্দ বছর নির্জলা থেকে রাম ও সীতাকে রক্ষা

করার যে সংকল্প তিনি করেছিলেন, তা ক্ষত্রিয়ের ধৈর্য ও সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত।

ভরত অন্যদিকে ক্ষত্রিয়ের ত্যাগের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। রাজ্য লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা রামের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে প্রত্যাখ্যান করেন এবং নন্দীগ্রামে সন্ন্যাসীর বেশে বাস করে রামের খড়মকে সিংহাসনে বসিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই ভ্রাতৃপ্রেম এবং সিংহাসনের প্রতি অনাসক্তি ইক্ষ্বাকু বংশের ক্ষত্রিয়দের এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা রামায়ণের নৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

ক্ষত্রিয় চেতনা: রাক্ষস ও বানর সমাজ

বাল্মীকি রামায়ণে রাক্ষস এবং বানরদের মধ্যেও অত্যন্ত উন্নত রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল। রাবণ ছিলেন এক মহাপরাক্রমশালী রাজা, যাঁর শাসনে লঙ্কা সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছিল। যদিও রাবণকে অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু বাল্মীকি তাঁকে একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, শিবভক্ত এবং বীর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। রাবণের পতন সামরিক দুর্বলতার কারণে নয়, বরং তাঁর নৈতিক স্খলন ও পরস্ত্রী হরণের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় ধর্মের বিচ্যুতি ঘটার ফলে হয়েছিল।

একইভাবে বানর রাজবংশও (বালী ও সুগ্রীব) বীরত্ব ও শাসনের মানদণ্ডে অত্যন্ত উন্নত ছিল। হনুমানের চরিত্রটি ক্ষত্রিয় গুণের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ, যেখানে তিনি বুদ্ধিমত্তা, শক্তি এবং চরম আনুগত্যের মাধ্যমে রামের লঙ্কা জয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ক্ষত্রিয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও দক্ষতা অর্জন

রামায়ণে ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদের শিক্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী। শৈশব থেকেই তাঁদের বশিষ্ঠের আশ্রমে বেদ, দর্শন এবং ধনুর্বেদের দীক্ষা নিতে হতো।

বিশ্বামিত্রের সাথে রাম ও লক্ষ্মণের যাত্রা ছিল মূলত তাঁদের ব্যবহারিক শিক্ষার একটি অংশ, যেখানে তাঁরা **'বলা' ও 'অতিবলা' বিদ্যার** মাধ্যমে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি জয়ের কৌশল শিখেছিলেন এবং বিভিন্ন রাক্ষস দমনের মাধ্যমে হাতে-কলমে সমর-কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

সামাজিক অবস্থান ও বর্ণের গতিশীলতা

রামায়ণে ক্ষত্রিয় বর্ণের অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণের পরেই, কিন্তু শাসনের ক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তবে ক্ষত্রিয়দের এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল জন্মের ওপর নয়, বরং গুণের ওপরও নির্ভরশীল ছিল। শবরী বা গুহকের মতো চরিত্রগুলোর প্রতি রামের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রমাণ করে যে, নৈতিক

উচ্চতা থাকলে নিম্নবর্ণের বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরাও ক্ষত্রিয়ের কাছে পরম পূজনীয় হতে পারতেন।

বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণের গতিশীলতার উদাহরণ হিসেবে রাজা ত্রিশঙ্কুর কাহিনীও উল্লেখযোগ্য, যিনি তাঁর কর্মফলের কারণে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আবার বিশ্বামিত্রের মতো ক্ষত্রিয় কঠোর তপস্যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। এই ঘটনাগুলো নির্দেশ করে যে, রামায়ণের ক্ষত্রিয় সমাজ ব্যবস্থা ছিল একাধারে কঠোর অনুশাসনবদ্ধ এবং গুণগত বিবর্তনের ক্ষেত্রে নমনীয়।

পরিশেষে, বাল্মীকি রামায়ণে ক্ষত্রিয়দের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা কেবল একজন যোদ্ধার চিত্র নয়, বরং তা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের সমাহার। এই দর্শনের মূলে রয়েছে সত্যরক্ষা, প্রজাপালন এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষা। শ্রীরামচন্দ্রের মাধ্যমে বাল্মীকি দেখিয়েছেন যে, একজন ক্ষত্রিয় রাজার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সুখ ও আবেগের চেয়ে রাষ্ট্রের মঙ্গল ও ধর্মের বিধান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাজধর্মের সূক্ষ্ম কার্যাবলী থেকে শুরু করে সমর-নীতির উচ্চতর নৈতিক মানদণ্ড—সবকিছুর মধ্যেই ক্ষত্রিয় বর্ণের এক মহান ও দায়িত্বশীল রূপ ফুটে উঠেছে। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র সংঘাতের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের ওপর ব্রহ্মতেজের বা আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বও এই মহাকাব্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, বাল্মীকি রামায়ণে ক্ষত্রিয়রা হলেন সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তম্ভ, যা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ ও মূল্যবোধকে সহস্রাব্দ ধরে পথ দেখিয়ে আসছে। রামায়ণের এই ক্ষত্রিয় চেতনার মূল কথা হলো—বীরত্ব যখন ধর্মের অনুগামী হয়, তখনই সমাজে 'রামরাজ্য' বা আদর্শ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



রামায়ণে ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতী রাধারানী দেবী

বাল্মীকি রামায়ণ কেবল পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের বীরত্বগাথা নয়, বরং এটি প্রাচীন ভারতীয় ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির এক বিশাল দর্পণ, যেখানে নারী চরিত্রগুলি তাঁদের সাহস, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং নৈতিক দৃঢ়তার মাধ্যমে কাহিনীর গতিপথ নির্ধারণ করেছেন। এই মহাকাব্যে বর্ণিত ক্ষত্রিয় নারীরা কেবল রাজপ্রাসাদের অলঙ্কার ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন রণনিপুণা, মন্ত্রণা-দক্ষ এবং ধর্মের কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক এক জন স্বতন্ত্র সত্তা। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনাবলীতে সীতা, কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং মন্দোদরীর ন্যায় চরিত্রগুলি প্রমাণ করে যে ক্ষত্রিয় নারীত্ব কেবল ধৈর্যের প্রতীক নয়, বরং তা একাধারে প্রশাসনিক দক্ষতা ও আধ্যাত্মিক তেজের এক অনন্য সংমিশ্রণ।

ক্ষত্রিয় নারীত্বের উৎস ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

রামায়ণের সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাঁদের জন্ম, শিক্ষা এবং বিবাহ—প্রতিটি স্তরেই এক ধরনের রাজকীয় তেজ ও শৃঙ্খলার প্রতিফলন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মিথিলার রাজকন্যা সীতার জন্ম কোনো সাধারণ মানবিক গর্ভে হয়নি, বরং তিনি যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময় পৃথিবী থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই অলৌকিক উৎপত্তি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগের ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে, কৈকেয়ী বা মন্দোদরীর ন্যায় চরিত্রগুলি তাঁদের শক্তিশালী পারিবারিক বংশমর্যাদা এবং শস্ত্রবিদ্যার দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত রাজকন্যাদের কেবল গৃহকর্মে নয়, বরং প্রশাসনিক আলোচনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী কৌশল্যা অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় জটিল রাজকীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর উচ্চতর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ক্ষত্রিয় নারীরা যে কেবল অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ কৈকেয়ীর রণক্ষেত্রে উপস্থিতি, যেখানে তিনি সরাসরি যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বদলে দিয়েছিলেন।

সীতা: বীরত্ব, আত্মমর্যাদা ও ক্ষত্রিয় তেজের চরম বিকাশ

সীতা রামায়ণের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র এবং তাঁর জীবন একাধারে আদর্শ স্ত্রী, সাহসী ক্ষত্রিয় নারী এবং সুযোগ্য জননীর

আলেখ্য। বৈদেহী সীতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি কেবল রামের ছায়া ছিলেন না, বরং তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ।

অজেয় শারীরিক ও মানসিক শক্তি

সীতার ক্ষত্রিয় তেজের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাল্যকালে, যখন তিনি মহাদেব শিবের সেই দুষ্কর ধনুর্বাণটি অত্যন্ত অবলীলায় উত্তোলন করেছিলেন, যা বহু শক্তিশালী রাজাও নড়াতে পারেননি। এই ঘটনাটি নির্দেশ করে যে তিনি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই একজন বীর ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর এই শক্তির কারণেই রাজা জনক ঘোষণা করেছিলেন যে, কেবল সেই ব্যক্তিই সীতাকে বিবাহ করতে পারবেন যিনি এই ধনুতে গুণ পরিয়ে তা ভঙ্গ করতে সক্ষম হবেন।

বনবাসের সিদ্ধান্ত: সার্বভৌম ইচ্ছার প্রকাশ

রাম যখন কৈকেয়ীর বরে বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন সীতাকে প্রাসাদে থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু সীতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর যুক্তি ছিল কোনো সাধারণ অনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি ছিল এক ক্ষত্রিয় পত্নীর আত্মমর্যাদার লড়াই। তিনি রামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, ক্ষত্রিয় পত্নী হিসেবে তাঁর স্থান সর্বদা তাঁর স্বামীর পাশে, তা সে রাজপ্রাসাদেই হোক বা ভয়ংকর অরণ্যে। তিনি এমনকি রামকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, যদি তিনি সীতাকে রক্ষা করতে ভয় পান, তবে জগৎ জানবে যে রাজা জনক বীরের বেশে এক ভীরু পুরুষকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই ধরনের সাহসী ও শাণিত বাক্য কেবল একজন উচ্চপদস্থ ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষেই বলা সম্ভব।

অশোকবনে নৈতিক প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

রাবণ কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পর লঙ্কার অশোকবনে সীতার অবস্থান ছিল তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা। রাবণ যখন তাঁকে সম্পদ, ক্ষমতা এবং লঙ্কার ঈশ্বরীর পদের প্রলোভন দেখান, তখন সীতা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি রাবণকে 'ক্ষুদ্র শশক' এবং রামকে 'মহাবলশালী সিংহ' বা 'হস্তী'র সঙ্গে তুলনা করে নিজের রাজবংশীয় গর্ব ও আভিজাত্য প্রকাশ করেছিলেন।

রাবণের সঙ্গে কথোপকথনের সময় সীতা একটি তৃণখণ্ড (একটি ঘাসের টুকরো) নিজের এবং রাবণের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। এটি কেবল একটি সাধারণ ঘাস ছিল না, বরং এটি ছিল তাঁর সতীত্ব এবং ক্ষত্রিয় তেজের এক দুর্ভেদ্য সীমানা,

যা রাবণের ন্যায় পরাক্রমশালী বীরকেও স্পর্শ করার সাহস দেয়নি। তিনি রাবণকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, রামের অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া তিনি রাবণকে ভস্ম করার ক্ষমতা রাখলেও তা করছেন না, কারণ তিনি তাঁর স্বামীর শৌর্য ও মর্যাদাকে খাটো করতে চান না।

অগ্নিপরীক্ষা ও জননী হিসেবে নেতৃত্ব

যুদ্ধ পরবর্তী অগ্নিপরীক্ষা ছিল সীতার আত্মসম্মানের এক চূড়ান্ত রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘোষণা। তিনি অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসার মাধ্যমে কেবল নিজের বিশুদ্ধতা নয়, বরং ইক্ষ্বাকু বংশের মর্যাদাও রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত হন, তখন তিনি একাকী লব ও কুশকে লালন-পালন করেন। তিনি তাঁদের শস্ত্রবিদ্যা ও বীরত্বে এমনভাবে শিক্ষিত করেছিলেন যে, তাঁরা লক্ষ্মণ এবং এমনকি রামকেও যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি সীতার এক সার্থক ক্ষত্রিয় জননী ও নেত্রী সত্তার পরিচয় দেয়।

কৈকেয়ী: রণনিপুণা ও কৌশলী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু

কৈকেয়ীর চরিত্রটি রামায়ণে প্রায়শই নেতিবাচকভাবে দেখা হলেও, ক্ষত্রিয় নারীত্বের প্রেক্ষাপটে তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি কেবল রূপবতী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা।

রণক্ষেত্রের বীরত্ব ও দশরথের জীবন রক্ষা

কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী সমরবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধের সময় তিনি রাজা দশরথের সারথি হিসেবে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। শম্বরাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যখন রাজা দশরথ আহত হন এবং তাঁর রথের অক্ষদণ্ড ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কৈকেয়ী অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি নিজের বাম হাত বা আঙুল (ভিন্ন ভিন্ন পাঠভেদে) সেই ছিদ্রস্থলে প্রবেশ করিয়ে রথটিকে স্থির রেখেছিলেন যতক্ষণ না রাজা নিরাপদ স্থানে পৌঁছান। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য দশরথ তাঁকে দুটি বর দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যা পরবর্তীতে রামায়ণের কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতার রাজনীতি

মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী যখন রামের পরিবর্তে ভরতের রাজ্যাভিষেক দাবি করেন, তখন তাঁর মধ্যে এক প্রখর রাজনৈতিক চেতনা কাজ করেছিল। তিনি জানতেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে রামের অভিষেক হয়ে গেলে ভরতের কোনো

ভবিষ্যৎ থাকবে না। কৈকেয়ী সময়ের গুরুত্ব বুঝে কাজ করেছিলেন। তিনি দশরথকে বলেছিলেন যে, রামের অভিষেক অনুষ্ঠানের জল ঝরানোর আগেই যেন তাঁর দাবি পূরণ করা হয়। বাল্মীকি রামায়ণে তাঁর বুদ্ধিকে চার প্রকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে: 'স্মৃতি' (অতীত মনে রাখা), 'মতি' (ভবিষ্যৎ অনুমান), 'বুদ্ধি' (বর্তমান পরিস্থিতি বিচার) এবং 'প্রজ্ঞা' (কালজয়ী জ্ঞান)। এই বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে তিনি একজন উচ্চস্তরের প্রশাসনিক মস্তিষ্ক ছিলেন।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা: রাজপ্রাসাদের নৈতিক ও প্রশাসনিক স্তম্ভ

অযোধ্যার অন্দরমহলে কৌশল্যা ও সুমিত্রা ছিলেন আভিজাত্য এবং ধর্মের ধারক। কৌশল্যা ছিলেন জ্যেষ্ঠা মহিষী এবং তাঁর পদমর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। অন্যদিকে সুমিত্রা ছিলেন গভীর প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি।

কৌশল্যার ধর্মীয় ও প্রশাসনিক যুক্তি

রাম যখন বনবাসের অনুমতি চান, তখন কৌশল্যা কেবল মাতৃত্বের আবেগে কাঁদেননি, বরং তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, রামের প্রতি তাঁর মাতার অধিকার পিতার সমান। তিনি মহর্ষি কশ্যপের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে, কশ্যপ মাতাকে সেবা করেই স্বর্গ লাভ করেছিলেন। কৌশল্যা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, রামের এই নির্বাসন রাজার নিজের ইচ্ছা নয়, বরং কৈকেয়ীর দ্বারা প্ররোচিত একটি সিদ্ধান্ত। তিনি এমনকি লক্ষ্মণকে রামের সঙ্গে যাওয়ার বিষয়ে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন, কিন্তু একই সাথে রাজদণ্ড ও শাসনের গুরুত্বও অনুভব করেছিলেন।

সুমিত্রার প্রজ্ঞা ও শান্তিকামী নেতৃত্ব

সুমিত্রা চরিত্রটি রামায়ণে এক নিভৃত অথচ অসামান্য দৃঢ়তার প্রতীক। তিনি যখন তাঁর দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে রাম ও ভরতের সেবায় নিয়োজিত করেন, তখন তাঁর মধ্যে কোনো মোহ কাজ করেনি। তিনি লক্ষ্মণকে বিদায় জানানোর সময় যে অমোঘ উপদেশ দিয়েছিলেন তা ক্ষত্রিয় পারিবারিক দর্শনের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন: **"রামকে মনে করবে রাজা দশরথ, সীতাকে মনে করবে আমাকে (তোমার মা) এবং বনকে মনে করবে অযোধ্যা"।**

যখন রামের শোকে কৌশল্যা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলেন, তখন সুমিত্রাই তাঁকে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তিনি রামের শৌর্য ও দেবত্ব সম্পর্কে কৌশল্যাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, রামের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে সূর্যও দগ্ধ করতে পারে না এবং বনও তাঁর কাছে রাজপ্রাসাদ হয়ে

ওঠে। সুমিত্রার এই দার্শনিক গভীরতা এবং কৌশল্যাকে সামলানোর ক্ষমতা তাঁকে রাজপ্রাসাদের এক অপরিহার্য স্থিতিশীলতা প্রদানকারী চরিত্রে পরিণত করেছে।

মন্দোদরী: অসুর সাম্রাজ্যের ক্ষাত্রতেজ ও নৈতিক প্রজ্ঞা

রাক্ষসরাজ রাবণের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মন্দোদরী ছিলেন সর্বগুণসম্পন্না এক ক্ষত্রিয় সুলভ নারী। তিনি ময়াসুর এবং অপ্সরা হেমার কন্যা হওয়ার কারণে একাধারে ঐশ্বরিক ও পরাক্রমশালী সত্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রটি লঙ্কার বিলাসিতা এবং অধর্মের মাঝেও এক আলোকবর্তিকার ন্যায় জ্বলজ্বল করত।

রাবণের প্রধান উপদেষ্টা ও নৈতিক রক্ষক

মন্দোদরী কেবল রাবণের অনুগতা স্ত্রী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন তাঁর নির্ভীক উপদেষ্টা। তিনি বারবার রাবণকে সতর্ক করেছিলেন যে, সীতা কোনো সাধারণ নারী নন এবং পরস্ত্রী হরণ লঙ্কার বিনাশ ডেকে আনবে। তিনি রাবণকে বুঝিয়েছিলেন যে, রামের সঙ্গে শত্রুতা করা মানে নিজের মৃত্যুকে আহ্বান করা। একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ও অহংকারী রাজার সামনে দাঁড়িয়ে এই সত্য বলার সাহস কেবল এক সুশিক্ষিত ও তেজস্বী ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষেই সম্ভব।

সীতার প্রতি সহমর্মিতা ও মানবিক সাহস

অশোকবনে রাবণ যখন সীতাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, তখন মন্দোদরীই তাঁর হাত ধরে সেই মহাপাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি রাবণকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন নিরপরাধ ও সহায়হীন নারীকে হত্যা করা বীরের লক্ষণ নয়। মন্দোদরীর এই হস্তক্ষেপ কেবল সীতার প্রাণ বাঁচায়নি, বরং তা এক উচ্চতর নৈতিক চেতনার পরিচয় দিয়েছিল যা লঙ্কার অসুর সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে ছিল। রাবণের মৃত্যুর পর তাঁর বিলাপের মধ্যে যে গভীর জীবনদর্শন ও রামের দেবত্ব স্বীকারের কথা পাওয়া যায়, তা তাঁর প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ।

তারার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতা

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বানররাজ বালীর মহিষী তারা ক্ষত্রিয় নারীসুলভ কূটনৈতিক বুদ্ধির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কেবল অন্তঃপুরিকা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে ও রাজনৈতিক মন্ত্রণায় এক অসামান্য নেত্রী।

বালীর প্রতি রণকৌশলগত পরামর্শ

যখন সুগ্রীব রামের সাহায্যে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান জানান, তখন তারা বালীকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সুগ্রীবের হঠাৎ ফিরে আসার পেছনে কোনো মহাশক্তি (রাম) কাজ করছে। তিনি বালীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সুগ্রীবের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য। বালী যদি তারার এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ মেনে নিতেন, তবে তাঁর প্রাণ সংশয় হতো না। তারার এই দূরদর্শিতা প্রমাণ করে যে তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন।

লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রশমন ও কিষ্কিন্ধ্যা রক্ষা

বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব যখন রামের কার্য সম্পাদনে দেরি করছিলেন, তখন ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় আক্রমণ করতে আসেন। সেই সংকটময় মুহূর্তে সুগ্রীব ও অন্যান্য মন্ত্রীরা ভয়ে কুঁকড়ে গেলেও তারা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লক্ষ্মণের সামনে উপস্থিত হন। তিনি লক্ষ্মণকে শান্ত করার জন্য অত্যন্ত মার্জিত এবং যুক্তিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কামতত্ত্ব এবং মানবিক দুর্বলতার কথা বলে লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রশমিত করেন এবং কিষ্কিন্ধ্যাকে একটি বড় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর এই কূটনৈতিক সাফল্য তাঁকে রামায়ণে এক অনন্য মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।

ক্ষত্রিয় নারীর সংলাপ ও বাকপটুতা: শাণিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ

রামায়ণের নারীরা কেবল তাঁদের কর্মে নয়, তাঁদের বাকপটুতায় এবং যুক্তিনির্ভর সংলাপেও অনন্য ছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে এমন অনেক মুহূর্ত রয়েছে যেখানে এই নারীরা পুরুষ চরিত্রদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন বা সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন। সীতার সঙ্গে রাবণের সংলাপ বা কৌশল্যার সঙ্গে রামের যুক্তিযুদ্ধ এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

সীতার তুলনা ও বিদ্রূপ

সুন্দরকাণ্ডে রাবণকে সীতা যেভাবে তুলনা করেছেন তা তাঁর আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। তিনি বলেছিলেন:

"সিংহ ও শৃগালের মধ্যে যে পার্থক্য, সমুদ্র ও সাধারণ নালার মধ্যে যে পার্থক্য, অমৃত ও পান্তা ভাতের মধ্যে যে পার্থক্য—রাম এবং তোমার মধ্যে ঠিক সেই পার্থক্য"।

এই ধরনের তীব্র বাক্যালঙ্কার কেবল একজন উচ্চবংশজাত এবং সাহসী ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষেই সম্ভব। তিনি রাবণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তিনি রামের অনুপস্থিতিতে সীতাকে হরণ করে নিজেকে এক **'চতুর চোর'** হিসেবে প্রমাণ করেছেন, বীর যোদ্ধা হিসেবে নয়।

মন্দোদরীর দার্শনিক বিলাপ - রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী যখন রণক্ষেত্রে বিলাপ করছিলেন, তখন তাঁর মুখে রামের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি রামকে কোনো সাধারণ মানুষ হিসেবে নয়, বরং 'বিষ্ণু' বা 'পরমাত্মা' হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, রাবণ তাঁর ইন্দ্রিয় জয় করতে না পেরেই ধ্বংস হয়েছেন। এই বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে মন্দোদরী কেবল একজন রানী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক দার্শনিক।

ক্ষত্রিয় নারীত্বের বিবর্তন ও মহাকাব্যের ইতিবাচক পরিণাম - রামায়ণের এই ক্ষত্রিয় নারীরা কেবল ঘটনার সাক্ষী ছিলেন না, বরং তাঁরাই ছিলেন পরিস্থিতির রূপকার। তাঁদের ত্যাগ, বীরত্ব এবং নৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই 'রামরাজ্য' বা একটি আদর্শ সমাজের স্বপ্ন সফল হয়েছে।

ক্ষত্রিয় নারীত্বের এই বহুমুখী রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা কখনোই ভাগ্যের ওপর নিষ্ক্রিয়ভাবে নির্ভর করেননি। কৈকেয়ী তাঁর অধিকার আদায়ে সক্রিয় ছিলেন, সীতা তাঁর আত্মমর্যাদা রক্ষায় অটল ছিলেন এবং কৌশল্যা তাঁর রাজকীয় দাবি পেশ করেছিলেন। এমনকি উর্মিলার ন্যায় চরিত্র, যিনি নিঃশব্দে ১৪ বছর প্রতীক্ষা করেছিলেন, তিনিও তাঁর ত্যাগের মাধ্যমে মহাকাব্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত এই চরিত্রগুলি প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় নারীরা কেবল সাহসিকতা নয়, বরং একাধারে প্রশাসনিক দক্ষতা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞারও প্রতীক ছিলেন। তাঁদের এই ইতিবাচক ভূমিকা রামায়ণে কেবল পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর সহায়ক হিসেবে নয়, বরং স্বাধীন এবং তেজস্বী সত্তা হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছে। তাঁদের জীবনদর্শন ও কর্মতৎপরতা আজও নারীত্বের তেজ ও আভিজাত্যের এক চিরন্তন উৎস হিসেবে গণ্য হয়। এই সকল নারীরা সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের আদর্শ হোক।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



মহাভারতের ক্ষত্রিয় আদর্শ

- শ্রীধনেশ্বর নস্কর

মহাভারত কেবল একটি প্রাচীন মহাকাব্য নয়, বরং এটি ভারতীয় সংস্কৃতির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিশেষত ক্ষত্রিয় জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ। এই মহাকাব্যের বিশাল ক্যানভাসে ক্ষত্রিয়দের যে জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে, তা মূলত শক্তি, শাসন এবং ধর্মের এক অনন্য সমন্বয়। মহাভারতের আলোচনায় ক্ষত্রিয়দের প্রধান পরিচয় হলো তাঁরা সমাজের রক্ষক এবং ন্যায়বিচারের ধারক। শান্তিপর্ব থেকে শুরু করে অনুশাসন পর্ব এবং বনপর্বের বিভিন্ন উপাখ্যানে ক্ষত্রিয়দের যে চরিত্রায়িত রূপ দেখা যায়, তা একদিকে যেমন রণকৌশলগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে, অন্যদিকে তা প্রজাপালন এবং ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর।

ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি এবং সংজ্ঞায়িত আদর্শ

মহাভারতের শান্তিপর্বে ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এই বর্ণের সামাজিক গুরুত্বকে নির্দেশ করে। পরাশর মুনি এবং পিতামহ ভীষ্মের বর্ণনা অনুসারে, প্রজাপতি ব্রহ্মার বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি হয়েছে। এই রূপকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মানবদেহে বাহু যেমন শরীরের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং প্রয়োজনে আঘাত প্রতিরোধ করে, ক্ষত্রিয়দের কাজও তেমনি সমাজকে বাহুবলের মাধ্যমে রক্ষা করা। 'ক্ষত্র' শব্দটির মূল অর্থ হলো শাসন বা কর্তৃত্ব, এবং যারা এই শাসনের মাধ্যমে সমাজকে অধর্ম ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন, তাঁরাই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ধর্ম কোনো সাধারণ জীবনপদ্ধতি নয়, বরং এটি এক প্রকার নিরন্তর সাধনা। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম হলো বীরত্ব প্রদর্শন করা এবং অশুভ শক্তিকে দমন করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত গুণের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, **অস্ত্রনিপুণতাই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, এবং যজ্ঞ সম্পাদন তাঁদের পরম ধর্ম।** এই দর্শনে ক্ষত্রিয় কেবল একজন যোদ্ধা নন, তিনি একজন ধার্মিক প্রশাসক যিনি প্রজাদের প্রতি পিতার মতো স্নেহশীল ।

রাজধর্ম: মহাভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দর্শন

মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব অর্থাৎ শান্তিপর্ব হলো রাজধর্ম বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক বিশাল আকর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে যুধিষ্ঠির যখন রাজ্য ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন, তখন পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত কর্তব্য এবং রাজধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। **ভীষ্মের মতে, রাজধর্মই হলো**

শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কারণ পৃথিবীর সকল স্তরের মানুষের নিরাপত্তা এবং উন্নতি এই ধর্মের ওপরেই নির্ভরশীল ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং দণ্ডনীতির আবশ্যকতা - মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, মানব ইতিহাসের শুরুর দিকে কোনো রাজা বা দণ্ড ছিল না। মানুষ তখন প্রাকৃতিকভাবেই সৎ জীবন যাপন করত। কিন্তু কালক্রমে মানুষের মনে মোহ এবং লোভের জন্ম হলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এই 'মাৎস্যন্যায়' বা সবলের দ্বারা দুর্বলকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই ব্রহ্মা দণ্ডনীতি এবং শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ।

ক্ষত্রিয় রাজার প্রধান অস্ত্র হলো 'দণ্ড'। এই দণ্ড কেবল শাস্তির প্রতীক নয়, বরং এটি হলো পবিত্র আইনের রক্ষক। ভীষ্ম বলেন যে, **দণ্ড যখন সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তখন সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে।** কিন্তু যদি কোনো রাজা অযোগ্য বা পক্ষপাতদুষ্ট হন, তবে সেই দণ্ডই রাজাকে সপরিবারে ধ্বংস করে দেয়। রাজধর্মের এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি মূলত ক্ষমতার ভারসাম্য এবং দায়িত্বশীল শাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাপালন ও সুশাসনের মূলনীতি

মহাভারতে একজন আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজার প্রধান কর্তব্য হিসেবে **'প্রজাপালন'** কে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। একজন সফল রাজার চরিত্র বসন্তকালীন সূর্যের মতো হওয়া উচিত—যা নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ অতি কঠোরও নয় আবার অতি কোমলও নয়। রাজা নিজের ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে প্রজাদের হিতসাধনকে বড় করে দেখবেন। ভীষ্মের মতে, রাজা প্রজাদের কাছে হবেন একজন পিতার মতো, যাঁর ছায়ায় প্রজারা নির্ভয়ে বসবাস করবে।

একজন আদর্শ রাজার জন্য শান্তিপর্বে যে ৩৬টি গুণের কথা বলা হয়েছে, তা বর্তমান সময়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নিচে একটি সারণির মাধ্যমে এই গুণের কিছু প্রধান দিক তুলে ধরা হলো:

সুশাসনের ক্ষেত্র	রাজার কর্তব্য ও আদর্শ গুণাবলী
ব্যক্তিগত চরিত্র	রাজা হবেন সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ক্রূরতাবর্জিত। তিনি সর্বদা ন্যায়নিষ্ঠ থাকবেন।
প্রশাসনিক দক্ষতা	অমাত্য বা মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং দুর্নীতিনিবারণে কঠোর হওয়া।
অর্থনৈতিক নীতি	প্রজাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করা এবং কোষাগারের

সুশাসনের ক্ষেত্র	রাজার কর্তব্য ও আদর্শ গুণাবলী
	অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা।
নিরাপত্তা	নিজের ছিদ্র বা দুর্বলতা গোপন রাখা এবং শত্রুর দুর্বলতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
সামাজিক ভারসাম্য	সমাজের সকল বর্ণের মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং অসহায়দের সাহায্য করা।

রাজার আয়ের উৎস বা রাজস্ব আদায় সম্পর্কে মহাভারতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম নির্দেশনা রয়েছে। রাজা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর চাপাবেন না, বরং মৌমাছি যেমন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে ফুলের ক্ষতি না করে, রাজাও তেমনি ধীরে ধীরে রাজস্ব সংগ্রহ করবেন। সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গ—অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ।

ধনুর্বেদ: ক্ষত্রিয় সামরিক শিক্ষা ও সমরকলা - মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের জীবন মূলত রণক্ষেত্রের প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হতো। তাঁদের এই সামরিক শিক্ষাকে বলা হতো 'ধনুর্বেদ'। এটি কেবল ধনুক চালনার বিদ্যা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিজ্ঞান যা শারীরিক শক্তির পাশাপাশি মানসিক একাগ্রতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ওপরও নির্ভর করত ।

সামরিক প্রশিক্ষণের কাঠামো ও স্তরবিন্যাস - মহাভারতের আখ্যানে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য এবং পরশুরামের মতো আচার্যদের অধীনে রাজপুত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। ধনুর্বেদ অনুসারে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের মূলত চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হতো :

রথী: রথ চালনা এবং রথ থেকে তীরের নিখুঁত লক্ষ্যভেদে দক্ষ যোদ্ধা। অর্জুন এবং কর্ণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ রথী।

গজযোদ্ধা: হাতির ওপর থেকে যুদ্ধ করার বিদ্যায় পারদর্শী। ভীম এই ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অশ্বারোহী: ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া চালিয়ে তলোয়ার বা বর্শা দিয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার কৌশল।

পদাতিক: যারা ঢাল, তলোয়ার বা গদা নিয়ে সরাসরি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেন।

অস্ত্রশস্ত্রের বিচারে ধনুর্বেদ পাঁচটি প্রধান বিভাগ চিহ্নিত করে: **'মুক্ত'** (যা ছুড়ে মারা

যায়), **'অমুক্ত'** (যা হাতে ধরে রাখা হয়), **'মুক্তামুক্ত'** (যা ছুড়ে মেরে আবার ফিরিয়ে আনা যায়), **'যন্ত্রমুক্ত'** (মেশিন বা যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত) এবং **'পাণিমুক্ত'** (হাত দিয়ে নিক্ষিপ্ত)।

রণ-ভঙ্গিমা বা আসনের প্রয়োগ

একজন শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদের জন্য স্থিরতা এবং ভারসাম্য অত্যন্ত জরুরি। ধনুর্বেদে নয়টি প্রধান আসনের কথা বলা হয়েছে, যা একজন ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে অজেয় করে তোলে :

সমপাদ: পা সমান রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

আলীঢ়: ডান হাঁটু বাঁকিয়ে বাম পা পেছনে প্রসারিত করা, যা আক্রমণের জন্য উপযুক্ত।

প্রত্যালীঢ়: বাম হাঁটু বাঁকিয়ে ডান পা পেছনে প্রসারিত করা।

মন্ডল: হাঁটু ফাঁক করে বৃত্তাকারে অবস্থান নেওয়া।

স্বস্তিক: পা দুটিকে একে অপরের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা।

মহাভারতের সমরাঙ্গনে একাগ্রতার গুরুত্ব বোঝাতে দ্রোণাচার্যের পাখির চোখের লক্ষ্যভেদের কাহিনীটি এক অনন্য উদাহরণ। যেখানে অন্য রাজপুত্ররা আকাশ, গাছ বা পাখিটিকে দেখছিলেন, সেখানে অর্জুন কেবল পাখির চোখটি দেখতে পাচ্ছিলেন। এই মানসিক একাগ্রতাই ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত শক্তি।

ক্ষত্রিয় শৌর্য ও বীরত্বের আদর্শ চরিত্রসমূহ

মহাভারত বীরগাথার এক অনবদ্য সংকলন। এখানে বীরত্বের সংজ্ঞা কেবল শত্রু নিধনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নীতি এবং আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই নিহিত।

ভীষ্ম: প্রতিজ্ঞা ও নিষ্ঠার সমন্বয় - ভীষ্মের চরিত্র ক্ষত্রিয়ের অটল সংকল্প এবং ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তাঁর প্রকৃত নাম দেবব্রত। পিতা শান্তনুর ব্যক্তিগত সুখ নিশ্চিত করার জন্য তিনি নিজের রাজ্য লাভের অধিকার এবং বিবাহের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এই 'ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা' তাঁকে দেবতাদের কাছেও বন্দিত করে তোলে এবং তিনি 'ইচ্ছামৃত্যু'র বর লাভ করেন। রণাঙ্গনে তিনি ছিলেন অপরাজেয়, কিন্তু তাঁর নীতিবোধ ছিল এতটাই উন্নত যে তিনি শিখণ্ডীর মতো অসম যোদ্ধার সামনে অস্ত্র ধরতেন না।

অর্জুন: দক্ষতা ও একাগ্রতার প্রতিমূর্তি - অর্জুনকে মহাভারতে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর বীরত্ব কেবল শারীরিক শক্তিতে নয়, বরং তাঁর

কৌশলগত ধীশক্তিতে নিহিত। তিনি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের অংশজাত এবং আচার্য দ্রোণের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। অর্জুনের বীরত্ব প্রকাশ পায় যখন তিনি এককভাবে দ্রুপদকে পরাজিত করেন কিংবা স্বয়ংবর সভায় মৎস্যচক্ষু ভেদ করে দ্রৌপদীকে জয় করেন। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো তিনি যুদ্ধজয়ের চেয়েও ধর্মের সংস্থাপনে বেশি মনোযোগী ছিলেন।

কর্ণ: দান ও শৌর্যের সমন্বয়

কর্ণের চরিত্র মহাভারতের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ চরিত্র। সূতপুত্রের পরিচয়ে অবহেলিত হয়েও তিনি নিজ বীরত্বে বীরদের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কর্ণের দানশীলতা ছিল প্রবাদপ্রতিম। যখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁর কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করেন, তখন কর্ণ নিশ্চিতভাবে জানতেন যে এটি দিলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য, তবুও তিনি হাসিমুখে তা দান করে দেন। তাঁর এই অসামান্য ত্যাগ এবং দুর্যোধনের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁকে 'দানবীর' এবং 'মহাবীর' হিসেবে অমর করে রেখেছে।

তরুণ বীরত্ব: অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ

ক্ষত্রিয় বীরত্বের মহিমা কেবল প্রবীণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অভিমন্যু মাত্র ১৬ বছর বয়সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, তা আজও কিশোর বীরত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কৌরবদের ব্যূহ ভেদ করে একাকী লড়ে তিনি যেভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, তা **ক্ষত্রিয়ের 'রণে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ'** এই নীতিকে সার্থক করে। একইভাবে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ নিজের শরীরকে শত্রুর ওপর আছড়ে ফেলে কৌরববাহিনীর বিশাল অংশ ধ্বংস করেছিলেন, যা ছিল ত্যাগের এক চরম নিদর্শন।

ধর্মযুদ্ধ ও রণক্ষেত্রের নৈতিক বিধি

মহাভারতে যুদ্ধের একটি নির্দিষ্ট কোড অফ কন্ডাক্ট বা নৈতিক বিধি ছিল, যাকে বলা হতো **'ধর্মযুদ্ধ'**। যদিও যুদ্ধের অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলি লঙ্ঘিত হয়েছে, তবুও মূল নীতিগুলি ক্ষত্রিয়ের উন্নত রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

শান্তিপর্বে ভীষ্ম এবং মহাভারতের অন্যান্য আখ্যানে যুদ্ধের যে নিয়মগুলি বর্ণিত হয়েছে তা নিচে সারণিবদ্ধ করা হলো:

যুদ্ধের নীতি	বিবরণ
সমমর্যাদার	একজন রথী কেবল অন্য একজন রথীর সাথেই যুদ্ধ

যুদ্ধের নীতি	বিবরণ
লড়াই	করবেন।
অস্ত্রহীনের সুরক্ষা	যার হাতে অস্ত্র নেই, বা যার ধনুক ভেঙে গেছে, তাকে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ।
শরণাগতি	শত্রু যদি আত্মসমর্পণ করে বা 'আশ্রয়' চায়, তবে তাকে জীবনদান করতে হবে।
অযুদ্ধের সময়	সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পরে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।
অসামরিক ব্যক্তিদের সুরক্ষা	সারথি, ভৃত্য, বাদ্যকর এবং অসামরিক ব্যক্তিদের ওপর আঘাত করা মহাপাপ।

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধ ছিল একটি পবিত্র যজ্ঞের মতো। রণাঙ্গনে বীরগতি প্রাপ্ত হওয়া ক্ষত্রিয়ের জন্য স্বর্গের দুয়ার উন্মুক্ত করার শামিল। এই কারণেই বীররা পিছু না হটে সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জনকে গৌরবের মনে করতেন।

সামাজিক জীবন ও ক্ষত্রিয় সংস্কৃতি

মহাভারতের সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয়দের অবস্থান ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ঐতিহ্যে ভরপুর।

শিক্ষা এবং রাজকীয় শিষ্টাচার

ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদের বাল্যকাল কাটত কঠোর ব্রহ্মচর্য এবং শিক্ষার মাধ্যমে। তাঁরা কেবল অস্ত্রবিদ্যাই নয়, রাজনীতি, ইতিহাস এবং দর্শনশাস্ত্রও অধ্যয়ন করতেন। একজন ক্ষত্রিয়কে রাজসভায় চলাফেরার ক্ষেত্রেও বিশেষ শিষ্টাচার মেনে চলতে হতো। ধৌম্য মুনি যখন পাণ্ডবদের বিরাট রাজার সভায় কাজ করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি রাজকীয় আদব-কেতা সম্পর্কে বিস্তারিত উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজার সামনে উচ্চস্বরে হাঁচি না দেওয়া, গোপন কথা প্রকাশ না করা এবং রাজার প্রিয়পাত্রদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ছিল ক্ষত্রিয় শিষ্টাচারের অঙ্গ।

বিবাহ প্রথা ও নারীর অবস্থান

মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবাহের বৈচিত্র্যময় রূপ দেখা যায়। স্বয়ংবর সভা ছিল ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের জীবনসাথি

নির্বাচনের একটি সম্মানজনক মাধ্যম। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই রাজনৈতিক মিত্রতা বৃদ্ধির জন্য একাধিক বিবাহ করতেন।

বিবাহের ধরণ	বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ
স্বয়ংবর	কন্যারা নিজ পছন্দে বা বীরত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে বর নির্বাচন করেন। উদা: দ্রৌপদী।
গান্ধর্ব বিবাহ	পারস্পরিক প্রেম ও সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ। উদা: অর্জুন ও সুভদ্রা।
রাক্ষস বিবাহ	কন্যাকে অপহরণ করে বিবাহ, যা বীরত্বের প্রকাশ হিসেবে দেখা হতো। উদা: অম্বিকা-অম্বালিকা।
বিবাহের ক্রম	ক্ষত্রিয়রা সাধারণত নিজ বর্ণে বিবাহ করতেন, তবে বৈশ্য বা শূদ্র কন্যাকেও স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন।

ক্ষত্রিয় নারীরাও সমভাবে শিক্ষিত এবং রণবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা কেবল অন্তঃপুরেই থাকতেন না, বরং প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে বা রাজকার্যে পরামর্শ দিতেন । দ্রৌপদীর ন্যায়পরায়ণতা এবং কুন্তীর ধৈর্য ক্ষত্রিয় নারীর আত্মসম্মান ও শক্তির পরিচায়ক।

শরণাগতরক্ষা: ক্ষত্রিয়ের মানবিক আদর্শ

মহাভারতে ক্ষত্রিয় ধর্মের একটি অত্যন্ত মানবিক দিক হলো **'শরণাগতরক্ষা'**। আশ্রিতের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে ক্ষত্রিয়ের সর্বোচ্চ গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

রাজা শিবী এবং কপোতের উপাখ্যান

মহাভারতের বনপর্বে রাজা শিবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যা ত্যাগের এক চরম দৃষ্টান্ত। একটি কপোত (কবুতর) শোন পাখির (বাজপাখি) ভয়ে রাজা শিবীর কোলে আশ্রয় নেয়। বাজপাখিটি দাবি করে যে কবুতরটি তার আহার, তাই সেটি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু রাজা শিবী বলেন যে, যে তাঁর আশ্রয় চেয়েছে তাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করবেন না। বাজপাখির ক্ষুধা মেটানোর জন্য রাজা নিজের ডান উরু থেকে কবুতরের ওজনের সমান মাংস কেটে দিতে রাজি হন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, রাজত্ব এবং সকল সুখের অধিকারী রাজা নিজের শরীর থেকে মাংস কাটলেও কবুতরের পাল্লা ভারীই থাকে। অবশেষে রাজা নিজেই তুলাদণ্ডে চড়ে বসেন। এই আত্মত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দেবতারা রাজাকে তাঁর সুস্থ শরীর ফিরিয়ে দেন। এই উপাখ্যানটি প্রমাণ করে যে, একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে আশ্রিতের জীবন নিজের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান।

দৈনন্দিন জীবন ও আধ্যাত্মিক চর্চা

ক্ষত্রিয় রাজাদের জীবন কেবল যুদ্ধ এবং রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের প্রাত্যহিক রুটিন ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। অনুশাসন পর্বে ভীষ্মের বর্ণনা অনুযায়ী, একজন ক্ষত্রিয় রাজাকে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠতে হতো এবং স্নান ও দেবপূজা সমাপন করে রাজকার্যে মনোনিবেশ করতে হতো ।

ক্ষত্রিয়দের খাদ্যাভ্যাস এবং সাধারণ জীবনচর্যার কিছু দিক নিম্নরূপ:

খাদ্য: ক্ষত্রিয়রা মৃগয়া বা শিকার করতে পারতেন এবং যজ্ঞে উৎসর্গ করা মাংস গ্রহণ তাঁদের জন্য অনুমোদিত ছিল ।

পবিত্রতা: স্নান না করে বা অপবিত্র অবস্থায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ ছিল ।

দান: দান করা ছিল ক্ষত্রিয়ের অন্যতম প্রধান কাজ। তাঁরা ব্রাহ্মণদের এবং অসহায়দের অকাতরে দান করতেন ।

মহাভারতের ক্ষত্রিয়রা জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রায়ই বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। যুদ্ধের বীরত্বের পর আধ্যাত্মিক শান্তিই ছিল তাঁদের শেষ লক্ষ্য। শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম পর্বে আত্মার মুক্তি এবং বৈরাগ্যের যে গভীর আলোচনা হয়েছে, তা ক্ষত্রিয়দের মানসিক দৃঢ়তা এবং উচ্চতর চেতনার প্রমাণ দেয়।

পরিশেষে, মহাভারতের বিশাল আখ্যানে ক্ষত্রিয়দের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা একাধারে শক্তিশালী এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাঁরা কেবল বাহুবলের অধিকারী ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন ধর্মের রক্ষক এবং ন্যায়বিচারের আধার। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা, অর্জুনের রণকৌশল, কর্ণের দানশীলতা এবং রাজা শিবীর শরণাগতরক্ষা—এই প্রতিটি কাহিনীই ক্ষত্রিয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে। রাজধর্মের যে প্রশাসনিক কাঠামো শান্তিপর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তা আজও সুশাসনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল আদর্শ। মহাভারত আমাদের শেখায় যে, ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত পরিচয় তাঁর জন্মে নয়, বরং তাঁর বীরত্ব, সত্যরক্ষা এবং ত্যাগের মাধ্যমে সমাজকে সুরক্ষা দেওয়ার অঙ্গীকারের মধ্যে নিহিত। এই ইতিবাচক জীবনদর্শনই মহাভারতের ক্ষত্রিয়দের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এই জীবনদর্শন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রপ্ত করতে হবে এবং জীবন ও সমাজে প্রয়োগ করতে হবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

মহাভারতে ক্ষত্রিয় নারী

- শ্রীমতী সুপর্ণা মণ্ডল

ভারতের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারতের বিশাল আখ্যানভাগ কেবল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বা বীরত্বগাথা নয়, বরং এটি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিশেষত ক্ষত্রিয় শ্রেণির নারীত্ব, অধিকার এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার এক অনন্য দর্পণ। এই মহাকাব্যে ক্ষত্রিয় নারীদের চিত্রায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত জটিল এবং প্রভাবশালী চরিত্র হিসেবে, যেখানে তারা কেবল অন্দরমহলের বাসিন্দা নন, বরং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্ষত্রিয় নারীর পরিচয় মূলত 'ক্ষত্রধর্ম' এবং রাজবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার দায়িত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহাভারতের সমাজ ব্যবস্থায় তাদের উপস্থিতি একাধারে গৃহের পরিচালক, সন্তানের নৈতিক শিক্ষক এবং সংকটের মুহূর্তে একনিষ্ঠ যোদ্ধার মতো ।

মহাভারতে ক্ষত্রিয় নারী বা Noblewoman-এর সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো তার বংশমর্যাদা এবং পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু এই সম্পর্কের বাইরেও তাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। ক্ষত্রিয় পরিবারের কন্যারা শৈশব থেকেই রাজনীতি, সমরবিদ্যা এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানে দীক্ষিত হতেন, যা তাদের পরবর্তী জীবনে রাজমহিষী বা রাজমাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়তা করত। ক্ষত্রিয় সমাজে নারীর মর্যাদা মূলত বীর সন্তানের জননী হওয়ার গৌরবের সাথে যুক্ত থাকলেও, মহাভারতের অনেক চরিত্রে আমরা দেখি যে তারা নিজ গুণেই মহীয়সী।

ক্ষত্রিয় সমাজে বিবাহের প্রকারভেদ ও নারীর সম্মতি

মহাভারতের সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে 'স্বয়ংবর' প্রথা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি নারীকে তার জীবনসঙ্গী নির্বাচনের এক বিশেষ অধিকার প্রদান করত, যা অন্যান্য শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে বিরল ছিল। তবে মহাভারতে স্বয়ংবরের বিভিন্ন রূপভেদ দেখা যায়, যা নারীর এজেন্সী বা স্বায়ত্তশাসনের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করে।

স্বয়ংবরের প্রকারভেদ	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
ইচ্ছা স্বয়ংবর (Saundar yaśulkā)	কন্যা কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্য থেকে নিজ পতি নির্বাচন করেন ।	দময়ন্তী

স্বয়ংবরের প্রকারভেদ	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
বীর্যশুল্কা (Vīryaśulkā)	বীরত্বের কোনো বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে বিবাহ করতে হয়। এখানে বীরত্বই মুখ্য ।	দ্রৌপদী
রাক্ষস বিবাহ	বলপূর্বক কন্যাকে জয় করে নিয়ে যাওয়া। এটি ক্ষত্রিয় রীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল ।	অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা

মহাভারতে দময়ন্তীর স্বয়ংবরকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়, যেখানে তিনি এমনকি দেবতাদের মায়াজাল ছিন্ন করে নিজ ভালোবাসার মানুষকে চিনে নিতে সক্ষম হন। অন্যদিকে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ছিল বীর্যশুল্কা, যেখানে তার সম্মতি ছিল অর্জুনের বীরত্বের ওপর নির্ভরশীল। আবার অম্বা ও তার বোনদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ক্ষত্রিয় সমাজে নারীর সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার করুণ দিকটি ফুটিয়ে তোলে।

সত্যবতী: হস্তিনাপুরের রাজবংশের ভাগ্যবিধাতা

মহাভারতের ইতিহাসের শুরুতেই যে শক্তিশালী নারী চরিত্রের উত্থান ঘটে, তিনি হলেন সত্যবতী। ধীবরকন্যা থেকে হস্তিনাপুরের রাজমহিষী হওয়ার এই সফর কেবল রূপকথার মতো নয়, বরং তা ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। সত্যবতী কেবল রাজা শান্তনুর পত্নী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন কুরু বংশের এমন এক অভিভাবক যিনি বংশের ধারা টিকিয়ে রাখতে যেকোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করতেন না।

রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও শর্তযুক্ত দাম্পত্য

শান্তনুর সাথে সত্যবতীর বিবাহের মূল ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক দরকষাকষি। সত্যবতীর পিতা দাসরাজ এই শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই হস্তিনাপুরের পরবর্তী রাজা হবেন। এই শর্তটি পূরণ করতে গিয়ে দেবব্রতকে (ভীষ্ম) তার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করতে হয় এবং চিরকাল ব্রহ্মচর্যের শপথ নিতে হয়। সত্যবতীর এই জেদ প্রমাণ করে যে, তৎকালীন সমাজে একজন ক্ষত্রিয় নারী তার বংশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কতটা সচেতন এবং কৌশলী ছিলেন।

বংশ রক্ষা ও 'নিয়োগ' প্রথার বাস্তবায়ন

শান্তনুর মৃত্যুর পর যখন তার পুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তখন কুরুবংশ বিলুপ্তির পথে দাঁড়িয়েছিল। এই সংকটকালে সত্যবতী যে সাহস ও প্রশাসনিক দূরদর্শিতা দেখান তা অতুলনীয়। তিনি প্রথমে ভীষ্মকে অনুরোধ করেন বংশ রক্ষার্থে ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে। ভীষ্ম রাজি না হলে তিনি তার পূর্বাশ্রমের পুত্র বেদব্যাসকে আহ্বান করেন। এই 'নিয়োগ' প্রথার মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম নিশ্চিত করে তিনি কুরুবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। সত্যবতীর এই ভূমিকা তাকে কেবল একজন রানী হিসেবে নয়, বরং রাজবংশের নির্মাতা বা 'কিংমেকার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

কুন্তী: সহনশীলতা, কূটনীতি ও ক্ষাত্রধর্মের আধার

মহাভারতের কেন্দ্রস্থলে কুন্তী বা পৃথা এমন এক চরিত্র যিনি সারাজীবন কেবল লড়াই করেছেন—কখনো নিজের মাতৃত্বকে রক্ষা করতে, কখনো বা পুত্রদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। কুন্তী চরিত্রটি ক্ষত্রিয় নারীর আদর্শ রূপকে প্রকাশ করে, যেখানে ব্যক্তিগত শোকের চেয়ে রাজধর্ম এবং বংশের সম্মান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যখন মাদ্রীও সহমরণে যান, তখন কুন্তী পাঁচ পুত্রকে নিয়ে হস্তিনাপুরের শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশে ফিরে আসেন। তিনি জানতেন যে তার পুত্রদের একমাত্র শক্তি তাদের একতা। কুন্তী অত্যন্ত সচেতনভাবে নকুল ও সহদেবকে নিজের গর্ভজাত পুত্রদের মতোই লালন-পালন করেন যাতে পাণ্ডবদের মধ্যে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়। দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার যে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, অনেক বিশ্লেষকের মতে তা ছিল পাণ্ডবদের রাজনৈতিক ঐক্য সুসংহত রাখার এক সূক্ষ্ম কৌশল ।

কুন্তীর চরিত্রের সবচেয়ে তেজস্বী রূপটি দেখা যায় মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে। পাণ্ডবরা যখন বনবাস শেষ করে ফিরে এসেও রাজ্য পুনরুদ্ধারে দ্বিধান্বিত ছিলেন, বিশেষত যুধিষ্ঠির যখন শান্তির পথে চলতে চাচ্ছিলেন, তখন কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে তার পুত্রদের এক অত্যন্ত কঠোর বার্তা পাঠান। এই বার্তায় তিনি 'বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ' বর্ণনা করেন।

বিদুলা ছিলেন এক সাহসী ক্ষত্রিয় মাতা যিনি তার পরাজিত ও হতাশ পুত্র সঞ্জয়কে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন। বিদুলা বলেছিলেন, **"যে ক্ষত্রিয় পরাজয় মেনে নিয়ে অলস জীবন কাটায়, সে আসলে মৃত। তিন্দুক কাঠের**

মতো মুহূর্তের জন্য হলেও প্রজ্বলিত হও, তবুও সারাজীবন ধূমায়িত হয়ে মরে থেকো না"। কুন্তী এই কাহিনীর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে মনে করিয়ে দেন যে, ক্ষত্রিয় নারীর সন্তান প্রসব করার সার্থকতা কেবল তখনই হয় যখন সেই সন্তান বীর বিক্রমে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কুন্তীর এই 'ক্ষত্র-গীতা' পাণ্ডবদের যুদ্ধের পথে ধাবিত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল ।

দ্রৌপদী:

মহাভারতের দ্রৌপদী বা কৃষ্ণা কেবল মহাকাব্যের নায়িকা নন, বরং তিনি ছিলেন একজন বিদুষী নারী যিনি সমকালীন সমাজ, আইন এবং রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখতেন। যজ্ঞবেদী থেকে জন্ম নেওয়া এই নারী তার অসামান্য তেজ এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মহাকাব্যের প্রতিটি মোড়কে প্রভাবিত করেছেন ।

দ্যুতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের প্রচেষ্টা মহাভারতের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক অধ্যায় হলেও, এই দৃশ্যেই দ্রৌপদীর আইনি প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে। যখন তিনি ঋতুমতী এবং একবস্ত্রা অবস্থায় সভায় আনীত হন, তখন তিনি কান্নাকাটি না করে সরাসরি কুরুসভার বিজ্ঞজনদের কাছে একটি অকাট্য প্রশ্ন তোলেন: "যুধিষ্ঠির নিজে নিজেকে আগে হেরেছেন না আমাকে আগে হেরেছেন?"। এই প্রশ্নটি ছিল তৎকালীন মালিকানা আইনের এক গভীর বিশ্লেষণ। দ্রৌপদী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যদি যুধিষ্ঠির নিজেকেই আগে হেরে থাকেন তবে তিনি স্বাধীন মানুষ নন এবং একজন পরাধীন ব্যক্তির অন্য কাউকে বাজি রাখার কোনো আইনি অধিকার নেই। ভীষ্ম বা দ্রোণাচার্যের মতো পণ্ডিতরাও এই প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেননি, যা দ্রৌপদীর বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রমাণ করে।

দ্রৌপদীর চরিত্রের একটি দিক যা সাধারণত উপেক্ষিত থাকে, তা হলো তার বিশাল প্রশাসনিক দক্ষতা। মহাভারতের বনপর্বে 'দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ'-এ তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের রানী হিসেবে তার দৈনন্দিন কার্যাবলির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা কোনো দক্ষ রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে কম নয় ।

প্রশাসনিক ক্ষেত্র	দ্রৌপদীর দায়িত্ব ও ভূমিকা
পরিচারিকা ব্যবস্থাপনা	প্রাসাদের এক লক্ষ দাসীর প্রত্যেকের নাম, পরিচয় এবং কার্যাবলি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন।
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ	পাণ্ডবদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজভাণ্ডারের সঠিক আয় ও

প্রশাসনিক ক্ষেত্র	দ্রৌপদীর দায়িত্ব ও ভূমিকা
	ব্যয়ের হিসাব জানতেন।
পশু ও রসদ ব্যবস্থাপনা	হস্তিনী ও অশ্বদের রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মাবলি এবং পশুপালকদের সমস্যা তিনি নিজেই সমাধান করতেন ।
সামাজিক দায়িত্ব	অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণদের আহার এবং আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনার সম্পূর্ণ ভার ছিল তার ওপর।

দ্রৌপদীর এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজমহিষীরা কেবল অলঙ্কার পরিধান করে থাকতেন না, বরং তারা ছিলেন রাজত্বের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক মেরুদণ্ড। তিনি প্রতিদিন সকলের আগে ঘুম থেকে উঠতেন এবং সকলের শেষে ঘুমানো নিশ্চিত করতেন, যা তার একনিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচায়ক।

গান্ধারী:

গান্ধারী চরিত্রটি মহাভারতে এক অনন্য উচ্চতায় অবস্থান করে। গান্ধার দেশের রাজকন্যা হিসেবে তিনি যখন হস্তিনাপুরের অন্ধ রাজপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে বিবাহ করেন, তখন থেকেই তার ত্যাগের জীবন শুরু হয়। স্বামীর অন্ধত্বের কারণে তিনি নিজেও আজীবনের জন্য চোখে কাপড় বেঁধে রাখার যে সিদ্ধান্ত নেন, তা কেবল পতিভক্তি নয়, বরং তা ছিল একনিষ্ঠ কৃচ্ছ্রসাধন। শতপুত্রের জননী হওয়া সত্ত্বেও গান্ধারী কখনো অন্ধ পুত্রস্নেহে সত্যকে বিসর্জন দেননি। তিনি জানতেন দুর্যোধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অধর্মের পথে চলছে। কুরুসভার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে শান্তির উপদেশ দিয়েছেন। যুদ্ধের আগে যখন দুর্যোধন বিজয়ের আশীর্বাদ নিতে আসতেন, গান্ধারী বলতেন— **"যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"**। তিনি জানতেন যে অন্যায় পথে কোনো বিজয় স্থায়ী হতে পারে না। তার এই দৃঢ়তা তাকে মহাভারতের একজন মহান নৈতিক স্তম্ভে পরিণত করেছে।

যুদ্ধের শেষে যখন কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়, তখন গান্ধারীর বিলাপ কেবল একজন মায়ের শোক নয়, বরং তা ছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক চিরন্তন নারীর হাহাকার। স্ত্রী পর্বে তার আর্তনাদ যুদ্ধের বিভীষিকা তুলে ধরে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এই মহাধ্বংসের জন্য দায়ী করেন, কারণ কৃষ্ণ চাইলেই এই যুদ্ধ থামাতে পারতেন। তার দেওয়া অভিশাপেই যদুবংশের পতন ঘটে, যা প্রমাণ করে যে একজন সত্যনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় নারীর ক্রোধ ঈশ্বরের বিধানেও পরিবর্তন আনতে পারে।

অম্বা ও শিখণ্ডী:

কাশীরাজকন্যা অম্বার কাহিনী মহাভারতের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভীষ্ম কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পর তিনি যখন তার পূর্বপ্রেমিক শাল্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন এবং ভীষ্মও তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন, তখন অম্বা এক চরম সংকটে পড়েন। সমকালীন সমাজে একজন পরিত্যক্তা রাজকন্যার জন্য কোনো স্থান ছিল না। অম্বা কিন্তু ভেঙে পড়েননি। তিনি তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ভীষ্মের বিনাশকে স্থির করেন। তার এই জেদ তাকে কঠোর তপস্যার দিকে পরিচালিত করে এবং শিবের বরে তিনি পরবর্তী জন্মে শিখণ্ডী হিসেবে জন্ম নেন। শিখণ্ডী চরিত্রটি মহাভারতে লিঙ্গ পরিবর্তনের এক জটিল দিক উপস্থাপন করে, যেখানে অম্বার পূর্বজন্মের ঘৃণা ও ক্ষত্রিয় জেদ ভীষ্মের পতনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অম্বার এই দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম প্রমাণ করে যে, ক্ষত্রিয় নারী তার অধিকার ও সম্মানের জন্য সমাজ এবং প্রাকৃতিক নিয়মকেও চ্যালেঞ্জ করতে জানতেন।

সুভদ্রা:

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অর্জুনের পত্নী সুভদ্রা মহাভারতের এক অত্যন্ত লাবণ্যময়ী কিন্তু শক্তিশালী চরিত্র। তার বিবাহের কাহিনীটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর, যেখানে অর্জুন তাকে অপহরণ (রাক্ষস বিবাহ) করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ এতে সমর্থন দেন, কারণ তিনি জানতেন সুভদ্রার বীরত্ব ও তেজ অর্জুনের উপযুক্ত ।

সুভদ্রা পাণ্ডব পরিবারে এসে কেবল অর্জুনের পত্নী হিসেবেই নয়, বরং দ্রৌপদীর বোন এবং সহমর্মী হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান তার পুত্র অভিমন্যু এবং পৌত্র পরীক্ষিত। অভিমন্যুর বীরত্বগাথা সুভদ্রার শিক্ষারই ফসল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যখন পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানে যান, তখন সুভদ্রাই পরীক্ষিতের লালন-পালনের গুরুভার গ্রহণ করেন এবং কুরুবংশের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেন। তার শান্ত কিন্তু দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাকে পাণ্ডবদের এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

শকুন্তলা ও দময়ন্তী:

মহাভারতের আদি পর্বে শকুন্তলার চরিত্রটি আধুনিক পাঠকদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কালিদাসের লেখনীর বিপরীতে মহাভারতের শকুন্তলা ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং তেজস্বী। যখন রাজা দুষ্মন্ত তাকে সভায় চিনতে অস্বীকার করেন, তখন শকুন্তলা অত্যন্ত নির্ভীকভাবে রাজাকে তার অসততার জন্য তিরস্কার করেন। তিনি

রাজার সামনেই ঘোষণা করেন যে তার পুত্র ভরত একাই সারা পৃথিবী শাসন করবে এবং রাজার স্বীকৃতির জন্য তিনি লালায়িত নন। এই শকুন্তলা এক অদম্য ক্ষত্রিয় নারীর রূপ, যিনি নিজের এবং সন্তানের অধিকারের প্রশ্নে কারো কাছে মাথা নত করেন না।

অনুরূপভাবে **দময়ন্তী** চরিত্রটি মহাভারতে ধৈর্য ও উপস্থিত বুদ্ধির এক উজ্জ্বল উদাহরণ। নল রাজার পত্নী হিসেবে তিনি যে কঠিন সময় পার করেছেন এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় স্বয়ংবরের নাটক সাজিয়ে যেভাবে নলকে পুনরুদ্ধার করেছেন, তা তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাকেই প্রকাশ করে। এই চরিত্রগুলো প্রমাণ করে যে, ক্ষত্রিয় নারীরা কেবল পুরুষের সঙ্গী ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো দক্ষ কুশলী।

ক্ষত্রিয় নারীর প্রশাসনিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান

মহাভারতে ক্ষত্রিয় নারীদের শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তারা কেবল সংগীত বা ললিতকলায় পারদর্শী ছিলেন না, বরং তারা 'শ্রুতি' বা শ্রবণের মাধ্যমে রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্বের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন। দ্রৌপদী ও কুন্তী উভয়েই বিভিন্ন ঋষি ও পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে রাজধর্ম ও অর্থশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

রাজনৈতিক পরামর্শ: কুন্তী ও গান্ধারী উভয়েই রাজাদের (ধৃতরাষ্ট্র বা যুধিষ্ঠির) নীতিনির্ধারণে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন।

অর্থনীতি: দ্রৌপদীর রাজভাণ্ডার পরিচালনা ও এক লক্ষ দাসীর দায়িত্ব পালন তার বিশাল সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমাণ । **যুদ্ধনীতি:** বিদুলার মাধ্যমে ক্ষত্রিয় বীরত্ব ও যুদ্ধের যৌক্তিকতা উপস্থাপন নারীদের সামরিক দর্শনের গভীরতা নির্দেশ করে ।

মহাভারতের সমগ্র আখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় নারীরা ছিলেন এক একটি জীবন্ত অগ্নিশিখা। তারা সমাজ ও ধর্মের কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে থেকেও নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও অধিকারের প্রশ্নকে সর্বদা সমুন্নত রেখেছেন। সত্যবতীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন একটি রাজবংশের জন্ম দিয়েছে, তেমনি কুন্তীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা পাণ্ডবদের বিজয় নিশ্চিত করেছে। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জেদ যেমন মহাযুদ্ধের কারণ হয়েছে, তেমনি গান্ধারীর শোক ও অভিশাপ যুদ্ধের ভয়াবহতাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে।

মহাভারতে ক্ষত্রিয় নারীদের চিত্রায়ন কেবল ইতিবাচক নয়, বরং তা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। তারা প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে ক্ষত্রিয় ধর্ম কেবল পুরুষের পেশীশক্তিতে নয়, বরং নারীর মেধা, ধৈর্য এবং তেজস্বিতার মধ্যেও সমানভাবে প্রবহমান। তাদের এই বীরত্বগাথা আজও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অধিকার ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে এক শাশ্বত ধ্রুবতারা হিসেবে কাজ করে। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের কাছে আবেদন তারা যেন মহাভারতের ক্ষত্রিয় নারীদের মত মেধা, ধৈর্য এবং তেজস্বিতা নিজ জীবনে অনুসরণ করেণ এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।





শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ক্ষত্রিয় দর্শন

- শ্রীপতিতপাবন রায়

ভারতের জাতীয়গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেবল একটি আধ্যাত্মিক ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এটি মানব জীবনের গভীরতম মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সংকট নিরসনের এক অনন্য দলিল। এই মহৎ গ্রন্থে 'ক্ষত্রিয়' বর্ণের যে ধারণা চিত্রিত হয়েছে, তা কেবল জন্মগত পরিচয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষের প্রকৃতি, গুণাবলী এবং কর্মতৎপরতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এক বিশেষ জীবনদর্শন। গীতায় ক্ষত্রিয়দের অবস্থান

কেবল রণক্ষেত্রের যোদ্ধারূপে নয়, বরং তারা সমাজকে রক্ষা করার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত।

ক্ষত্রিয়ত্বের ভিত্তি: গুণ ও কর্মের সমন্বয়

গীতায় চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থার যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, তার মূল ভিত্তি হলো **'গুণ' এবং 'কর্ম'**। চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ নম্বর শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের ভেতরের তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) ভিন্নতা এবং সেই অনুযায়ী তাদের সম্পাদিত কর্মের মাধ্যমেই তিনি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। এই তত্ত্বটি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের 'যোগ্যতাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ' বা 'মেরিটোক্রেসি'-র প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

গীতায় বর্ণিত প্রকৃতি বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিটি মানুষের স্বভাব তিনটি গুণের জটিল সংমিশ্রণে গঠিত। ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে এই গুণের বিন্যাস অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। গীতায় প্রদত্ত ভাষ্য অনুযায়ী, ক্ষত্রিয়দের প্রকৃতিতে 'রজোগুণ'-এর প্রাধান্য থাকে, যার সাথে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় 'সত্ত্বগুণ' মিশ্রিত থাকে।

বর্ণ	প্রধান গুণবিন্যাস	মানসিক প্রবণতা ও কর্মের দিক
ব্রাহ্মণ	সত্ত্বগুণের প্রাবল্য	জ্ঞানার্জন, সংযম এবং আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা
ক্ষত্রিয়	রজোগুণের প্রধান্য + সত্ত্বগুণের মিশ্রণ	প্রশাসন, নেতৃত্ব, বীরত্ব ও জননিরাপত্তা
বৈশ্য	রজোগুণ + তমোগুণের মিশ্রণ	কৃষি, বাণিজ্য ও অর্থ উৎপাদন
শূদ্র	তমোগুণের আধিক্য	কায়িক শ্রম ও সমাজের সেবা

রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে গতিশীলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস এবং কর্মস্পৃহা প্রদান করে। অন্যদিকে, সত্ত্বগুণের উপস্থিতি নিশ্চিত করে যে, ক্ষত্রিয়ের এই অপরিসীম শক্তি যেন ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত না হয়ে সমাজ রক্ষায় এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত হয়। সত্ত্বগুণের প্রভাবে ক্ষত্রিয় শাসক কেবল ক্ষমতালিপ্সু হন না, বরং তিনি একজন করুণাময়

এবং ধর্মপরায়ণ অভিভাবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জন্ম বনাম কর্ম: ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত পরিচয়

গীতায় ক্ষত্রিয়ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বারবার 'স্বভাবজ' (svabhāva-jam) শব্দের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, ক্ষত্রিয়ত্ব কোনো বংশগত উত্তরাধিকার নয়, বরং এটি একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চেতনার বিকাশ এবং তার স্বাভাবিক কর্মদক্ষতার প্রতিফলন। গীতায় ক্ষত্রিয় বলতে এমন এক শ্রেণি বা মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যারা প্রাকৃতিকভাবেই অন্যের দুঃখ দূর করতে এবং সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে আগ্রহী। ক্ষত্রিয়ের বুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে **'ক্ষত' (আঘাত বা ক্ষতি) থেকে যিনি 'ত্রাণ' (রক্ষা) করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়।**

ক্ষত্রিয়ের সপ্তগুণ: প্রশাসনিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের রূপরেখা

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৩ নম্বর শ্লোকে গীতায় ক্ষত্রিয়ের সাতটি মূল গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের প্রশাসনিক এবং সামরিক দক্ষতার মূল চাবিকাঠি। এই গুণাবলীগুলো কেবল একজন যোদ্ধার নয়, বরং একজন সফল প্রশাসক এবং আধুনিক নেতৃত্বের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শ্লোকটি হলো:

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।। ৪৩।।

এই শ্লোক অনুযায়ী ক্ষত্রিয়দের সাতটি মূল গুণ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. শৌর্য (Shauryam - Valor)

শৌর্য বলতে কেবল শারীরিক শক্তি নয়, বরং এটি একটি অটল মানসিক সাহসিকতা। গীতায় শৌর্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক বীরত্ব যা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ভয় পায় না এবং দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য যেকোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে । আচার্য রামানুজের মতে, শৌর্য হলো কোনো দ্বিধা বা ভয় ছাড়াই যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা ।

২. তেজ (Tejah - Power/Brilliance)

তেজ হলো ব্যক্তিত্বের সেই ঔজ্জ্বল্য বা আত্মবিশ্বাস যা অন্যদের দ্বারা পরাভূত হয় না । শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য অনুযায়ী, তেজ হলো এমন এক মানসিক বল যা অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে এবং নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে । প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তেজ বলতে এমন এক দৃঢ় ব্যক্তিত্বকে বোঝায় যা অন্যায়কারীদের

মনে ভীতির সঞ্চার করে এবং প্রজাদের মনে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় ।

৩. ধৃতি (Dhritih - Fortitude/Determination)

ধৃতি হলো সেই ধৈর্য বা স্থিরতা যা চরম বাধা-বিপত্তির মধ্যেও একজন মানুষকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না । একজন ক্ষত্রিয়ের জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ প্রশাসন পরিচালনা বা যুদ্ধ করার সময় নানা শারীরিক ও মানসিক চাপ তৈরি হয়। ধৃতিমান ব্যক্তি সেই সমস্ত চাপ উপেক্ষা করে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারেন ।

৪. দাক্ষ্য (Dakshyam - Resourcefulness/Expertise)

দাক্ষ্য বলতে বোঝায় কর্মদক্ষতা এবং উপস্থিত বুদ্ধি। একজন ক্ষত্রিয়কে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয় । গীতায় দাক্ষ্যের অর্থ হলো কোনো কাজ নির্ভুলভাবে এবং দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার নিপুণতা । এটি একজন শাসকের কৌশলগত জ্ঞান এবং কার্যনির্বাহী ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

৫. যুদ্ধে অপলায়ন (Apalayanam - Not Fleeing in Battle)

এটি ক্ষত্রিয়ের জন্য সবচেয়ে কঠিন এবং সম্মানজনক ব্রত। গীতায় বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় যুদ্ধের ময়দান থেকে কখনো পালিয়ে যান না, এমনকি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি পিছু হটেন না । এই আদর্শটি কেবল সামরিক দৃঢ়তা নয়, বরং এটি একজন মানুষের নীতির প্রতি অটল থাকার প্রতীক। সত্য ও ন্যায়ের রক্ষার লড়াইতে যে কোনো আপস না করার মানসিকতাই হলো অপলায়ন ।

৬. দান (Danam - Generosity)

ক্ষত্রিয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গুণ হলো দানশীলতা। একজন শাসক হিসেবে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন, কিন্তু সেই সম্পদ নিজের ভোগবিলাসে ব্যয় না করে আর্তমানবতার সেবা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । দানাধ্যক্ষ হিসেবে ক্ষত্রিয় সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেন এবং নিজের সম্পদের প্রতি অনাসক্ত থাকেন ।

৭. ঈশ্বরভাব (Ishvara-bhava - Leadership/Lordliness)

ঈশ্বরভাব বলতে প্রভুত্বের অহংকার নয়, বরং এটি হলো শাসন করার যোগ্যতা এবং অন্যদের পরিচালনা করার এক ঐশ্বরিক দায়িত্ববোধ । এটি এমন এক প্রশাসনিক দক্ষতা যেখানে একজন শাসক নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি

হিসেবে মনে করেন এবং ঈশ্বরের মতোই প্রজাদের প্রতি মমতাপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ করেন । এটি আধিপত্য বিস্তারের পরিবর্তে সুরক্ষার এবং শৃঙ্খলার এক মহান আদর্শ ।

গুণাবলী	অর্থ	প্রশাসনিক তাৎপর্য
শৌর্য	বীরত্ব ও সাহস	প্রতিকূলতায় অটল থাকা
তেজ	ব্যক্তিত্বের প্রভাব	কর্তৃত্ব ও মর্যাদা বজায় রাখা
ধৃতি	ধৈর্য ও দৃঢ়তা	লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকা
দাক্ষ্য	দক্ষতা ও নিপুণতা	দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
অপলায়ন	পিছু না হঠা	দায়িত্ব পালনে অটল থাকা
দান	উদারতা	জনকল্যাণে সম্পদ ব্যয়
ঈশ্বরভাব	নেতৃত্ব বোধ	ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা

অর্জুনের বিষাদ ও ক্ষত্রিয় স্বধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সূচনা হয় অর্জুনের বিষাদ দিয়ে, যা মূলত একজন ক্ষত্রিয়ের তার কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এক চরম নৈতিক দ্বিধা। অর্জুন যখন আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের হত্যার ভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করতে চাইলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার **'স্বধর্ম' এবং ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকৃত** স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দেন ।

স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরধর্মের ভয়াবহতা

গীতায় বারবার বলা হয়েছে যে, অন্যের ধর্ম (পরধর্ম) সার্থকভাবে পালন করার চেয়ে নিজের স্বভাবজাত ধর্ম (স্বধর্ম) কিছুটা ত্রুটিপূর্ণভাবে পালন করাও মঙ্গলজনক। অর্জুনের স্বভাব ছিল ক্ষত্রিয়ের, তাই তার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ বা ভিক্ষা করা ছিল পরধর্ম, যা তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। গীতায় বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়ের জন্য ধর্মযুদ্ধের চেয়ে কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারে না।

সম্মানের গুরুত্ব ও অগৌরবের গ্লানি

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাত্ত্বিক যুক্তির পাশাপাশি সামাজিক যুক্তিতেও অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেন যে, **একজন**

সম্মানিত ক্ষত্রিয়ের জন্য অপযশ বা অগৌরব মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। বীরত্বের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত একজন ক্ষত্রিয় যদি ভয়ের কারণে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাকে কাপুরুষ হিসেবে গণ্য করবে, যা তার জন্য নরকতুল্য গ্লানি বয়ে আনবে।

ধর্মযুদ্ধ: হিংসা বনাম সামাজিক ন্যায়বিচার

গীতায় ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধের যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে, তা সাধারণ হানাহানি নয়, বরং তা হলো **'ধর্মযুদ্ধ'**। ক্ষত্রিয় যখন অস্ত্র ধারণ করেন, তখন তার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ঘৃণা বা রাজ্য জয়ের লালসা নয়, বরং তা সমাজ থেকে অধর্ম দূর করা এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

চিকিৎসকের অস্ত্রের মতো ন্যায়বিচার

ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধকে অনেক সময় চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের সাথে তুলনা করা হয়। চিকিৎসক যেমন রোগীর জীবন বাঁচাতে পচনশীল অংশ কেটে বাদ দেন, তেমনি একজন ক্ষত্রিয় সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ক্ষতিকর অপশক্তির বিনাশ ঘটান। **গীতায় বলা হয়েছে যে, আততায়ী বা সন্ত্রাসীদের দণ্ড দেওয়া ক্ষত্রিয়ের অপরিহার্য কর্তব্য এবং এতে কোনো পাপ স্পর্শ করে না।** এই দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষত্রিয় হলেন সামাজিক সুশৃঙ্খলার প্রধান গ্যারান্টর।

অনাসক্ত যোদ্ধা ও পাপমুক্তি

গীতায় বলা হয়েছে যে, যিনি জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন, তাকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন নিজেকে 'কর্তা' না ভেবে কেবল ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হিসেবে কাজ করেন। এই মানসিকতা একজন ক্ষত্রিয়কে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যেও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

লোকসংগ্রহ: সামাজিক নেতৃত্বের এক অনুপম আদর্শ

ক্ষত্রিয়দের কর্মের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো **'লোকসংগ্রহ'**। এর অর্থ হলো সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। তৃতীয় অধ্যায়ের ২০ নম্বর শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা জনকের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে একজন রাজা আত্মজ্ঞানী হয়েও কেবল লোকশিক্ষার জন্য নিজের রাজধর্ম পালন করেছিলেন।

নেতার আচরণ ও জনমানসে প্রভাব

গীতায় বলা হয়েছে যে, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা নেতা যে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষও তারই অনুসরণ করে। একজন ক্ষত্রিয় নেতা যদি তার কর্তব্য

ত্যাগ করেন বা অনৈতিক আচরণ করেন, তবে সমগ্র সমাজই পথভ্রষ্ট হবে। তাই ক্ষত্রিয়দের ওপর সমাজকে রক্ষা করার পাশাপাশি নৈতিক আদর্শ স্থাপনেরও এক গুরুভার অর্পিত হয়েছে।

সমষ্টিগত কল্যাণ ও ত্যাগ

লোকসংগ্রহের দর্শনে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সমষ্টিগত স্বার্থকে বড় করে দেখা হয়। একজন ক্ষত্রিয় প্রশাসক তার সমস্ত কর্ম সমর্পন করেন জনকল্যাণে। তিনি যখন দণ্ড প্রদান করেন বা কর সংগ্রহ করেন, তখন তার পেছনে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ থাকে না, থাকে কেবল সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্য।

কর্মযোগ ও ক্ষত্রিয়: কর্মের মাধ্যমে মুক্তি

গীতায় ক্ষত্রিয়দের জন্য মুক্তির যে পথটি সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত করা হয়েছে, তা হলো 'কর্মযোগ' । ক্ষত্রিয়দের জন্য কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কারণ তারা প্রকৃতির গুণের দ্বারা কর্ম করতে বাধ্য। তাই কর্মের ফল ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করাই তাদের শ্রেষ্ঠ সাধনা ।

নিষ্কামা কর্ম ও প্রশাসনিক একাগ্রতা

একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা যোদ্ধাকে তার কর্মে নিপুণ হতে হলে ফলের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে হয়। গীতায় শেখানো হয়েছে যে, কর্মে তোমার অধিকার আছে কিন্তু ফলে নেই (Karmanye vadhikaraste...) । এই মানসিকতা একজন ক্ষত্রিয়কে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তার মনোযোগ স্থির রাখতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন যোদ্ধার লক্ষ্য হলো নিখুঁতভাবে যুদ্ধ করা; তিনি যদি যুদ্ধের ফলের (জয় বা মৃত্যু) কথা ভেবে আতঙ্কিত হন, তবে তিনি তার প্রকৃত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন না।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য (Worship through Work)

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৬ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার নিজের স্বাভাবিক কর্মের মাধ্যমেই পরমেশ্বরের পূজা করে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র বা রাজসভা কেবল রাজনৈতিক স্থান নয়, এটিই তার উপাসনালয়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং নিপুণতার সাথে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করাই হলো তার শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আরাধনা।

সমাজদেহে ক্ষত্রিয়ের অবস্থান: বাহু রূপকের তাৎপর্য

গীতায় সমাজকে একটি অখণ্ড দেহের সাথে তুলনা করে ক্ষত্রিয়দের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। এই রূপক অনুযায়ী ক্ষত্রিয়রা হলেন সমাজের 'বাহু' বা হাত। বাহু যেমন সারা শরীরকে আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী

শক্তি প্রয়োগ করে, তেমনি ক্ষত্রিয়রা সমগ্র সমাজকে বহিঃশত্রু এবং অভ্যন্তরীণ অপশক্তির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করেন। বাহুহীন দেহ যেমন অসহায়, তেমনি ক্ষত্রিয় শক্তিহীন সমাজও সুরক্ষিত থাকতে পারে না। এই রূপকটি বর্ণগুলোর মধ্যে কোনো বৈষম্য নয়, বরং একটি 'কার্যকরী এবং আন্তঃনির্ভরশীল' (Functional and interdependent) সমাজ কাঠামোর নির্দেশক ।

প্রশাসনিক নৈতিকতা ও আধুনিক নেতৃত্বে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ

গীতায় বর্ণিত ক্ষত্রিয়ের গুণাবলী বর্তমান সময়ের প্রশাসনিক নৈতিকতা (Administrative Ethics) এবং নেতৃত্বের (Leadership) দর্শনের সাথে অবিশ্বাস্যভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রধান লক্ষ্যগুলো গীতায় ক্ষত্রিয়ের দায়িত্বের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিফলিত।

সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা

ক্ষত্রিয়ের 'ঈশ্বরভাব' এবং 'দান' বর্তমানে সুশাসন বা 'Good Governance' এর সমার্থক। একজন প্রশাসককে নির্লোভ হতে হয় এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হয়, যা গীতায় ক্ষত্রিয়ের 'দান' গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শাসকের নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারই হলো রাজধর্মের সারকথা ।

সাহস ও স্থিতপ্রজ্ঞতা

বর্তমান বিশ্বের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের অন্যতম গুণ হলো সাহসিকতা এবং ধীরস্থিরতা। ক্ষত্রিয়ের 'শৌর্য' এবং 'ধৃতি' আজকের সামরিক কমান্ডার বা রাজনৈতিক নেতাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কোনো প্রলোভন বা ভয়ের বশবর্তী না হয়ে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়াই হলো আধুনিক ক্ষত্রিয়ের পরিচয়।

কর্মদক্ষতা ও ফলাফলভিত্তিক প্রশাসন

ক্ষত্রিয়ের 'দাক্ষ্য' বা দক্ষতা আজকের 'Efficiency' এবং 'Performance based administration' এর প্রাচীন রূপ। গীতায় একজন ক্ষত্রিয়কে কেবল সাহসী হলেই চলে না, তাকে তার কাজে চরমভাবে দক্ষ এবং পারদর্শী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দক্ষতা ছাড়া কোনো প্রশাসকই তার জনপদকে সুখী রাখতে পারেন না।

ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক বিজয় ও জীবনদর্শন

গীতায় ক্ষত্রিয়ের জন্য যে জীবনদর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত উচ্চমার্গের। এটি কেবল পেশীশক্তি প্রদর্শনের পথ নয়, বরং এটি ইন্দ্রিয় জয় এবং নিজের অহংকারের বিরুদ্ধে এক নিরন্তর লড়াই। গীতায় একজন আদর্শ ক্ষত্রিয়কে **'স্থিতপ্রজ্ঞ'** হওয়ার আহ্বান জানানো

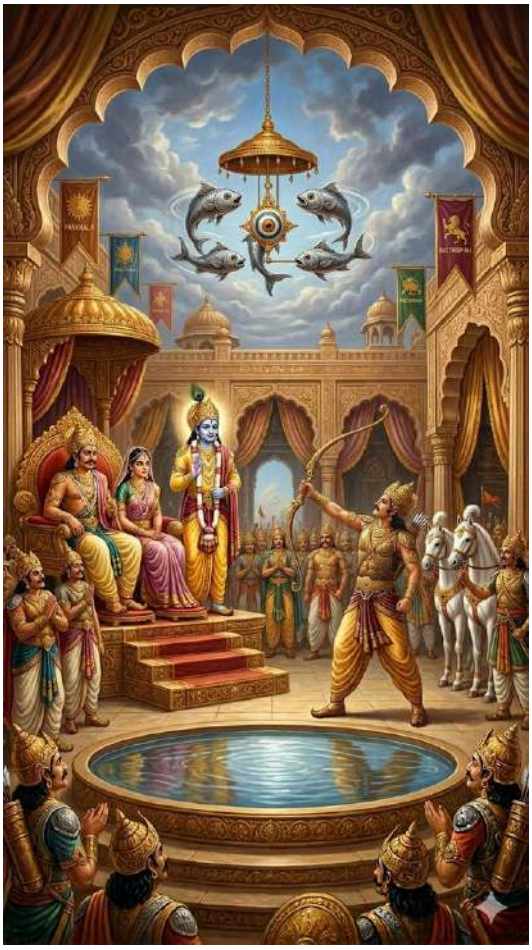
হয়েছে । যিনি সুখে অতি উৎসাহিত হন না এবং দুঃখে ভেঙে পড়েন না, যিনি ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, তিনিই প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং তিনিই সমাজে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম। এই মানসিক প্রশান্তি ক্ষত্রিয়কে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে এক অনন্য মর্যাদা দান করে।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ও স্বর্গের সোপান

গীতায় বলা হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিলে স্বর্গের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলে পৃথিবী ভোগ করা যায় । এই বক্তব্যটি মূলত একজন ক্ষত্রিয়কে তার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করে। জয় বা পরাজয়—উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়ের জয় নিশ্চিত, কারণ তিনি ধর্মের পক্ষে লড়াই করছেন । এই আধ্যাত্মিক নিশ্চয়তা ক্ষত্রিয়কে অপরাজেয় করে তোলে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চিত্রিত ক্ষত্রিয়ের চরিত্রটি বীরত্ব, নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের এক অনন্য আধার। ক্ষত্রিয়রা কেবল তলোয়ারধারী সৈনিক নন, তারা হলেন সামাজিক শৃঙ্খলার কারিগর এবং মানবতার রক্ষক। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষত্রিয় আদর্শ আধুনিক সমাজের প্রশাসনিক ও সামরিক নীতিমালার জন্য এক শাশ্বত পথপ্রদর্শক হতে পারে। বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রেক্ষাপটে এই দর্শন কেবল একটি ধর্মীয় তত্ত্ব নয়, বরং এটি তাদের সামাজিক উত্তরণ, শিক্ষালাভ এবং আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী দিকনির্দেশনা। গীতায় অর্জুনকে দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি উপদেশ আজও আমাদের শেখায় যে, ব্যক্তিগত আবেগ বা মোহের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও জাতির কল্যাণে 'স্বধর্ম' পালন করাই হলো শ্রেষ্ঠ মানবিক পরিচয়।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।





ক্ষত্রিয় পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

- শ্রীরামচন্দ্র করণ

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মানসপটে শ্রীরামচন্দ্র কেবল একটি পৌরাণিক আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র নন, বরং তিনি একটি সুসংহত নৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মূর্ত প্রতীক। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত তাঁর জীবনচরিত মূলত একজন রাজন্যের **'মর্যাদা পুরুষোত্তম'** হিসেবে উত্তরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা সহস্রাব্দ ধরে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি এবং নীতিনিষ্ঠার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। রামায়ণ কেবল একটি মহাকাব্য নয়, এটি একটি 'ইতিহাস' যা ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি ও তার গতিপ্রকৃতিকে নির্দেশ করে। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের জীবন মূলত ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং সামষ্টিক কর্তব্যের নিরন্তর সংঘর্ষ এবং সেই সংঘর্ষে কর্তব্যের চূড়ান্ত জয়ের এক প্রামাণিক দলিল।

'মর্যাদা পুরুষোত্তম' শব্দবন্ধটি শ্রীরামচন্দ্রের সমগ্র সত্তাকে ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে শক্তিশালী অভিধা। এটি দুটি ভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণার সমন্বয়। 'মর্যাদা' বলতে এখানে কেবল সামাজিক নিয়মনীতি বোঝানো হয়নি, বরং এটি এক প্রকার স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতা বা নৈতিক সীমারেখাকে নির্দেশ করে, যা একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত লালসা বা ক্ষোভের ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, **'পুরুষোত্তম' হলো পুরুষের সর্বোত্তম অবস্থা, যেখানে মানবিক গুণাবলি পূর্ণতা পায় এবং ঐশ্বরিক স্তরে উন্নীত হয়।** শ্রীরামচন্দ্র তাঁর জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে—পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী এবং রাজা হিসেবে—এই মর্যাদা রক্ষা করেছেন বলেই তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম হিসেবে স্বীকৃত।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মর্যাদা হলো মহাবিশ্বের এক প্রকার ভারসাম্য। যেমন

সমুদ্র তার সীমা অতিক্রম করে না, ঠিক তেমনি শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করেন না। এই আত্মনিয়ন্ত্রণই তাঁকে অন্যান্য অবতার বা বীরদের থেকে পৃথক করে। তাঁর এই 'মর্যাদা' কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অলঙ্কার ছিল না, বরং এটি ছিল একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার।

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের প্রারম্ভেই নারদ মুনি রামচন্দ্রের যে ষোড়শ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, তা মূলত একটি আদর্শ নেতৃত্বের 'চেকলিস্ট' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই গুণগুলো কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বরং এগুলো অত্যন্ত ব্যবহারিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

গুণের নাম (সংস্কৃত)	তাত্ত্বিক সংজ্ঞা	সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রভাব
গুণবান (Gunavan)	উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী	নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি
বীর্যবান (Viryavan)	অদম্য সাহস ও বীরত্বের প্রতীক	বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
ধর্মজ্ঞ (Dharmajnya)	ধর্মের সূক্ষ্ম গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল	ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
কৃতজ্ঞ (Kritajnya)	অন্যের সাহায্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল	মিত্রশক্তি ও জনসমর্থন সুসংহতকরণ
সত্যবাক্য (Satyavakya)	সত্যনিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা	রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসযোগ্যতা ও অখণ্ডতা রক্ষা
দৃঢ়ব্রত (Dridhavrata)	লক্ষ্যে অবিচল থাকার ক্ষমতা	সংকটকালীন স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
জিতক্রোধ (Jitakrodha)	ক্রোধের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ	হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা

গুণের নাম (সংস্কৃত)	তাত্ত্বিক সংজ্ঞা	সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রভাব
অনসূয়ক (Anasuyaka)	পরশ্রীকাতরতা মুক্ত মানসিকতা	অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহযোগিতামূলক সমাজ গঠন

এই ষোড়শ গুণের সমন্বয়ই শ্রীরামচন্দ্রকে একটি 'ইনস্টিটিউশন' বা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। আধুনিক তত্ত্বে একে **'ভ্যালু-ড্রিভেন লিডারশিপ' বা মূল্যবোধ-ভিত্তিক নেতৃত্ব বলা হয়,** যেখানে নেতার ব্যক্তিগত গুণাবলি সরাসরি সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রীয় সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

শ্রীরামচন্দ্রের **ক্ষত্রিয় সত্তা** কেবল শস্ত্র ব্যবহারের নিপুণতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্ষত্রিয় ধর্মের মূল নির্যাস হলো 'রক্ষণ'—ধর্মের রক্ষা, দুর্বলের রক্ষা এবং সত্যের রক্ষা। তাঁর সমগ্র জীবন এই তিন প্রকার রক্ষার এক সমন্বিত প্রয়াস। রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রের সাথে অরণ্যে যান, তখন তাঁর কিশোর বয়সেই তিনি ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন, যা হলো সমাজবিরোধীদের (অসুর) দমন করে ঋষিদের যজ্ঞানুষ্ঠান তথা জ্ঞানচর্চাকে নিরাপদ করা।

ক্ষত্রিয় হিসেবে রামচন্দ্রের রণকৌশল ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং নীতিনিষ্ঠ। ভারতীয় যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাসে **'ধর্মযুদ্ধ' এবং 'কূটযুদ্ধ'**—এই দুই প্রকার যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও রামচন্দ্র সর্বদাই ধর্মযুদ্ধকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর যুদ্ধনীতির কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো: **১. নিরস্ত্রের ওপর আঘাত না করা:** রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র বা পলায়নরত থাকলে তিনি কখনও শস্ত্র নিক্ষেপ করতেন না।

২. **মানবিক মর্যাদা:** রাবণকে বধ করার পর তিনি বিভীষণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যথাযথ মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে, কারণ তাঁর মতে শত্রুতা কেবল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া উচিত। ৩. **ন্যূনতম রক্তপাত:** তিনি সর্বদাই যুদ্ধের আগে কূটনৈতিক আলোচনার পথ খোলা রাখতেন। হনুমান ও অঙ্গদকে দূত হিসেবে প্রেরণ করা ছিল শান্তি রক্ষার এক শেষ চেষ্টা।

রামচন্দ্রের ধনুর্বিদ্যা ছিল মূলত একটি **'প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা'** (Deterrent Power)। তিনি তাঁর শস্ত্রশক্তিকে কখনও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেননি, বরং তা ছিল অধর্ম বিনাশের হাতিয়ার । আধুনিক সামরিক পরিভাষায় একে **'সার্জিক্যাল প্রিসিশন' এবং 'এথিক্যাল ওয়ারফেয়ার'-এর আদি রূপ** বলা যেতে পারে।

রাজধর্ম ও রামরাজ্য:

শ্রীরামচন্দ্রের সবচেয়ে স্থায়ী উত্তরাধিকার হলো **'রামরাজ্য'**। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বে এটি একটি আদর্শ কল্যাণকামী রাষ্ট্রের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রামরাজ্য কেবল একটি কাল্পনিক স্বর্গীয় অবস্থা নয়, বরং এটি ছিল আইনের শাসন (Rule of Law) এবং প্রজাহিতৈষণার এক বাস্তব প্রশাসনিক কাঠামো।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ.ভি. ডাইসি 'রুল অব ল'-এর যে তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন, তার প্রতিটিই রামরাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় :

আইনের সর্বোচ্চতা (Supremacy of Law): রামরাজ্যে রাজা স্বয়ং ধর্মের বা আইনের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। রাজা দশরথ যখন কৈকেয়ীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রিয় পুত্রকে বনবাসে পাঠান, তখন তিনি মূলত আইনের বা প্রতিশ্রুতির সর্বোচ্চতাকেই প্রমাণ করেছিলেন, যা রামচন্দ্র সানন্দে গ্রহণ করেন।

আইনের চোখে সমতা (Equality before the Law): একজন অতি সাধারণ ধোপার সন্দেহের ভিত্তিতে রানী সীতার চরিত্র নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, তখন রামচন্দ্র ব্যক্তিগত আবেগ ত্যাগ করে প্রজা-মতকে প্রাধান্য দেন। এটি প্রমাণ করে যে, রামরাজ্যে রাজার আপনজনও সাধারণ নাগরিকের মতোই আইনের স্ক্রুটিনির আওতায় ছিলেন।

আইনি স্পৃহার প্রাধান্য (Predominance of Legal Spirit): ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনুরাগের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত নীতি ও সামাজিক অখণ্ডতা রক্ষার তাগিদেই রামচন্দ্র প্রতিটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

রামরাজ্যের অনেক প্রশাসনিক আদর্শ আধুনিক ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি এবং মৌলিক কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রামরাজ্যের আদর্শ	ভারতীয় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা	প্রশাসনিক ফলাফল
সর্বজনীন কল্যাণ (Welfare for all)	ধারা ৩৮ (Directive Principles)	দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক ন্যায়বিচার
জবাবদিহিমূলক শাসন	ধারা ৭৪ (Council of Ministers)	স্বচ্ছতা ও জনমতের প্রতিফলন
নারী ও	ধারা ১৫	জেন্ডার

রামরাজ্যের আদর্শ	ভারতীয় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা	প্রশাসনিক ফলাফল
শিশুর মর্যাদা রক্ষা	(অষম্য দূরীকরণ)	সমতা ও সুরক্ষা
পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	ধারা ৪৮এ ও ৫১এ(জি)	টেকসই উন্নয়ন ও প্রকৃতি রক্ষা

রামরাজ্যে চুরির ভয় ছিল না, দারিদ্র্য ছিল না এবং মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করত—এই বর্ণনাগুলো মূলত একটি সফল অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের নির্দেশক। মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্বরাজ্যের পরিকল্পনায় রামরাজ্যকে একারণেই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যে, এটি কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, এটি মানুষের নৈতিক পরিবর্তনের একটি আন্দোলন।

আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে **'ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ'** (Transformational Leadership) তত্ত্বের আলোচনায় শ্রীরামের নেতৃত্ব এক অনন্য দৃষ্টান্ত। গবেষকরা মনে করেন, আধুনিক লিডারশিপ মডেলগুলো তৈরি হওয়ার হাজার বছর আগেই রামচন্দ্র তা প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন -

১. আদর্শগত প্রভাব (Idealized Influence): রামচন্দ্র নিজে যা বলতেন, তা তিনি নিজের জীবনে পালন করতেন। 'পিতৃভক্তি' বা 'সত্যরক্ষা'র কথা তিনি কেবল প্রচার করেননি, বরং নিজের রাজ্য ত্যাগ করে তা প্রমাণ করেছেন। এই চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁকে তাঁর অনুসারীদের চোখে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

২. অনুপ্রেরণামূলক প্রেষণা (Inspirational Motivation): শ্রীরামচন্দ্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল একদল সাধারণ বনবাসীকে (বানর সেনা) একটি অপরাজেয় সামরিক শক্তিতে রূপান্তর করা। তিনি তাঁদের সামনে একটি মহৎ লক্ষ্য (সীতা উদ্ধার তথা অধর্ম বিনাশ) স্থির করে দিয়েছিলেন, যা তাঁদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করেছিল।

৩. বৌদ্ধিক উদ্দীপনা (Intellectual Stimulation): সমুদ্রের ওপর পাথর দিয়ে সেতু নির্মাণ ছিল তৎকালীন সময়ে এক অভাবনীয় প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ। রামচন্দ্র তাঁর দলের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাঁদের

বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন যে, অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

৪. ব্যক্তিগত বিবেচনা (Individualized Consideration): রামচন্দ্র তাঁর দলের প্রতিটি সদস্যকে—তা সে বিভীষণ হোক বা কাঠবিড়ালি—ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করতেন। সুগ্রীবের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে তাঁকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা বা হনুমানের মেধার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা তাঁর এই গুণটিরই বহিঃপ্রকাশ।

বালী বধ ও শম্বুক প্রসঙ্গ

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যা গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তবে অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সিদ্ধান্তগুলোও এক গভীর ক্ষত্রিয় নীতিবোধ ও রাজধর্মের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছিল।

আড়ালে থেকে বালীকে হত্যা করার জন্য রামচন্দ্র সমালোচিত হলেও, তিনি বালীর প্রশ্নের উত্তরে যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামের মতে, বালী তাঁর ছোট ভাই সুগ্রীবের স্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ করে ধর্মের অবমাননা করেছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজার কাজ হলো যেখানেই ধর্মের অবমাননা হবে সেখানেই দণ্ডবিধান করা। বালী যেহেতু পশুর মতো আচরণ করেছিলেন, তাই রামচন্দ্র তাঁকে পশুর মতোই শিকার করার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এটি ছিল এক প্রকার 'ডিভাইন জাস্টিস' বা ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার, যেখানে অপরাধের ধরণ অনুযায়ী দণ্ড নির্ধারিত হয়েছে।

শম্বুক বধ ও সামাজিক শৃঙ্খলা

উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত শম্বুক বধের ঘটনাটিকে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক স্থায়িত্ব ও বর্ণাশ্রম রক্ষার একটি প্রয়াস হিসেবে দেখেন। তৎকালীন বিশ্বাস অনুযায়ী, অসময়ে তপস্যা করার ফলে সমাজের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছিল, যার ফলে এক ব্রাহ্মণের সন্তানের অকাল মৃত্যু ঘটে। রাজা হিসেবে রামচন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব ছিল সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। যদিও আধুনিক মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে এটি বিতর্কিত, কিন্তু 'রাজধর্ম' এবং 'বর্ণধর্ম' রক্ষার তাত্ত্বিক কাঠামোয় এটি ছিল রাজার কর্তব্যবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন। তৎকালীন সময়ে শ্রীরামচন্দ্র এই কাজের জন্য প্রশংসিত হন।

বাংলা সাহিত্যে ও দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে শুরু করে আধুনিক বাঙালি মনীষীদের লেখায় রামচন্দ্র এক ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' ও আদর্শ মানুষ - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রকে একজন ঐতিহাসিক

বীর ও সুশাসক হিসেবে দেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ধর্মের সারকথা হলো মানুষের সকল মানসিক ও শারীরিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ এবং সামঞ্জস্য বিধান। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এই বৃত্তিনিচয়ের সমন্বয় ছিল বলেই তিনি 'পুরুষোত্তম'।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী দর্শনে রামের ক্ষত্রিয় শৌর্য ছিল এক বড় অনুপ্রেরণা। তিনি মনে করতেন, পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য রামের মতো অপরাজেয় বীরত্ব এবং ত্যাগের প্রয়োজন। তাঁর **'আনন্দমঠ'** উপন্যাসের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ছিল মূলত রামায়ণের সেই ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য, যারা ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করতে দ্বিধা করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে রামচন্দ্র কেবল একজন অবতার নন, বরং তিনি একজন 'পারফেক্ট হিউম্যান' যিনি যুক্তি এবং শৌর্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবিক রামায়ণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণকে ভারতের আত্মিক ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, রামায়ণ কোনো রাজবংশের জয়গান নয়, বরং এটি ঘরোয়া সম্পর্ক—পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এক মহত্তম আখ্যান। রবীন্দ্রনাথের কাছে রামচন্দ্র হলেন সেই আদর্শ মানুষ যিনি ত্যাগের মাধ্যমে মহত্ত্ব অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রামের চরিত্রের কোমলতাকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিয়েছেন। অরণ্যে থাকাকালীন রামের প্রকৃতিপ্রীতি এবং পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর মমত্ববোধ রবীন্দ্রনাথের পরিবেশবাদী ও মানবিক চিন্তার সাথে মিলে যায়।

রামধর্ম ডকট্রিন ও আধুনিক রাষ্ট্রনীতি

আধুনিক ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং রণনৈতিক সংস্কৃতিতে (Strategic Culture) শ্রীরামচন্দ্রের মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায়। গবেষকরা একে 'রামধর্ম ডকট্রিন' (Ramadharma Doctrine) বলে অভিহিত করেন ।

১. **অ-আগ্রাসন ও অ-সংলগ্নতা:** ভারত কখনই অন্য কোনো দেশকে আগে আক্রমণ করে না। এটি রামচন্দ্রের সেই নীতির সাথে তুলনীয় যেখানে তিনি কখনই লঙ্কা দখলের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেননি, বরং সীতা উদ্ধার ও অধর্ম বিনাশই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

২. **মানবিক সহায়তা:** প্রতিবেশী দেশের বিপদে ভারত সর্বদাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, যেমন রামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণের বিপদে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩. **নৈতিক নেতৃত্ব:** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে,

যা রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ও মর্যাদা রক্ষার আধুনিক সংস্করণ।

শ্রীরামচন্দ্রের ১৬টি গুণ আধুনিক সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য একটি এথিক্যাল গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে । বিশেষ করে 'অনসূয়া' (পরনিন্দা বা হীনম্মন্যতা ত্যাগ) এবং 'বিদ্বান' (প্রকৃত জ্ঞান অর্জন) গুণ দুটি বর্তমানের জটিল প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর।

শ্রীরামচন্দ্র কেবল একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভক্তিমার্গীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। রামানন্দ থেকে শুরু করে তুলসীদাস—সবাই রামকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। ভক্তি আন্দোলনের ফলে রামের উপাসনা কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছেও পৌঁছে গেছে। শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল গ্রহণ বা গুহক চণ্ডালের সাথে বন্ধুত্ব রামচন্দ্রের যে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) চরিত্রের পরিচয় দেয়, তা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। ক্ষত্রিয় হিসেবে তিনি যে বর্ণাশ্রমের রক্ষক ছিলেন, আবার মানুষ হিসেবে তিনি যে সেই ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে আলিঙ্গন করেছিলেন—এই স্ববিরোধিতাই রামচন্দ্রের চরিত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কঠোর অনুশাসন এবং অগাধ করুণা একই সাথে এক ব্যক্তিতে অবস্থান করতে পারে।

শাশ্বত শ্রীরামচন্দ্র - ক্ষত্রিয় পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র কোনো বিশেষ যুগ বা ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নন। তিনি একটি শাশ্বত আদর্শের নাম। তাঁর ক্ষত্রিয় বীরত্ব আমাদের সাহস যোগায়, তাঁর মর্যাদা আমাদের শৃঙ্খলা শেখায় এবং তাঁর রামরাজ্য আমাদের একটি সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখায়। অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিটি সিদ্ধান্ত—তা যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন—সর্বদাই এক বৃহত্তর সামাজিক ও নৈতিক অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল। মর্যাদা পুরুষোত্তম হিসেবে তিনি আমাদের এই শিক্ষাই দেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ব্যক্তিগত হোক বা রাষ্ট্রীয়—ধর্ম বা ন্যায়নিষ্ঠাই হওয়া উচিত আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

আধুনিক বিশ্বে যখন আমরা নেতৃত্বের সংকট, নৈতিক অবক্ষয় এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি, তখন শ্রীরামচন্দ্রের জীবনদর্শন এবং তাঁর 'রামরাজ্য' হতে পারে এক আলোকবর্তিকা। ক্ষত্রিয় পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র তাই কেবল ইতিহাসের পাতায় নয়, বরং মানবতার প্রতিটি ন্যায়নিষ্ঠ পদক্ষেপে জীবিত থাকবেন।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পিতামহ ভীষ্মের ক্ষত্রিয় ধর্ম

- শ্রীদেবব্রত মৃধা

মহাভারতের মহাকাব্যিক ক্যানভাসে যে কতিপয় ব্যক্তিত্ব নৈতিকতা, সামরিক শৌর্য এবং ত্যাগের এক অনন্য সংমিশ্রণ হিসেবে অমর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে গঙ্গা-পুত্র দেবব্রত, যিনি উত্তরকালে **'ভীষ্ম'** নামে পরিচিত হন, তিনি সর্বাগ্রে গণনীয়। ক্ষত্রিয় ধর্ম কেবল যুদ্ধবিদ্যা বা রাজ্য শাসনের কৌশল নয়; এটি একটি সুসংহত জীবনদর্শন যা ত্যাগ, আনুগত্য এবং ধর্মের রক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ভীষ্মের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি কেবল একজন অপরাজেয় সেনাপতি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় ধর্মের এমন এক আদর্শ যা শৌর্য এবং প্রজ্ঞার এক দুর্লভ সমন্বয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিছক শারীরিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর অটল প্রতিজ্ঞা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং রাজধর্মের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে এক অপরাজেয় নৈতিক উচ্চতায় আসীন করেছে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়দের প্রধান কর্তব্য হলো প্রজা পালন, আর্তের রক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ভীষ্ম তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এই প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন এক মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, যা তাঁকে কেবল তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেই নয়, বরং উত্তরকালের জন্য এক ধ্রুবতারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ।

হিন্দু শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে ক্ষত্রিয় ধর্মের সংজ্ঞা অত্যন্ত গভীর এবং বহুমুখী। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ক্ষত্রিয়দের বিরাটের বাহু থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মূলত শক্তির আধার এবং সুরক্ষার প্রতীক। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম হিসেবে শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব বা প্রভুত্ব করার ক্ষমতাকে চিহ্নিত করেছেন। ভীষ্মের চরিত্রে এই প্রতিটি গুণের পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত থেকেই তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের বীজ উপ্ত ছিল। তিনি ছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনু ও মর্ত্যে অবতীর্ণা গঙ্গার অষ্টম সন্তান। তাত্ত্বিকভাবে, তিনি ছিলেন অষ্টবসুর অন্যতম 'দ্যু' বা 'প্রভাস'-এর অবতার, যাঁকে বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপে মর্ত্যে আসতে হয়েছিল। এই ঐশ্বরিক প্রেক্ষাপট তাঁকে এক অনন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করেছিল, যা সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব।

ভীষ্মের শিক্ষা ও দীক্ষা ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে। তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল দেবলোক ও মর্ত্যের মেলবন্ধনে, যেখানে তিনি বিভিন্ন বিদ্যার উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। **দেবগুরু বৃহস্পতি** তাঁকে

দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিখিয়েছিলেন, **অসুরগুরু শুক্রাচার্য** তাঁকে রাজনীতির গূঢ় পাঠ দান করেন এবং **বশিষ্ঠ ও চ্যবন** তাঁকে বেদ ও বেদাঙ্গের গূঢ় রহস্য বুঝিয়েছিলেন। এমনকি **সনৎকুমার** তাঁকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এই ব্যাপক ও বহুমুখী শিক্ষা ভীষ্মকে কেবল একজন যোদ্ধার পরিবর্তে একজন 'রাজর্ষি' হিসেবে গড়ে তুলেছিল। তাঁর সামরিক শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছিল ভগবান পরশুরামের চরণে, যিনি ছিলেন স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার এবং ক্ষত্রিয় দমনে অদ্বিতীয়। এই প্রথাগত শাস্ত্রীয় শিক্ষা এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয় ভীষ্মকে ক্ষত্রিয় হিসেবে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যায় যেখানে শৌর্য এবং প্রজ্ঞা একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা: ক্ষত্রিয় ত্যাগের এক চরম পরাকাষ্ঠা

ক্ষত্রিয় হিসেবে ভীষ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সবচেয়ে শক্তিশালী অধ্যায় হলো তাঁর **'ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা'**। দেবব্রত থেকে ভীষ্ম হওয়ার এই রূপান্তর কেবল একটি নাম পরিবর্তন নয়, বরং এটি ছিল এক উচ্চতর তাত্ত্বিক আদর্শের বিজয়। নিজের পিতার সুখের পথ প্রশস্ত করতে তিনি স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন এবং আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করেন। সাধারণত ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হলো বংশ রক্ষা এবং রাজ্য শাসন করা। কিন্তু ভীষ্ম দেখিয়েছেন যে, ত্যাগের মাধ্যমেও ধর্মের সুরক্ষা সম্ভব। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে বিবাদমুক্ত করার জন্য একটি সুদূরপ্রসারী কৌশলগত সিদ্ধান্তও ছিল, যা রাজ্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

এই আত্মত্যাগ তাঁকে ‘ভীষ্ম’ বা ‘ভয়ঙ্কর’ উপাধিতে ভূষিত করে, যা তাঁর চারিত্রিক কাঠিন্য ও সংকল্পের দৃঢ়তাকে প্রকাশ করে। এই ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজা শান্তনু তাঁকে ‘স্বেচ্ছামৃত্যু’র বর প্রদান করেন। একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে মৃত্যুর ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা কেবল অলৌকিক ক্ষমতা নয়, বরং এটি তাঁর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের এক মহত্তম স্বীকৃতি। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষত্রিয় কেবল ভোগের জন্য নয়, বরং বৃহত্তর কর্তব্যের জন্য নিজের জীবনের সবচেয়ে মৌলিক অধিকারগুলোও বিসর্জন দিতে পারেন। তাঁর এই ত্যাগ তাঁকে কেবল কুরুবংশের নয়, বরং সমগ্র ভারতবর্ষের এক নৈতিক স্তম্ভে পরিণত করেছিল। তাঁর জীবনদর্শন থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় শৌর্য কেবল শত্রুকে পরাজিত করার মধ্যে নয়, বরং নিজের আকাঙ্ক্ষাকে জয় করার মধ্যেও নিহিত।

নিচে একটি সারণীর মাধ্যমে ক্ষত্রিয় ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ভীষ্মের

চরিত্রে সেগুলোর প্রতিফলন তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

ক্ষত্রিয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য	ভীষ্মের চরিত্রে প্রতিফলন ও ব্যাখ্যা
শৌর্য ও তেজ (Valor & Brilliance)	পরশুরামের সাথে ২৩ দিনের অমীমাংসিত যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ১০ দিনের অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্ব।
ধৃতি (Fortitude)	আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন এবং শরশয্যায় ৫৮ দিন মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও অবিচল থেকে ধর্মোপদেশ দান।
প্রজা পালন (Protection)	চার প্রজন্ম ধরে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের অভিভাবকত্ব এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা।
দান ও ত্যাগ (Charity & Sacrifice)	পিতার সুখের জন্য সিংহাসন, দাম্পত্য জীবন এবং ব্যক্তিগত বংশধারার সম্পূর্ণ বিসর্জন।
ক্ষত্রিয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য	ভীষ্মের চরিত্রে প্রতিফলন ও ব্যাখ্যা
শাস্ত্রজ্ঞান (Wisdom)	শান্তি ও অনুশাসন পর্বে যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, রাজধর্ম এবং মোক্ষধর্মের গভীর তাত্ত্বিক পাঠ দান।

সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহারথী ভীষ্মের রণকৌশল

ভীষ্মের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাঁর দৈহিক শক্তিতে নয়, বরং তাঁর অস্ত্রজ্ঞানের অসীম গভীরতা এবং রণকৌশলের সূক্ষ্মতায় নিহিত ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে যোদ্ধাদের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, সেখানে ভীষ্মকে 'দ্বিগুণ মহারথী' (Double Maharathi) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, তিনি একযোগে বহুসংখ্যক সাধারণ রথী ও অতিরথী যোদ্ধাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখতেন। তাঁর বীরত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো তাঁর গুরু পরশুরামের সাথে যুদ্ধ। অম্বা'র বিবাহ কেন্দ্রিক জটিলতায় পরশুরাম যখন ভীষ্মকে যুদ্ধের আহ্বান জানান, তখন ভীষ্ম এক চরম ধর্মসংকটের মুখে পড়েন। গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হলেও, ক্ষত্রিয় হিসেবে অন্যায় আহ্বানের প্রতিবাদ করা

এবং নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁর প্রধান ধর্ম ছিল ।

কুরুক্ষেত্রের **সমন্তপঞ্চক তীর্থে** এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছিল তেইশ দিন ধরে। পরশুরাম, যিনি একাকী একুশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন, তিনি ভীষ্মের অস্ত্রনৈপুণ্যের কাছে থমকে যেতে বাধ্য হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ভীষ্ম **'প্রস্বাপ'** নামক এক দিব্যাস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন, যা প্রতিপক্ষকে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন করে। দেবতারা এবং তাঁর পিতৃপুরুষেরা এসে ভীষ্মকে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ করেন, কারণ গুরুর অবমাননা করা ধর্মের পরিপন্থী। ভীষ্ম গুরুর সম্মান রক্ষার্থে সেই অস্ত্র সংবরণ করেন, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল অনুযায়ী পরশুরাম নিজেই স্বীকার করেন যে ভীষ্ম অপরাজেয়। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে ভীষ্মের শৌর্য কেবল ধ্বংসাত্মক ছিল না, তা ছিল নৈতিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা সুসংহত। তিনি একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় হিসেবে নিজের মর্যাদা রক্ষা করেছেন, আবার একই সাথে শীর্ষ শিষ্য হিসেবে শিষ্টাচারও বিসর্জন দেননি।

রাজধর্মের প্রবক্তাঃ - কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে যখন পাণ্ডবরা জয়ী হলেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির আত্মীয়-স্বজন নিধনের শোকে মুহ্যমান হয়ে রাজপদ ত্যাগের সংকল্প করেন। সেই সংকটময় মুহূর্তে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা মহাভারতের 'শান্তি পর্ব' ও 'অনুশাসন পর্ব' হিসেবে ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ভীষ্মের এই উপদেশগুলোই রাজধর্ম বা শাসনের প্রকৃত দর্শন। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, একজন রাজার কাছে ব্যক্তিগত শোকের চেয়ে প্রজা পালন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ভীষ্মের মতে, **"রাজা কালস্য কারণম্"** অর্থাৎ রাজাই সময়ের নির্ধারক। তিনি যদি ধর্মানুসারে শাসন করেন, তবে পৃথিবীতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তিনি যদি অধর্মী হন তবে সমাজের পতন ঘটে। তাঁর উপদেশের মূল ভিত্তি ছিল যে, শাসনকর্তাকে প্রথমে নিজের ইন্দ্রিয় জয় করতে হবে। তিনি দণ্ডনীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া কেবল শাসনের অঙ্গ নয়, এটি সমাজের ভারসাম্য রক্ষার এক পবিত্র কর্তব্য। ভীষ্মের এই রাজনৈতিক দর্শন কেবল প্রাচীন ভারতের জন্য নয়, বরং বর্তমান সময়ের আধুনিক সুশাসনের ক্ষেত্রেও একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে ।

রাজধর্মঃ ভীষ্মের দৃষ্টিভঙ্গি - শান্তি পর্বের আলোচনার ভিত্তিতে রাজধর্মের প্রধান দিকগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

ধর্মের সার্বভৌমত্ব: রাজাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা রাজনৈতিক সুবিধার চেয়ে ধর্মকে উর্ধ্বে রাখতে হবে। রাজা হলেন পৃথিবীতে ধর্মের মূর্ত প্রকাশ।

জনকল্যাণ (লোকসংগ্রহ): শাসনের সার্থকতা প্রজাদের সুখের ওপর নির্ভরশীল। রাজাকে প্রজাদের নিজের সন্তানের মতো স্নেহে এবং সতর্কতায় পালন করতে হবে।

আত্মসংযম ও চরিত্র: রাজা যদি নিজের কাম, ক্রোধ ও লোভ জয় করতে না পারেন, তবে তিনি বহিরাগত শত্রুকে জয় করতে সক্ষম হবেন না।

ন্যায্য দণ্ডনীতি: অপরাধীকে ন্যায়ের ভিত্তিতে দণ্ড প্রদান করা রাজার পবিত্র দায়িত্ব। দণ্ডনীতি সমাজকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করে এবং শৃঙ্খলার ভিত মজবুত করে।

ষড়গুণ ও কূটনীতি: সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈদীভব এবং সংশ্রয় - এই ছয়টি কূটনীতি ব্যবহারের মাধ্যমে রাজাকে রাজ্যের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ।

ভীষ্মের জীবনের সবচেয়ে জটিল অথচ বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে তাঁর অবস্থান। তিনি জানতেন যে দুর্যোধন অধর্মের পথে চলছেন এবং পাণ্ডবরাই সত্যের পক্ষে। তবুও তিনি কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করার কঠিন সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তিনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। ভীষ্মের এই সিদ্ধান্তকে আধুনিক বিশ্লেষকরা অনেক সময় তাঁর 'জড়তা' হিসেবে দেখেন, কিন্তু প্রাচীন ক্ষত্রিয় ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল তাঁর 'ভৃত্যধর্ম' বা আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, **"মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়; কৌরবরা আমাকে অর্থ দিয়ে বেঁধেছে"।** এর মাধ্যমে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অসহায়ত্বের কথা স্বীকার করলেও ক্ষত্রিয় হিসেবে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা থেকে বিচ্যুত হননি। তবে কৌরব পক্ষে থেকেও তিনি পাণ্ডবদের হিতৈষী ছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বিজয়ের আশীর্বাদ করেছিলেন এবং যুদ্ধের দশম দিনে নিজের পতন ও মৃত্যুর উপায়ও নিজে বলে দিয়েছিলেন। এটি ভীষ্মের চরিত্রের এক অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব—তিনি একদিকে তাঁর পেশাগত বা ক্ষত্রিয় দায়িত্ব পালন করছিলেন, অন্যদিকে সত্য ও ন্যায়ের বিজয়ের জন্য নিজের জীবন বলি দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর এই আচরণ প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল একজন যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ যিনি নিয়তি ও ধর্মের সূক্ষ্ম জটগুলো বুঝতে পারতেন। তাঁর এই দ্বিমুখী ভূমিকা মূলত ধর্মের বৃহত্তর

স্বার্থে নিজেকে বিসর্জন দেওয়ারই এক নামান্তর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিনে অর্জুনের অগণিত তীরের আঘাতে ভীষ্ম রথ থেকে পতিত হন। কিন্তু তাঁর বিশাল ও পবিত্র দেহ ভূমি স্পর্শ করেনি; তিনি শায়িত ছিলেন তীরের ওপর, যা ভারতীয় ঐতিহ্যে **'শরশয্যা'** নামে খ্যাত। একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু পরম গৌরবের, কিন্তু ভীষ্মের মৃত্যু ছিল সাধারণ মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি মহিমান্বিত। তিনি উত্তরায়ণের পুণ্য লগ্নের অপেক্ষায় শরশয্যায় ৫৮ দিন মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পাণ্ডবদের ও সমগ্র মানবজাতিকে রাজধর্ম ও মোক্ষধর্মের আলো দান করেছেন।

তাঁর শরশয্যায় শুয়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অর্জুনের মাটির নিচ থেকে গঙ্গা ধারা বের করে আনা কিংবা তাঁর শিরোধানের জন্য তীরের বালিশ তৈরি করে দেওয়া—এই প্রতিটি ঘটনা ভীষ্মের প্রতি পাণ্ডবদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ভীষ্মের রাজকীয় গাম্ভীর্যের পরিচয় বহন করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় কেবল যুদ্ধেই শ্রেষ্ঠ নন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি অবিচল এবং জ্ঞানবিতরণে অকৃপণ থাকতে পারেন। তাঁর মৃত্যু ছিল তাঁর নিজের ইচ্ছাধীন, যা প্রমাণ করে যে তিনি প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ভীষ্মের এই প্রস্থান ভারতীয় দর্শনে আত্মজয়ী বীরের এক চরম উদাহরণ।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ভীষ্ম: - বর্তমান যুগে ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রনীতির গবেষণায় ভীষ্মের জীবনকে একটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে 'প্রাতিষ্ঠানিক সততা' (Institutional Integrity) এবং 'ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জন'—এই দুটি ক্ষেত্রে ভীষ্মের অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক কর্পোরেট বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তিগত লাভই মূল চালিকাশক্তি, সেখানে ভীষ্মের ত্যাগের আদর্শ একটি ভিন্ন পথের সন্ধান দেয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন নেতা কেবল তাঁর ক্ষমতার জন্য নয়, বরং তাঁর চরিত্র এবং অটল বিশ্বস্ততার জন্য শ্রদ্ধেয় হন। তাঁর 'ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা'কে আধুনিক বিশ্লেষণে 'কৌশলগত দূরদর্শিতা' (Strategic Foresight) হিসেবে দেখা হয়, যার মাধ্যমে তিনি কুরুবংশের সিংহাসন সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর আনুগত্য তাঁকে অনেক সময় অন্যায়ের নীরব সাক্ষী করে রেখেছিল, তবুও তাঁর সেই নীরবতার পেছনে ছিল এক বৃহত্তর শৃঙ্খলার প্রতি অদম্য শ্রদ্ধা। আজকের পৃথিবীতে যেখানে আনুগত্য অত্যন্ত ভঙ্গুর,

সেখানে ভীষ্মের 'সেবা পরমো ধর্ম' (Service is the Highest Duty) দর্শনটি সামরিক এবং প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তাঁর জীবন থেকে আধুনিক নেতৃবৃন্দ শিখতে পারেন কীভাবে ব্যক্তিগত আবেগ এবং কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

ভীষ্মের ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাঁর বাহুবলে বা অজেয় রণকৌশলে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর মাহাত্ম্য নিহিত ছিল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, অটল প্রতিজ্ঞা এবং ধর্মের সূক্ষ্ম বিচারবোধের মধ্যে। তিনি ছিলেন একাধারে মহাবীর, মহাজ্ঞানী এবং পরম ত্যাগী। গঙ্গার পবিত্রতা আর পরশুরামের তেজ তাঁর সত্তায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। জীবনের প্রতিটি মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি ব্যক্তিগত সুখের পরিবর্তে বৃহত্তর কল্যাণ ও কুরুবংশের মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও তাঁর জীবনে অনেক বিয়োগান্তক অধ্যায় ছিল এবং তাঁকে অনেক ধর্মসংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর ক্ষত্রিয় আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। তাঁর শরশয্যায় শায়িত মূর্তিখানি কেবল এক পরাজিত যোদ্ধার চিত্র নয়, বরং তা হলো ইন্দ্রিয় বিজয়ী এক মহাপুরুষের প্রতিচ্ছবি। মহাভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটে ভীষ্ম তাই কেবল একটি চরিত্র নন, তিনি হলেন বীরত্ব ও ত্যাগের এক শাশ্বত মানদণ্ড, যা আগামী শত শত বছর ধরে মানবসমাজকে কর্তব্যনিষ্ঠা ও নৈতিকতার পাঠ দান করে যাবে। ক্ষত্রিয় ভীষ্মের এই শ্রেষ্ঠত্ব তাই কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নয়, তা হলো মানুষের আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের এক কালজয়ী আখ্যান, যা যুগ যুগ ধরে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে প্রেরণা জোগাবে।

পরিশেষে, পিতামহ ভীষ্মের জীবন পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এক অনন্য ক্ষত্রিয় সত্তার পরিচয় পাই, যেখানে শক্তি ও ভক্তির এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে, ক্ষত্রিয় ধর্ম কেবল অস্ত্রের আস্ফালন নয়, বরং এটি হলো বৃহত্তর ন্যায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার এক ব্রত। তাঁর ত্যাগ হস্তিনাপুরকে স্থায়িত্ব দিয়েছিল এবং তাঁর প্রজ্ঞা পাণ্ডবদের ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল। কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে তাঁর পতন মূলত এক পুরাতন যুগের অবসান এবং এক নতুন ধর্মভিত্তিক যুগের সূচনা নির্দেশ করে। ভীষ্ম ছিলেন সেই যুগের সন্ধিক্ষণের প্রধান কারিগর, যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে উত্তরকালের জন্য রাজধর্মের এক অমূল্য দলিল রেখে গেছেন। তাঁর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠত্ব তাই সন্দেহাতীত এবং সর্বকালের জন্য এক ইতিবাচক ও আদর্শগত উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পিতামহ ভীষ্মের আদর্শে নিজের জীবন গড়ে তুলুক এবং সমাজকে আদর্শের পথে পরিচালিত করুক এই কামনা করি।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয় কেন ?

- শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল

বাংলার ইতিহাসের এক সুবিশাল কালখণ্ড জুড়ে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র জাতির অস্তিত্ব দেদীপ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় উত্থান-পতন এবং আধুনিক যুগের সামাজিক আন্দোলন—প্রতিটি স্তরেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি স্বতন্ত্র ও প্রভাবশালী পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা কেন ক্ষত্রিয়,** এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের কেবল বর্তমানের সামাজিক কাঠামোর দিকে তাকালে চলবে না, বরং প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এই প্রবন্ধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদি ক্ষত্রিয়ত্বের সপক্ষে অত্যন্ত সমৃদ্ধ তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এই জাতির হারানো গৌরব ও বর্তমান আত্মমর্যাদা আন্দোলনের যৌক্তিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

পৌণ্ড্র জাতির প্রাচীনত্ব

ক্ষত্রিয়ত্ব কেবল একটি বংশগত পরিচয় নয়, এটি একটি জীবনদর্শন ও কর্মপদ্ধতির নাম। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় 'ত্রাণ' বা রক্ষার দায়িত্ব যারা নিতেন, তারাই ক্ষত্রিয় হিসেবে গণ্য হতেন। পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে এই গুণটি তাদের ইতিহাসের আদি লগ্ন থেকেই বিদ্যমান। ভারতের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, হরিবংশ পুরাণ, মৎস্য পুরাণ এবং মনু সংহিতার মতো আকর গ্রন্থগুলোতে পৌণ্ড্রদের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করা হয়েছে।

পুণ্ড্রদেশের ইতিহাসই মূলত পূর্ব ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মতে, সিন্ধু সভ্যতার পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ব ভারতে 'পুণ্ড্রদেশ' এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এক অত্যন্ত উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। এই সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, যা পরবর্তীকালে পৌণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত হয়। পুণ্ড্রনগরের (বর্তমান মহাস্থানগড়) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং শিলালিপিগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, এই অঞ্চলের শাসকরা কেবল সামরিক শক্তিতেই বলীয়ান ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিবান এবং প্রজাহিতৈষী।

পুণ্ড্রদের আদি পরিচয় বুঝতে গেলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করতে হয়। সেখানে পৌণ্ড্রদের বিশ্বামিত্রের বংশধর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং একজন রাজা এবং ঋষি ছিলেন, যার জীবন রাজকীয় বিক্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে পৌণ্ড্ররা আদি লগ্ন

থেকেই আর্য-ক্ষত্রিয় ঐতিহ্যের অংশীদার।

পৌরাণিক ভিত্তি—মহারাজ বলীর বংশলতিকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্বের সবচেয়ে বলিষ্ঠ শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় পুরাণের বংশতালিকায়। হরিবংশ পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, মহারাজ বলীর পাঁচ পুত্রের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে পাঁচটি প্রধান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আখ্যানটি পৌণ্ড্রদের রাজকীয় আভিজাত্যের মূল উৎস।

হরিবংশ পুরাণের ৩১তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, অন্ধ মুনি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বলীর পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্র হলেন—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। এই পাঁচ ভাই যে পাঁচটি জনপদ শাসন করতেন, তাদের নামেই সেই অঞ্চলগুলোর নামকরণ হয়েছিল। রাজা পুণ্ড্র যে অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন, তা-ই পরবর্তীকালে পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্ধন হিসেবে খ্যাতি লাভ করে ।

পুরাণের এই বিবরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রমাণ করে যে, পৌণ্ড্ররা কোনো উপজাতীয় বা মিশ্র গোষ্ঠী নয়, বরং তারা সরাসরি এক রাজকীয় ক্ষত্রিয় বংশের শাখা। বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণেও এই পুণ্ড্রজনদের স্পষ্টভাবে ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। কোনো কোনো শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় তাদের 'ক্ষত্রিয় পুত্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা তাদের জন্মগত আভিজাত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

মহাভারত ও পৌণ্ড্র বাসুদেবের আখ্যান

মহাভারতের যুগে পৌণ্ড্ররা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি ছিল। মহাভারতের সভা পর্বে ১৩ অধ্যায়ে পৌণ্ড্র রাজা বাসুদেব সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। এই বাসুদেব কেবল একজন সাধারণ রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর শক্তি ও প্রভাব এতটাই ছিল যে, তিনি নিজেকে প্রকৃত 'বাসুদেব' হিসেবে দাবি করতেন এবং দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন।

পৌণ্ড্র রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের অন্য একটি বড় প্রমাণ হলো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। মহাভারতের যুদ্ধকালীন বর্ণনায় দেখা যায় যে, পৌণ্ড্র রাজারা কৌরব পক্ষের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী, কেবলমাত্র সমমর্যাদার ক্ষত্রিয়রাই রাজকীয় যুদ্ধে সেনাপতিত্ব বা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারতেন। পৌণ্ড্রদের এই অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, তৎকালীন আর্য রাজন্যবর্গের কাছে তাঁরা

সমমর্যাদার ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।

ভীমের দিগ্বিজয় অংশে উল্লেখ আছে যে, তিনি কৌশিকী নদীর তীরবর্তী অধিপতিদের পরাস্ত করে পুণ্ড্রাধিপতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক আখ্যানগুলো পৌণ্ড্রদের সামরিক বীরত্ব এবং সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্য দেয়। রাজা বাসুদেবের ভাই কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করে 'মহামুনি কপিল' নামে পরিচিত হন এবং তিনি সাগর দ্বীপে বসে 'সাংখ্য দর্শন' রচনা করেছিলেন। একটিই বংশের এক ভাই রাজা (ক্ষত্রিয়) এবং অন্য ভাই মুনি (ব্রহ্মর্ষি)—এই উদাহরণ প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমের সেই যুগের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন কর্মের ভিত্তিতে বর্ণ নির্ধারিত হলেও রক্তের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ থাকতো।

মনু সংহিতা ও 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' তত্ত্ব

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক বিবর্তন ও মর্যাদাহানির কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে মনু সংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৩ ও ৪৪ নম্বর শ্লোক দুটির বিশ্লেষণ অপরিহার্য। মনু এই শ্লোকে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী কালক্রমে তাদের সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

শ্লোক ১০.৪৪-এ বলা হয়েছে:

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিডাঃ
কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ
কিরাতাদরদাঃ
খশাঃ।।"

অর্থাৎ, পৌণ্ড্র, ওড্র (ওড়িশার অধিবাসী), দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ—এই জাতিসমূহ আদিতে ক্ষত্রিয় ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সাহচর্য ত্যাগ করার ফলে এবং পবিত্র বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও উপনয়ন সংস্কার বর্জন করার কারণে তারা ধীরে ধীরে 'বৃষল' বা নিম্ন শ্রেণিতে পতিত হয়েছে। এই 'ব্রাত্য' বা 'বৃষল' শব্দটি পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক একটি প্রমাণ। কারণ, 'পতিত' হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই আগে একটি উচ্চ অবস্থানে থাকতে হয়। মনু যখন পৌণ্ড্রদের 'পতিত ক্ষত্রিয়' বলছেন, তখন তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তাদের মূল রক্তধারাটি ক্ষত্রিয়। আধুনিক সমাজ সংস্কারকগণ, যেমন বেণীমাধব হালদার এবং শ্রীমন্ত নস্কর, এই যুক্তিটিকেই তাদের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা তাদের আদি ক্ষত্রিয় মর্যাদা ফিরে পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে, কারণ তাদের পদাবনতি হয়েছিল কেবলমাত্র কিছু শাস্ত্রীয় আচার পালন না করার

কারণে, কোনো হীন বংশোৎপত্তির কারণে নয়।

ভৌগোলিক মহিমা ও পৌণ্ড্রবর্ধন নগরী

পৌণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার এক ঐশ্বর্যশালী জনপদ। এর রাজধানী পুণ্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থানগড়) ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায় ও ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে, যেখানে 'পুডনগল' (পুণ্ড্রনগর) কথাটি আছে। পৌণ্ড্রবর্ধন কেবল একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল না, এটি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর ধর্ম প্রচারের জন্য এই পুণ্ড্র দেশে এসেছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় পৌণ্ড্রবর্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'অশোকাবদান' অনুযায়ী, অশোক এখানে বেশ কিছু স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন পৌণ্ড্রবর্ধন ভ্রমণ করেন, তখন তিনি সেখানে ২০টি বৌদ্ধ মঠ এবং ১০০টি হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন। এই বিশাল সংখ্যক মঠ ও মন্দিরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্ররা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং স্থাপত্যকলায় নিপুণ ছিল।

ঐতিহাসিক উৎস	পৌণ্ড্রবর্ধন সম্পর্কে বর্ণনা
মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি	খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকের এই লিপি দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার রাজকীয় আদেশ বহন করে।
ঐতরেয় আরণ্যক	পৌণ্ড্রদের আর্য বহির্ভূত এক শক্তিশালী জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ কাহিনী	সমৃদ্ধ জনপদ, যেখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সহাবস্থান ছিল।
রামচরিত (সন্ধ্যাকর নন্দী)	পৌণ্ড্রবর্ধনকে 'বরেন্দ্র' অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ভূষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ পৌণ্ড্রদের এক শক্তিশালী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দান করে, যা কোনো সাধারণ শ্রমজীবী গোষ্ঠীর পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব ছিল। কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠিত শাসক জাতিই এই ধরনের নগর সভ্যতা ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও সামাজিক মর্যাদা হ্রাস - পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে 'সৎশূদ্র' হিসেবে

পরিচিতি লাভের পেছনে একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, পৌণ্ড্ররা একসময় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মৌর্য ও পাল বংশের শাসনামলে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলার প্রধান ধর্মে পরিণত হয় এবং পৌণ্ড্ররা এই অহিংস ও সাম্যবাদী ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল বৌদ্ধ ধর্ম পালনের ফলে তারা হিন্দু ধর্মের চতুর্বর্ণ প্রথা এবং কঠোর ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা উপনয়ন (পৈতা ধারণ) এবং অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞ ত্যাগ করে। তবে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কৃষিকাজ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা তাদের আভিজাত্যের চিহ্ন বহন করে চলছিল। হার্বার্ট রিজলি (H.H. Risley) তাঁর 'People of India' গ্রন্থে লক্ষ্য করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা আচরণ ও অভ্যাসে উচ্চবর্ণের মানুষের মতোই ছিল।

ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্ব এবং পৌণ্ড্র সমাজের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ আমলের শুরুর দিকে পৌণ্ড্রদের সামাজিক অবস্থান পুনরায় বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। ১৮৯১ সালের আদমশুমারিতে হার্বার্ট রিজলি পৌণ্ড্রদের 'হিন্দুস্থানি কাস্ট' বা নিচু শ্রেণি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন। তিনি মূলত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পৌণ্ড্রদের 'চণ্ডাল' বা এই জাতীয় নিম্নবর্ণের শাখা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ভুলটি পৌণ্ড্র সমাজের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও আত্মসচেতনতা তৈরি করে। তারা বুঝতে পারেন যে, তাদের আদি ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের ওপর একটি হীন পরিচয় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন' বা 'আত্মমর্যাদা আন্দোলন' দানা বেঁধে ওঠে। রিজলির গবেষণার সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, তিনি জনগোষ্ঠীর রক্তধারা বা শাস্ত্রীয় ভিত্তি অপেক্ষা তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কারকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু পৌণ্ড্র সমাজের নেতারা শাস্ত্রীয় প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে তারা মূলত সেই 'পৌণ্ড্রক' গোষ্ঠী যারা মনু সংহিতায় 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' হিসেবে স্বীকৃত ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নবজাগরণ ও সংস্কারকগণের ভূমিকা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি কেবল রাজপথের আন্দোলন ছিল না, এটি ছিল একটি বৌদ্ধিক যুদ্ধ। বেশ কিছু দূরদর্শী নেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, যারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজের অন্ধকার দূর করতে সচেষ্ট হন।

১. শ্রীমন্ত নস্কর (১৮৬৩-১৯০৭) ও 'জাতি চন্দ্রিকা'

১৮৮৭ সালে শ্রীমন্ত নস্কর 'জাতি চন্দ্রিকা' নামক একটি আকর গ্রন্থ রচনা করেন । এটি ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শ্রেণির পক্ষ থেকে প্রথম কোনো নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি মহাভারত, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে পৌণ্ড্ররা মূলত রাজকীয় ক্ষত্রিয় বংশের উত্তরসূরি। তাঁর এই গ্রন্থটি সমাজের মানুষের মধ্যে জাতীয় জাগরণ তৈরি করে এবং তাদের 'পোদ' পরিচয়ের গ্লানি মুছে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' পরিচয় গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

২. বেণীমাধব হালদার (১৮৫৮-১৯২৩) ও 'জাতি বিবেক'

১৮৯১ সালে বেণীমাধব হালদার 'জাতি বিবেক' নামক একটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করেন যে পৌণ্ড্রদের ওপর অর্পিত শূদ্রত্ব কেবল একটি ভুল ধারণার ফসল। তিনি 'ব্রাত্যতা' বা সংস্কারহীনতার তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখান যে পৌণ্ড্ররা জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আভিচারিক বিচ্যুতি ঘটেছে। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯০১ সালে প্রথম নিখিল বঙ্গ পৌণ্ড্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৩. মহাত্মা রাইচরণ সর্দার (১৮৭৫-১৯৪২) ও 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি'

মহাত্মা রাইচরণ সর্দার ছিলেন পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক এবং একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। তিনি ১৯০৯ সালে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৯১৭ সালে 'সর্ব বঙ্গ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি' নামে রূপান্তরিত হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবল পরিচয় বদল করলে হবে না, সমাজের মানুষদের আচরণে ও অভ্যাসে ক্ষত্রিয়ত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে। ১৯২৮ সালের জুন মাসে তিনি ও তাঁর ৫৫ জন অনুসারী প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত (পৈতা) ধারণ করেন এবং আদি ক্ষত্রিয় রীতিনীতি গ্রহণ করেন।

৪. মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬-১৯২৮) ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

মহেন্দ্রনাথ করণ ১৯১৯ সালে 'A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods' নামক একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি তিনি ব্রিটিশ সরকারের সেনসাস কমিশনারের কাছে জমা দেন যাতে দাপ্তরিকভাবে 'পোদ' শব্দটি সরিয়ে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' শব্দটির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। তাঁর গবেষণায় তিনি প্রমাণ করেন যে পৌণ্ড্ররা মূলত কৃষক হলেও তারা ছিল

যোদ্ধা-কৃষক (Warrior-Peasants), যা ক্ষত্রিয়ের একটি স্বীকৃত উপবিভাগ।

সংস্কৃতায়ন ও সামাজিক বিবর্তনের রূপরেখা

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'সংস্কৃতায়ন' (Sanskritization) বা 'ক্ষত্রিয়করণ' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এটি কেবল একটি নাম পরিবর্তন ছিল না, এটি ছিল একটি আমূল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার।

সামাজিক সংস্কার	পূর্বতন অবস্থা (সেন শাসন পরবর্তী)	সংস্কার পরবর্তী অবস্থা (ক্ষত্রিয়করণ)
অশৌচ পালন	৩০ দিনের অশৌচ (শূদ্রোচিত)	১২ দিনের অশৌচ (ক্ষত্রিয়োচিত)
উপনয়ন সংস্কার	বর্জিত ছিল	যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ
সামাজিক পদবী	লস্কর, নস্কর, সর্দার, মণ্ডল	ক্ষত্রিয়সূচক পদবী ও 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' পরিচয়
শিক্ষা	অবহেলিত ছিল	'আর্য পৌণ্ড্রক ব্রহ্মচর্য আশ্রম' ও বিদ্যালয় স্থাপন

এই সংস্কারগুলো প্রমাণ করে যে পৌণ্ড্ররা কেবল অতীতের গৌরবে বাস করেননি, বরং তারা নিজেদের সংশোধন ও উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক যুগেও ক্ষত্রিয় সুলভ আভিজাত্য ফিরিয়ে এনেছেন। মহাত্মা রাইচরণ সর্দার ১৯১৯ সালে কলকাতায় একটি ছাত্রাবাস বা হোস্টেল নির্মাণ করেছিলেন যাতে গ্রামীণ পৌণ্ড্র ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। এটিই পরবর্তীকালে সমাজের মেরুদণ্ড তৈরিতে সাহায্য করেছিল।

ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন

বাংলার স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকরা পৌণ্ড্রদের প্রাচীনত্ব ও বীরত্বকে বারবার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ড.

আর. সি. মজুমদার (R.C. Majumdar) তাঁর 'History of Ancient Bengal' গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্ধন ও তার প্রাচীন অধিবাসীদের নিয়ে যে আলোকপাত করেছেন, তাতে স্পষ্ট হয় যে এই জনপদটি ছিল বাংলার আর্যিকরণের প্রধান প্রবেশদ্বার। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস: আদি পর্ব' গ্রন্থে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে পৌণ্ড্রদের সামাজিক বিবর্তন আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বাংলার আদি ভূমিজ সন্তানরাই ছিল পৌণ্ড্র, যারা অত্যন্ত সাহসী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। নৃতাত্ত্বিক বিচারে অনেক গবেষক তাদের 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' (Proto-Australoid) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ভারতের যোদ্ধা ও শাসক শ্রেণির অংশ ছিল। এটা প্রমাণ করে আর্যরা ভারতীয় এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আর্য।

নৃতাত্ত্বিক বি.এস. গুহ এবং হার্বার্ট রিজলি যদিও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিচার করেছেন, কিন্তু সকলেই একমত যে পৌণ্ড্রদের শারীরিক গঠন এবং লড়াকু মানসিকতা তাদের উচ্চতর বংশীয় পরিচয়ের ইঙ্গিত দেয়। বিশেষ করে সুন্দরবন ও দক্ষিণবঙ্গের প্রতিকূল পরিবেশে তাদের টিকে থাকা এবং বন পরিষ্কার করে কৃষিজমি ও জনপদ গড়ে তোলা তাদের অসীম সাহস ও নেতৃত্বের গুণের প্রমাণ দেয়, যা ক্ষত্রিয়ের প্রধান লক্ষণ।

আধুনিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের চেতনা ও সংগঠন

বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ভারতের একটি অত্যন্ত সচেতন ও প্রভাবশালী সমাজ। তারা আর কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ নেই, বরং তারা আধুনিক ভারতের শিক্ষা, রাজনীতি এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ'-এর মতো সংগঠনগুলো আজ সমাজের মানুষের মধ্যে ইতিহাসবোধ ও একাত্মতাবোধ জাগ্রত করছে। তাদের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যসমূহ এখন নিম্নরূপ:

সমাজের মানুষের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি ও তাদের একই ছাতার নিচে আনা। ইতিহাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো । "Payback to your Society" বা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনের ধারণা প্রচার করা ।

অনুকুল চন্দ্র দাস নস্কর (১৮৯৪-১৯৪৭)-এর মতো নেতারা সংসদীয় রাজনীতিতে পৌণ্ড্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পশ্চাদপদ শ্রেণির উন্নয়নে কাজ করেছিলেন। হেমচন্দ্র নস্কর

ও মণীন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো নেতৃবৃন্দও এই প্রক্রিয়ায় শামিল ছিলেন। আজ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি তালিকার অন্যতম প্রধান ও অগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হয়, যারা তাদের প্রাচীন ক্ষত্রিয় আভিজাত্য ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়েছে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কেন ক্ষত্রিয়, এই প্রশ্নের উত্তর কেবল কোনো একপাক্ষিক দাবিতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিক্রমার ফল। মহাভারতের যুদ্ধে পৌণ্ড্র বাসুদেবের রাজকীয় দর্প, পুরাণোক্ত রাজা বলীর বংশীয় গৌরব এবং মনু সংহিতার সেই অমোঘ সত্য—যে পৌণ্ড্ররা আদি ক্ষত্রিয়—এই সবই তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

বাংলার ইতিহাসে পৌণ্ড্ররা কেবল একটি জাতি নয়, তারা একটি সভ্যতার নির্মাতা। বৌদ্ধ ধর্মের কারণে তারা সাময়িক মর্যাদা হারিয়েছিল এবং সেন রাজাদের বর্ণবাদী রাজনীতির শিকার হয়েছিল, কিন্তু তাদের ধমনীতে প্রবাহিত ক্ষত্রিয় রক্ত কখনো মলিন হয়নি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ তাদের সেই হারানো গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রীমন্ত নস্কর, বেণীমাধব হালদার এবং রাইচরণ সর্দারের মতো মনীষীরা তাদের হাতে যে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করেই আজ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আধুনিক সমাজে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি আসলে কোনো বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার লোভ নয়, বরং এটি সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এটি প্রমাণ করে যে, সামাজিক পদমর্যাদা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু **একটি জাতির ঐতিহাসিক সত্য ও তার লড়াকু ঐতিহ্য অবিনশ্বর।** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আজ বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যারা তাদের প্রাচীন রাজকীয় অতীত ও বর্তমানের কর্মোদ্যম দিয়ে আগামী দিনের শক্তিশালী ভারতবর্ষ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের এই ইতিহাস প্রতিটি পৌণ্ড্রসন্তানের জন্য গর্বের এবং প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য শিক্ষণীয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয়, কর্মত ক্ষত্রিয় এবং তাদের অদম্য প্রাণশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তারা চিরকাল ক্ষত্রিয় হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

ভারত নির্মাণে ক্ষত্রিয়দের অবদান

- শ্রীপুষ্পরাক্ষ সিংহ

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ক্ষত্রিয় বর্ণ কেবল একটি সামরিক শ্রেণী হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সংহতি, প্রশাসনিক উৎকর্ষ, দার্শনিক সমৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রধান স্থপতি হিসেবে কাজ করেছে। 'ক্ষত্রিয়' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি সংস্কৃত 'ক্ষত্র' শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ শাসন, কর্তৃত্ব বা আধিপত্য। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে, ক্ষত্রিয়দের প্রধান দায়িত্ব ছিল 'প্রজাপালন' বা সমাজের রক্ষা এবং 'ধর্ম' রক্ষা করা। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক ভারতের অভ্যুদয় পর্যন্ত, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র নির্মাণে ক্ষত্রিয় রাজবংশ এবং যোদ্ধাদের অবদান অনস্বীকার্য।

ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি ও কার্যাবলীর দার্শনিক ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্যে। ঋগ্বেদের 'পুরুষ সূক্ত' অনুযায়ী, ক্ষত্রিয়দের জন্ম হয়েছিল আদি পুরুষের বাহু থেকে, যা শক্তি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মতৎপরতার প্রতীক। এই রূপকটি কেবল শারীরিক শক্তির পরিচয় দেয় না, বরং এটি সমাজরূপী দেহের ভারসাম্য রক্ষার কেন্দ্রীয় দায়িত্বকে নির্দেশ করে।

রাজধর্ম ও নৈতিক শাসন

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়দের জন্য 'রাজধর্ম' বা শাসনের নৈতিক বিধিলিপি নির্ধারিত হয়েছে। রাজধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল প্রজাদের ইহলৌকিক মঙ্গল এবং পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্ধারিত গুণাবলীর মধ্যে শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা এবং রণক্ষেত্রে অপরাজিত থাকা অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য করা হতো। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে 'স্বধর্ম' পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা মূলত ব্যক্তিগত মোহের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকারই এক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

ক্ষত্রিয়দের বীরত্বগাথা কেবল সমরকৌশলে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রধান নিয়ামক। ক্ষত্রিয়দের এই বীরত্বের আদর্শ বা 'chivalry code' ভারতীয় জাতীয় চরিত্র গঠনে সুগভীর প্রভাব ফেলেছে, যা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল ।

রাজনৈতিক ঐক্য ও অখণ্ড ভারত বিনির্মাণে সাম্রাজ্যিক ভূমিকা

ভারতবর্ষের খণ্ডবিখণ্ড ক্ষুদ্র জনপদগুলোকে একত্রিত করে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলো অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। গ্রিক আক্রমণকারী থেকে শুরু করে মধ্য এশীয় হানাদারদের বিরুদ্ধে ভারতের সার্বভৌমত্ব

রক্ষা করার ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজাদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন নন্দ বংশের শাসনের অবসান ঘটান, তখন সেটি কেবল একটি রাজবংশের পরিবর্তন ছিল না, বরং সেটি ছিল ভারতের প্রথম মহান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং তাঁর উপদেষ্টা কৌটিল্য মিলে যে প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন, তা উত্তর ও মধ্য ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের সামরিক শক্তি এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ভারতকে আলেকজান্ডারের উত্তরসূরি সেলিউকাস নিকেটরের থেকে ভারতীয় ভূমি রক্ষা করে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে শক্তিশালী করে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এই ক্ষত্রিয় আদর্শ এক নতুন মাত্রা লাভ করে। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তিনি 'দিগ্বিজয়' (সামরিক বিজয়) ত্যাগ করে 'ধর্মবিজয়' (নৈতিক বিজয়) গ্রহণ করেন। অশোকের এই রূপান্তর ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় শান্তি ও অহিংসাকে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা আধুনিক ভারতের বৈদেশিক নীতিতেও প্রতিফলিত হয়।

গুপ্ত যুগের স্বর্ণালি অধ্যায়

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কয়েক শতাব্দী পরে গুপ্ত বংশের ক্ষত্রিয় শাসকরা ভারতকে পুনরায় রাজনৈতিক সংহতি দান করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে ভারত শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের শিখরে পৌঁছায়। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় নীতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজ্যগুলোকে একটি ফেডারেল কাঠামোর অধীনে এনেছিল, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এই স্থিতিশীলতার কারণেই আর্যভট্ট বা বরাহমিহিরের মতো বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সম্রাট হর্ষবর্ধন

সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। হর্ষবর্ধনের শাসনকাল ছিল দয়া, দান এবং শিক্ষার এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর সময়ে ভারত একটি সমৃদ্ধ এবং সংস্কৃতিবান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

জ্ঞানকাণ্ড ও দার্শনিক সংস্কারে ক্ষত্রিয় মনীষা

একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ অবদান কেবল ব্রাহ্মণদের। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রমাণিত যে, ক্ষত্রিয় রাজারা কেবল অস্ত্রের চর্চা করেননি, তাঁরা ছিলেন সূক্ষ্ম দার্শনিক ও সংস্কারক। উপনিষদের রহস্যময় তত্ত্ব থেকে

শুরু করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাম্যবাদী চিন্তা—সবই ক্ষত্রিয় মনীষার ফল।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এমন অনেক রাজর্ষি বা দার্শনিক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় যারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উচ্চতর আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। বিদেহরাজ জনক তাঁর রাজসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের মতো মহান ঋষিদের সাথে দার্শনিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজেই এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ছিলেন। কাশিরাজ অজাতশত্রু যখন আত্মা ও ব্রহ্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তখন প্রমাণিত হয় যে ক্ষত্রিয়রা কেবল জাগতিক শাসনের অধিকারী ছিলেন না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেরও দিশারী ছিলেন। পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলি এবং কেকয়রাজ অশ্বপতি এমন কিছু গূঢ় দার্শনিক সত্যের উদ্ভাবক ছিলেন যা তৎকালীন বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছিল। ক্ষত্রিয়দের এই জ্ঞানতৃষ্ণা পরবর্তীকালে 'কর্ম' ও 'পুনর্জন্ম' তত্ত্বের বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ধর্মীয় আন্দোলনগুলো ছিল মূলত ক্ষত্রিয়দের নেতৃত্বে পরিচালিত এক প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা। শাক্য বংশীয় রাজপুত্র গৌতম জীবনের দুঃখ ও জরা দেখে গৃহত্যাগ করেন এবং বোধিলাভ কর। বুদ্ধের শিক্ষা ছিল জাতিভেদ প্রথার ঊর্ধ্বে এক সাম্যবাদী সমাজ গঠন, যা ভারতীয় সমাজতত্ত্বে আমূল পরিবর্তন আনে। জ্ঞাতৃক বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্র মহাবীর জৈন ধর্মকে পুনর্গঠিত করেন। তাঁর **'অহিংসা' ও 'অনেকান্তবাদ' (বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে দেখা)** তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনের এক অনন্য সম্পদ। ক্ষত্রিয়দের এই সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলিই ভারতবর্ষকে একটি বৈচিত্র্যময় এবং পরমতসহিষ্ণু দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

প্রশাসনিক উৎকর্ষ ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন

ভারত নির্মাণে ক্ষত্রিয়দের প্রশাসনিক দূরদর্শিতা এবং জনকল্যাণের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার আধুনিক 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' বা কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পূর্বসূরি হিসেবে কাজ করেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রয়োগ ক্ষত্রিয় রাজাদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। মৌর্য শাসনে গ্রাম থেকে শুরু করে রাজধানী পর্যন্ত যে সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক স্তরায়ন ছিল, তা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পাটলিপুত্র নগরীর ব্যবস্থাপনা এবং রাজকীয় গোয়েন্দা ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রু থেকে নিরাপদ রেখেছিল। সম্রাট অশোকের শাসনকালে রাস্তা নির্মাণ, রাস্তার দুই পাশে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষ রোপণ, মানুষের ও পশুর জন্য পৃথক চিকিৎসালয় নির্মাণ ছিল জনকল্যাণের সর্বোত্তম উদাহরণ। সম্রাট হর্ষবর্ধন তাঁর রাজকীয় আয়কে চার ভাগে ভাগ করতেন—প্রশাসনিক ব্যয়, রাজকীয় কর্মচারীদের বেতন, পণ্ডিতদের সম্মাননা এবং ধর্মীয় দান। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগের **'মহামোক্ষ পরিষদ'-এ** তিনি তাঁর পাঁচ বছরের অর্জিত সমস্ত সম্পদ প্রজাদের

মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এই ধরনের নিঃস্বার্থ শাসন ভারতীয় ইতিহাসে বিরল এবং এটি শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

স্থাপত্য ও প্রকৌশলগত অবদান: সেচ ও জনকাঠামো

ভারত নির্মাণে ক্ষত্রিয়দের সবচেয়ে দৃশ্যমান অবদান হলো তাঁদের নির্মিত বিশাল বিশাল প্রকৌশল কীর্তি। ভারতীয় স্থাপত্য ও প্রকৌশল বিদ্যা যে কত উন্নত ছিল, তার প্রমাণ মেলে ক্ষত্রিয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত বাঁধ, হ্রদ এবং মন্দিরগুলোতে। গুজরাটের জুনাগড়ে অবস্থিত সুদর্শন হ্রদ প্রাচীন ভারতীয় জল ব্যবস্থাপনার এক অমর নিদর্শন। এই হ্রদটির ইতিহাস মৌর্য, শক এবং গুপ্ত—এই তিন মহান ক্ষত্রিয় রাজবংশের অবদানের সাক্ষী। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যপাল পুষ্যগুপ্ত এটি প্রথম নির্মাণ করেন এবং সম্রাট অশোকের সময় তুষাস্প এটিতে খাল যুক্ত করেন। মহাপরাক্রমশালী রুদ্রদামন প্রবল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধটি মেরামত করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি এটি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে করেছিলেন এবং প্রজাদের ওপর কোনো বাড়তি কর বা বাধ্যতামূলক শ্রম (Vishti) চাপাননি। সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সময় এটি আবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি তাঁর রাজ্যপালের মাধ্যমে এটি মেরামত করেন। এই হ্রদটি এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের কৃষি ও পানীয় জলের প্রধান উৎস ছিল, যা ক্ষত্রিয় শাসকদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয় ।

কল্লনাই বাঁধ (Grand Anicut)

দক্ষিণ ভারতের চোল রাজবংশের রাজা কারিকাল চোল দ্বিতীয় শতকে **কাবেরী নদীর ওপর 'কল্লনাই' বাঁধ** নির্মাণ করেন। এটি বিশ্বের চতুর্থ প্রাচীনতম বাঁধ যা আজও সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো আধুনিক গাঁথনি উপাদান ছাড়াই ইন্টারলকিং পাথরের কৌশলে নির্মিত এই বাঁধটি কাবেরী বদ্বীপের লক্ষ লক্ষ একর জমিকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে। চোলদের এই প্রকৌশল দক্ষতা আধুনিক ভারতের সেচ ব্যবস্থার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে গণ্য হয়।

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় ক্ষত্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা

ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে ক্ষত্রিয় রাজাদের শিক্ষানুরাগ এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্ষত্রিয়দের অকুণ্ঠ অনুদান ও নিরাপত্তার ফলেই ফুলেফেঁপে উঠেছিল।

নালন্দা ও বিক্রমশীলা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে গুপ্ত সম্রাটরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সম্রাট হর্ষবর্ধন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। হর্ষবর্ধন নালন্দার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একশোরও বেশি গ্রামের রাজস্ব দান করেছিলেন। এখানে

দেশ-বিদেশের দশ হাজার ছাত্র শিক্ষা লাভ করত। পাল বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলো ভারতের প্রজ্ঞাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে রাজসভা

রাজপুত রাজাদের সভাগুলো ছিল চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিকদের স্বর্গরাজ্য। মেওয়ার, কিসানগড় এবং বুন্দি চিত্রশৈলী ক্ষত্রিয়দের বীরত্ব ও আভিজাত্যের পাশাপাশি ভারতীয় নন্দনতত্ত্বকে তুলে ধরে। রাষ্ট্রকূট রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ইলোরার কৈলাস মন্দির বা চোলদের নির্মিত তঞ্জাবুর মন্দির ভারতের স্থাপত্যশৈলীর চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

মধ্যযুগীয় প্রতিরোধ ও সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা

ভারতের মধ্যযুগে যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন ক্ষত্রিয়রা তাঁদের জীবনের বিনিময়ে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন। **রাজপুতরা** প্রায় সাত-আটশো বছর ধরে উত্তর ও মধ্য ভারতের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁদের 'ক্ষত্রিয় ধর্ম' এবং শৌর্য আরব ও তুর্কি আক্রমণকারীদের গতিরোধ করেছিল। মহারানা প্রতাপের মতো বীর যোদ্ধারা চরম কষ্টের মধ্যেও নতি স্বীকার না করে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শকে উজ্জ্বল রেখেছিলেন।

বিজয়নগর সাম্রাজ্য: দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক রক্ষক

দক্ষিণ ভারতের হাম্পিতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক মহাজাগরণ। হরিহর ও বুক্কা রায়ের নেতৃত্বে এই সাম্রাজ্য ইসলামি আক্রমণ প্রতিহত করে হিন্দু জীবনধারা, সংস্কৃত সাহিত্য এবং দ্রাবিড় স্থাপত্যকে সুরক্ষিত রাখে। হাম্পির স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা আজও বিশ্বের কাছে বিস্ময়।

নৌ-শক্তির উত্থান ও আধুনিক ভারতের ভিত্তি - ভারত নির্মাণে ক্ষত্রিয়দের অন্যতম আধুনিক ও কৌশলগত অবদান হলো নৌ-শক্তির বিকাশ। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং কানহোজী আংরের নেতৃত্বে মারাঠা নৌবাহিনী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তা আজও ভারতীয় নৌবাহিনীর অনুপ্রেরণা। শিবাজী মহারাজ ভারতের দীর্ঘ উপকূলরেখার গুরুত্ব বুঝে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন। তিনি অনেকগুলো সমুদ্র দুর্গ (যেমন সিন্ধুদুর্গ, বিজয়দুর্গ) নির্মাণ করেন যা বিদেশী শক্তির জন্য দুর্ভেদ্য ছিল। কানহোজী আংরে প্রায় ত্রিশ বছর আরব সাগরের ওপর ভারতীয় কর্তৃত্ব বজায় রেখে ব্রিটিশ ও পর্তুগিজ নৌবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। কানহোজী আংরেকে আধুনিক ভারতীয় নৌবাহিনীর জনক হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং তাঁর সম্মানার্থে একটি নৌ-ঘাঁটির নাম 'আইএনএস আংরে' রাখা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সংহতি ও বণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতা - ক্ষত্রিয় শাসকরা কেবল যুদ্ধ বা দর্শনেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নির্মাণের অন্যতম কারিগর। মৌর্য সম্রাটরা ভারতবর্ষের প্রথম একক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেন, যা বাণিজ্য ও লেনদেনকে সহজতর করে তোলে। অশোকের নির্মিত রাজপথ (যা পরবর্তীকালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড হিসেবে পরিচিত হয়) ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করেছিল। ক্ষত্রিয় রাজাদের শাসনামলে ভারত থেকে মসলিন, মশলা এবং রত্ন ইউরোপ ও এশিয়ার বাজারে রপ্তানি হতো, যা ভারতকে এক বিশাল অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছিল ।

পরিশেষে, ভারত নির্মাণে ক্ষত্রিয়দের অবদান বহুমুখী এবং সুদূরপ্রসারী। তাঁরা কেবল তরবারির মাধ্যমে ভারতের সীমান্ত রক্ষা করেননি, বরং তাঁদের প্রজ্ঞা দিয়ে ভারতীয় দর্শনের গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন, তাঁদের প্রকৌশল মেধা দিয়ে অজেয় স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা দিয়ে এক বিশাল ও অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। ক্ষত্রিয়দের ত্যাগের আদর্শ, রাজধর্মের আনুগত্য এবং জনকল্যাণের প্রতি একাগ্রতা ভারতবর্ষকে একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছে। আজ আমরা যে আধুনিক ভারতের কথা বলি, তার প্রশাসনিক কাঠামো, সামরিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্বের মূলে রয়েছে ক্ষত্রিয় রাজবংশ ও বীরদের শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও বলিদান। তাঁরা কেবল একটি বিশেষ বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করেননি, বরং তাঁরা ছিলেন ভারতীয় সভ্যতার রক্ষক ও রূপকার। তাঁদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা ও স্থাপত্যের গায়ে আজও উৎকীর্ণ হয়ে আছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা ভারতের ক্ষত্রিয় ঐতিহ্যের উত্তরসূরি। আধুনিক ভারত নির্মাণে প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, স্বেচ্ছায় নির্মাণের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। তবেই ভারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

সমাজ উন্নতির সোপানসমূহ

- শ্রীহরি নস্কর

সামাজিক প্রগতি বা সমাজ উন্নতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি সুসংগঠিত এবং পর্যায়ক্রমিক রূপান্তরের একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোতে 'সামাজিক প্রগতি' বলতে এমন এক গুণগত পরিবর্তনকে বোঝানো হয়, যা একটি জনপদকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোর পথে, অনগ্রসরতা থেকে আধুনিকতার দিকে এবং সক্ষমতাহীনতা থেকে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করে। সমাজ উন্নয়নের এই পথযাত্রায় শিক্ষা, নৈতিকতা, প্রযুক্তি এবং সুশাসনের পাশাপাশি সনাতন সভ্যতার শাশ্বত জীবনদর্শন এক অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই গবেষণাপত্রে সমাজ উন্নতির এই বিভিন্ন সোপানগুলোকে আধুনিক তত্ত্ব এবং প্রাচীন সনাতন ঐতিহ্যের নিবিড় আলোয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সনাতন দর্শনে সমাজ উন্নতির মূল ভিত্তি: ধর্ম ও ঋতঃ সনাতন সভ্যতার আলোকে সমাজ উন্নতির প্রথম এবং প্রধান সোপান হলো 'ধর্ম' (Dharma) এবং 'ঋত' (Rta)। এখানে ধর্ম মানে কেবল আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি হলো সমাজ ও মহাবিশ্বকে ধারণ করার নৈতিক আইন।

ঋত: মহাজাগতিক ও প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা - বৈদিক দর্শনে 'ঋত' হলো সেই প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক নিয়ম যা সূর্য-নক্ষত্রের গতি থেকে শুরু করে ঋতু পরিবর্তন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ উন্নতির জন্য মানুষকে এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার (Rta) সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। যখন সমাজ এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে, তখনই প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়।

ধর্ম: নৈতিক কর্তব্যের সোপান - 'ধর্ম' হলো ঋত-এর একটি ব্যবহারিক রূপ যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে প্রতিফলিত হয়। সমাজ উন্নতির সোপান হিসেবে ধর্ম ব্যক্তিকে সত্য (Satya), অহিংসা (Ahimsa), এবং দয়া (Daya) পালনের শিক্ষা দেয়। সনাতন ধর্মে উন্নতির অর্থ হলো 'অভ্যুদয়' (বস্তুগত উন্নতি) এবং 'নিঃশ্রেয়স' (আধ্যাত্মিক মুক্তি)-এর এক ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়।

পুরুষার্থ: সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির ভারসাম্যপূর্ণ মডেল - সনাতন সভ্যতায় মানুষের জীবনের এবং সমাজের উন্নতির জন্য চারটি লক্ষ্য বা সোপান নির্ধারণ করা হয়েছে, যাকে একত্রে 'পুরুষার্থ' (Purushartha) বলা হয়। এটি সমাজ উন্নয়নের একটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সামগ্রিক কাঠামো।

ধর্ম (Righteousness): এটি সকল প্রগতির ভিত্তি। ধর্মহীন প্রগতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

অর্থ (Prosperity): বস্তুগত সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমাজ প্রগতির জন্য অপরিহার্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য সকল অপরাধের মূল; তাই সৎ পথে অর্থ উপার্জন সমাজের অন্যতম লক্ষ্য।

কাম (Desire/Psychological Well-being): মানুষের মানসিক ও শারীরিক চাহিদা পূরণ এবং শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা সমাজের গুণগত মান নির্ধারণ করে।

মোক্ষ (Liberation): পরম শান্তি ও আত্মিক মুক্তি, যা উন্নতির চূড়ান্ত সোপান।

আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় যে, পুরুষার্থের এই ভারসাম্যপূর্ণ দর্শন মানুষের 'কল্যাণ' (Well-being)-এর ধারণাকে আরও ব্যাপক করে তোলে।

লোকসংগ্রহ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ: সামাজিক দায়বদ্ধতা - সামাজিক প্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সমষ্টির জন্য কাজ করা। একেই ভগবদ গীতায় 'লোকসংগ্রহ' (Lokasamgraha) বলা হয়েছে, যার অর্থ হলো জনকল্যাণ বা বিশ্বকল্যাণ।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও পরিবেশগত উন্নয়ন

সনাতন ধর্মে প্রতিদিনের পাঁচটি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে যা আধুনিক 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' (CSR)-এর আদি রূপ:

ব্রহ্মযজ্ঞ: জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের দায়িত্ব।

দেবযজ্ঞ: পরিবেশ ও প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পিতৃযজ্ঞ: পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য রক্ষা।

ভূতযজ্ঞ: পশুপাখি ও প্রকৃতির সেবা (Biodiversity conservation)।

নৃযজ্ঞ বা মানুষযজ্ঞ: আর্তমানবতার সেবা ও অতিথিসেবা।

এই পাঁচটি যজ্ঞ সমাজকে একটি অবিচ্ছেদ্য পরিবার হিসেবে গড়ে তোলে, যাকে **'বসুধৈব কুটুম্বকম'** (Vasudhaiva Kutumbakam) বলা হয়।

বর্ণাশ্রম ও সামাজিক কর্মবিভাগ: আদি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

সনাতন সভ্যতার 'বর্ণাশ্রম' (Varnashrama) পদ্ধতিটি ছিল মূলত সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার একটি সোপান। এর আদি দর্শন ছিল গুণ ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক বিশেষায়ন (Specialization)।

বর্ণ (Varna): জ্ঞানচর্চা (ব্রাহ্মণ), জনরক্ষা ও শাসন (ক্ষত্রিয়), বাণিজ্য ও উৎপাদন (বৈশ্য) এবং সেবা ও শ্রম (শূদ্র)—এই চার শ্রেণির পারস্পরিক সহযোগিতায় একটি সমাজ সমৃদ্ধ হয়। যদিও পরবর্তীকালে এটি জন্মভিত্তিক ও বৈষম্যমূলক হয়ে পড়ে, তবে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মেধার সঠিক ব্যবহার।

আশ্রম (Ashrama): জীবনের চারটি পর্যায়—ব্রহ্মচর্য (শিক্ষা), গার্হস্থ্য (কর্ম ও পরিবার), বানপ্রস্থ (অবসর ও মেন্টরশিপ) এবং সন্ন্যাস (সেবা ও ত্যাগ)—ব্যক্তিকে ধাপে ধাপে সমাজের সম্পদে পরিণত করে।

আধুনিকায়ন তত্ত্ব ও রোস্টোর উন্নয়নের স্তরবিন্যাস

ওয়াল্ট রোস্টো (Walt Rostow) ১৯৬০ সালে তাঁর অত্যন্ত প্রভাবশালী 'দ্য স্টেজেস অফ ইকোনমিক গ্রোথ' মডেলে উন্নয়নকে একটি রৈখিক প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন । রোস্টোর মতে, প্রতিটি সমাজকে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে হলে পাঁচটি নির্দিষ্ট ধাপ বা সোপান অতিক্রম করতে হয়। প্রথম সোপানটি হলো 'সনাতন সমাজ' (Traditional Society) । এরপর 'উত্থানের প্রাক-প্রস্তুতি', 'টেক-অফ', 'পরিপক্কতার দিকে যাত্রা' এবং সবশেষে 'অত্যধিক গণভোগের যুগ' । যদিও এই তত্ত্বটি পশ্চিমা ধাঁচের, এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি প্রারম্ভিক মডেল হিসেবে কাজ করেছে এবং ভোগবাদকে প্রাধান্য দিয়েছে। যা ভারতীয় বিচারধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা পদ্ধতি ও স্বাধীনতা হিসেবে উন্নয়ন

অমর্ত্য সেনের মতে, উন্নয়ন হলো মানুষের 'সক্ষমতা' (Capability) বৃদ্ধি এবং 'স্বাধীনতা' (Freedom)-র বিস্তার । তাঁর এই দর্শন সনাতন 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি'র ধারণার সাথে একাত্ম হয়, যেখানে উন্নয়ন বলতে কেবল আয়ের বৃদ্ধি নয়, বরং মানুষের পছন্দ করার সুযোগ এবং অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের ক্ষমতা থাকাকে বোঝানো হয়েছে । মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার বিস্তারই হলো প্রকৃত প্রগতি ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বাংলার নবজাগরণ ও সমাজ সংস্কার - বাংলার সমাজ উন্নতির ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অপরিসীম। তাঁরা বৈদিক দর্শনের মূল নির্যাস ব্যবহার করে তৎকালীন সমাজের কুসংস্কার দূর করেছিলেন। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজের অর্ধাংশকে প্রগতির সোপানে তুলে আনেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শ্রীনিকেতন ও পল্লী পুনর্গঠন কাজের মাধ্যমে সমাজকে স্বনির্ভর ও আত্মশক্তি সম্পন্ন করার পথ দেখিয়েছিলেন । তাঁর উন্নয়নের মূলে ছিল 'সমবায়' (Cooperation), যা বৈদিক 'সংগঠন' বা একতার ধারণার প্রতিফলন।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি: একবিংশ শতাব্দীর সোপান

প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা ও নালন্দার মতো শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ছিল প্রগতির আলোকবর্তিকা, যেখানে ধর্ম ও বিজ্ঞানের

সহাবস্থান ছিল। আধুনিক যুগেও শিক্ষা কেবল কর্মসংস্থানের মাধ্যম নয়, এটি সামাজিক পুঁজি (Social Capital) বৃদ্ধির হাতিয়ার। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'পরিবেশগত, সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক' (ESG) চর্চা এখন উন্নয়নের নতুন মানদণ্ড। প্রযুক্তি ও আইসিটি (ICT) বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন এবং তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বাড়িয়ে সমাজ উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করছে।

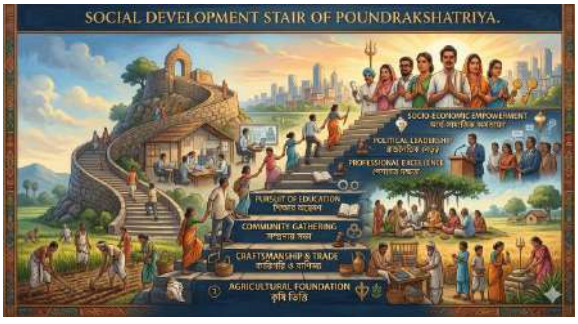
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ভবিষ্যৎ

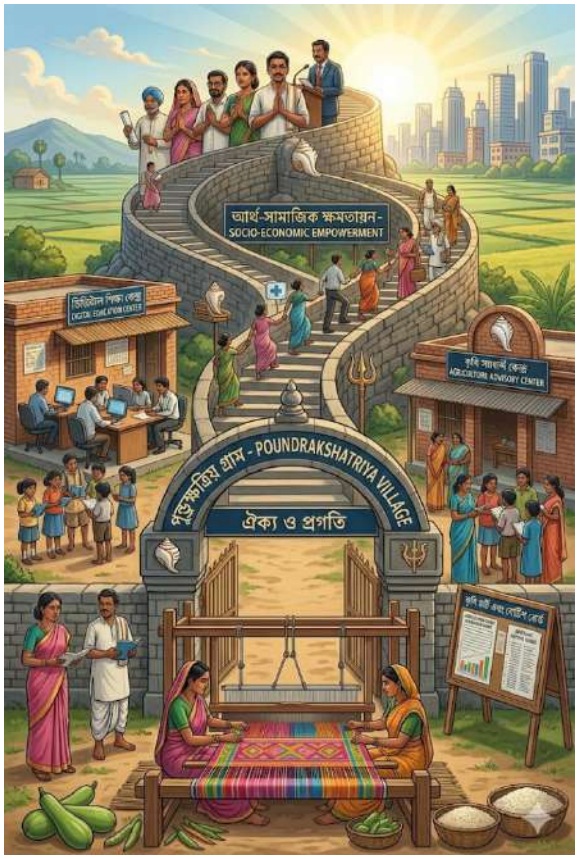
জাতিসংঘের ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) মূলত মহাবিশ্বের ভারসাম্য রক্ষার এক আধুনিক দলিল । এর 'ট্রিপল বটম লাইন' (মানুষ, পৃথিবী ও সমৃদ্ধি) দর্শন আসলে সনাতন 'ঋত' এবং 'লোকসংগ্রহ'-এরই আধুনিক বৈশ্বিক রূপ। পরিবেশ রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সমাজ উন্নতির চূড়ান্ত সোপান ।

উপসংহারঃ সমাজ উন্নতির সোপানসমূহ কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সিঁড়ি নয়, বরং এটি নৈতিকতা, শিক্ষা, সাম্য এবং আধ্যাত্মিক চেতনার এক সুসমন্বিত যাত্রা। সনাতন সভ্যতার 'পুরুষার্থ' ও 'ধর্ম' আমাদের যে নৈতিক ভিত্তি দান করে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করে। রাজা রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগর যে সংস্কার শুরু করেছিলেন, এবং অমর্ত্য সেন যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তার মূলে রয়েছে মানুষের সামগ্রিক কল্যান। একটি উন্নত সমাজ হলো সেটি যেখানে বস্তুগত সমৃদ্ধি (Artha) ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা (Seva) করার সুযোগ পায় এবং যেখানে উন্নয়ন হয় টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। প্রগতির এই বহুমাত্রিক সোপান বেয়েই আমরা এক শান্তিময় ও সমৃদ্ধ 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বা বিশ্ব-পরিবার গড়ে তুলতে পারি।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমাজ উন্নতির সোপানসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং এর শরিক হতে হবে। বর্তমান সদস্যদের চেতনার উপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা নির্ভরশীল। তাই সদস্যরা যত তাড়াতাড়ি এটা রপ্ত করতে পারবেন তত দ্রুত সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।





একটি পৌন্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রাম

- শ্রীমতী সুমিতা গায়েন

হলদিয়া, মেদিনীপুর।

আমার জন্মস্থান মশামারী। হুগলি নদীর তীরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অবস্থিত। অধিকাংশ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ভুক্ত মানুষ বসবাস করেন এই গ্রামে। এই গ্রামের পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিবর্তন নিয়ে আমার আবেগঘন স্মৃতির উপর নির্ভর করে সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিলাম। প্রকৃতির অকৃপণ দানে ঘেরা এই গ্রামটি যুগ যুগ ধরে তার সন্তানদের প্রতিপালন করছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জীবন ও জীবিকার লড়াই সহনশীলতা এবং উত্থানের এক জীবন্ত দলিল এই গ্রাম। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই সংগ্রামী পরিশ্রমই এবং মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ। গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া পথের দু'ধারে সবুজের সমারহ এবং গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী এখানকার প্রাণ। গ্রামের সিংহভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। মূলত ধান, শাকসবজি, টমেটো, সূর্যমুখী ইত্যাদি চাষের উপর নির্ভরশীল ।নদী, বিল ও জলাশয়ের প্রাচুর্য থাকায় মাছ ধরা অনেকেরই প্রধান জীবিকা। পৌন্ড্রক্ষত্রিয় রমণীরা অলস সময় কাটাতে জানেন না। গৃহ কাজ সেরে তারা অবলীলায় মাঠে নেমে পড়েন। বীজ বোনা থেকে ধান ঝাড়াই, এমন কি মাছ ধরার কাজেও তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়া থাকে। অধিকাংশ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা আছে। তাই কোন কিছুই তাদের মনের প্রসারতাকে হ্রাস করতে পারেনি। তাই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মনে এক অদ্ভুত সন্তুষ্টি আছে। গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণটি গ্রামের সামাজিক মিলন মেলা, যেখানে প্রবীনদের অভিজ্ঞতার আলো নবীনদের পথ দেখায়। প্রবীণরা সমবেত হন, তাদের আড্ডায় কোন রাজনৈতিক জটিলতা থাকে না, থাকে শুধু সারাদিনের ক্লান্তি ভোলার মত নির্মল হাসি

এবং পুরানো দিনের গল্প। এক সময়ে ছিল কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছতে শুরু করেছে। আজ গ্রামের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। গ্রামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক রয়েছেন ,আছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। এই পেশাগত পরিবর্তন গ্রামের সামাজিক মর্যাদাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কিন্তু আমার বেদনার জায়গা হল ,আমাদের তরুণ প্রজন্ম, শিক্ষিত হওয়ার পরও অনেক যুবক-যুবতীরা উপযুক্ত কাজ পায় না, উচ্চশিক্ষা নিয়েও যখন তারা তাদের কৃষি জমিতে কৃষিকাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবকেরা হার মানতে শেখেনি। বেকারত্বের অভিশাপ মুছে ফেলতে অনেকে শহর মুখী হয়েছে। কেউবা গ্রামে ছোট ছোট উদ্যোগ শুরু করেছে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অনেকেই সফল। আমার জন্মস্থান নিয়ে আমি গর্বিত; আমি গর্বিত আমি একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রমণী। পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা সত্বেও আমি উচ্চশিক্ষিতা হয়েছি। আশা রাখি এই গ্রামের প্রতিটি ঘর থেকে আগামীতে আরও অনেক প্রতিভাবান যুবক যুবতী বেরিয়ে আসবে, যারা কেবল এই গ্রামের নয় বরং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণের জন্য সকল পাঠকের নিকট থেকে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। বছরের যে কোনও সময় লেখা পাঠানো যাবে। লেখা পাঠাতে হবে Email ID: poundrakshatriyadarpan@gmail.com তে এবং ৯৮০০২৯৬৬৪৮ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ।

"যারা সংগঠন করেন, তাদেরও সকলের পরিবার আছে। তাই অজুহাত দেখিয়ে, ভালো কাজ থেকে দূরে থেকে, অলস মানসিকতার পরিচয় দেবেন না। সাধ্যানুসারে কিছু করুন এবং সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন।"

- পত্রিকা সম্পাদক।।

একটি অণুগল্প

পরম্পরা

এক গ্রামে সবাই মিলে স্বজাতির একজনকে ব্রাহ্মণ বানালো, কারণ ব্রাহ্মণরা তাদের উপর দীর্ঘকাল অত্যাচার করেছে, তাই নিজেদের ব্রাহ্মণ চাই। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বই-শাস্ত্র চর্চা করে নিজেকে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত করে তুলল। তিনি নিজের ছেলেদের ব্রাহ্মণ হিসাবে গড়ে তুললেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা, তারপর তাদের ছেলেরা দায়িত্ব পেল। গ্রামের লোক তাদের নিজের স্বজাতির না ভেবে আসল ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগল এবং বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করল। বিরোধ বাড়ল। গ্রামের লোক সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেদের স্বজাতির ব্রাহ্মণ চাই। তারা গ্রামের একজনকে ব্রাহ্মণের দায়িত্ব দিল।।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ধর্ম

বর্তমানে হিন্দু একতার প্রয়োজন

- আচার্য শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায়

বর্তমানে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ সংহতি এবং একতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ২০টি যুক্তি নিচে দেওয়া হলো:

১. **বর্ণপ্রথা ও বিভাজন দূরীকরণ:** হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথা যে বিভেদ তৈরি করেছে, তা দূর করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একতা অপরিহার্য।

২. **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা:** হাজার বছরের প্রাচীন সনাতন সংস্কৃতি, স্থাপত্য এবং ঐতিহ্যগুলোকে বিকৃতি ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

৩. **ধর্মীয় রীতিনীতির সংরক্ষণ:** বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বৈচিত্র্যময় পূজা-পার্বণ ও লোকজ আচারগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য পারস্পরিক সহযোগিতা জরুরি।

৪. **পারিবারিক মূল্যবোধ বজায় রাখা:** যৌথ পরিবারের আদর্শ এবং সনাতন নৈতিক মূল্যবোধগুলো আধুনিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে একতাবদ্ধ সমাজ বড় ভূমিকা পালন করে।

৫. **যৌথ নিরাপত্তা:** সংখ্যালঘু হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিশেষ জনপদে হিন্দুদের জান-মাল ও উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একতার বিকল্প নেই।

৬. **মানবাধিকার ও কণ্ঠস্বর:** আন্তর্জাতিক স্তরে হিন্দুদের ওপর হওয়া কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠস্বর তুলতে গেলে সুসংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

৭. **আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করা:** মন্দির ব্যবস্থাপনা এবং ধর্মীয় সম্পত্তির আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হিন্দু সমাজের ঐক্যবদ্ধ আইনি ও সামাজিক লড়াই প্রয়োজন।

৮. **ধর্মান্তরণ রোধ:** প্রলোভন বা চাপের মুখে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া হিন্দুদের ধর্মান্তরণ রুখতে হলে পুরো সমাজকে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

৯. **আর্থিক সহায়তা:** সমাজের বিত্তবান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দরিদ্র হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা সম্ভব।

১০. **গুরুকুল ও বৈদিক শিক্ষা:** বৈদিক জ্ঞান এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ও গোষ্ঠীগত বিনিয়োগ প্রয়োজন।

১১. **কর্মসংস্থান তৈরি:** হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের ব্যবসায়ী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়।

১২. **মেধা পাচার রোধ:** মেধাবী তরুণ প্রজন্মকে স্বদেশের মাটি ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত রাখতে একতাবদ্ধ বৌদ্ধিক সমাজ প্রয়োজন।

১৩. **মতাদর্শগত বিভ্রান্তি দূর করা:** সনাতন ধর্ম সম্পর্কে নানাবিধ ভুল ধারণা ও অপপ্রচার রুখতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর একতা প্রয়োজন।

১৪. **মঠ ও মন্দিরের সংস্কার:** তীর্থস্থানগুলোর পরিবেশ রক্ষা এবং মন্দিরের পবিত্রতা বজায় রাখতে ভক্তদের সম্মিলিত তদারকি দরকার।

১৫. **সেবাধর্ম পালন:** আর্তমানবতার সেবায় হিন্দুদের 'নরসেবা-ই নারায়ণ সেবা' আদর্শকে বড় পরিসরে বাস্তবায়িত করতে সংহতি প্রয়োজন।

১৬. **যুব সমাজের দিশা:** আধুনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে তরুণ সমাজকে আদর্শিক দিশা দেখাতে ঐক্যবদ্ধ অভিভাবকত্ব জরুরি।

১৭. **বিশ্ব হিন্দু ভ্রাতৃত্ব:** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

১৮. **ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ:** অতীতে অনৈক্যের কারণে হিন্দু সমাজ যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকে সুরক্ষিত করা।

১৯. **পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষা:** সনাতন ধর্মে প্রকৃতি ও নদীকে যেভাবে পবিত্র মনে করা হয়, সেই চেতনা থেকে পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেওয়া।

২০. **শান্তি ও সহাবস্থান:** হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হলে তা কেবল হিন্দুদের জন্য নয়, বরং বিশ্বশান্তি ও পরমতসহিষ্ণুতার (বসুধৈব কুটুম্বকম) বার্তাকে আরও জোরালোভাবে প্রচার করতে সাহায্য করবে।

হিন্দু একতা মানে নিজের শেকড়কে মজবুত করে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং শান্তি নিশ্চিত করা। যেমন গ্লাসে রাখা **জল** তখনই তৃষ্ণা মেটাতে পারে যখন তা পাত্রে সংবদ্ধ থাকে, ছড়িয়ে পড়লে তা কাদার সৃষ্টি করে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। হিন্দু থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিচ্ছিন্ন হলেই ইসলাম ও খৃষ্টানরা তাদের গ্রাস করবে; যা অতীতে ঘটেছে। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হিন্দু একতায় কোনও আপোষ করবেন না।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



বর্তমান বিশ্ব ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা চিন্তা করুন বৈশ্বিক, কাজ করুন স্থানীয় ভিত্তিতে

- ত্রিলোচন নস্কর

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ বাংলার এক প্রাচীন ও বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের অধিকারী। সময়ের বিবর্তনে এই সমাজ নানা চড়াই-উতরাই পার করলেও বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েছে। আজকের যুগে সফল হওয়ার মূলমন্ত্র হলো— "Think Globally, Act Locally" বা **"চিন্তা করুন বৈশ্বিক, কাজ করুন স্থানীয়"**। এই দর্শনকে পাথেয় করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ কীভাবে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং আধুনিক বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তা নিয়ে এক গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন।

বৈশ্বিক চিন্তার অর্থ হলো নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করা। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের তরুণ প্রজন্মকে বুঝতে হবে যে তারা কেবল একটি গ্রাম বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের অংশ নয়, বরং তারা বিশ্ব মানবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শিক্ষার আধুনিকায়ন: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং আধুনিক অর্থনৈতিক নীতিগুলো নিয়ে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন: পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ইতিহাস বীরত্বের। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর সেই গৌরবময় ইতিহাসকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে হবে। বৈশ্বিক চিন্তা মানেই হলো নিজের শিকড়কে চিনে নিয়ে তাকে আন্তর্জাতিক মানে উপস্থাপন করা।

মানসিকতা পরিবর্তন: সংকীর্ণ রাজনীতি বা অভ্যন্তরীণ দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে পুরো সমাজের সার্বিক কল্যাণ কীভাবে সম্ভব, সেই দূরদৃষ্টি বা 'গ্লোবাল ভিশন' তৈরি করতে হবে।

স্থানীয় কাজ: বাস্তবের জমিতে পদক্ষেপ

চিন্তা বিশাল হলেও তার শুরুটা হতে হবে নিজের ঘর থেকে। স্থানীয় স্তরে কাজ করার মাধ্যমেই প্রকৃত পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সামাজিক সংহতি: স্থানীয় পর্যায়ে পাড়ায় পাড়ায় বা গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট সমিতি বা ক্লাব গঠন করে সামাজিক বন্ধন মজবুত করতে হবে। বিবাদ বিসংবাদ এড়িয়ে একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসা হবে স্থানীয় কাজের প্রথম ধাপ।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা: স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা যেতে পারে। কৃষিজীবী

বা শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা বা চেইন শপ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত না হলে কোনো সমাজ দীর্ঘস্থায়ী সম্মান পায় না।

শিক্ষার প্রসারে স্থানীয় উদ্যোগ: গ্রামের মেধাবী কিন্তু অভাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা বা কোচিং সেন্টার গড়ে তোলা। স্থানীয় লাইব্রেরিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা যাতে নতুন প্রজন্ম সঠিক জ্ঞানচর্চার সুযোগ পায়।

কৃষি ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের একটি বড় অংশ কৃষির সাথে যুক্ত। এখানে বৈশ্বিক চিন্তা এবং স্থানীয় কাজ একীভূত হতে পারে। বিশ্বজুড়ে অর্গানিক চাষাবাদ এবং আধুনিক সেচ ব্যবস্থার যে জোয়ার এসেছে, তা স্থানীয় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটির গুণাগুণ বজায় রেখে কীভাবে ফলন বাড়ানো যায় এবং সেই ফসল সরাসরি রপ্তানি করা যায়, সেই কৌশল স্থানীয় স্তরে বাস্তবায়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাটির সাথে যে জল ও ঘাম মিশে থাকে, তাই হলো প্রকৃত সমৃদ্ধির উৎস।

নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক সচেতনতা

স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। পৌরসভা বা পঞ্চায়েত স্তরে যোগ্য ও শিক্ষিত প্রার্থীদের তুলে ধরতে হবে যারা সমাজের অধিকার আদায়ে সক্ষম। বৈশ্বিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বুঝে স্থানীয়ভাবে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে যাতে সমাজ অবহেলার শিকার না হয়।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বর্তমান সময়ের দাবি হলো— **চোখ থাকবে নক্ষত্রে আর পা থাকবে মাটিতে।** আমরা যখন বিশ্বমানের শিক্ষা ও চেতনায় সমৃদ্ধ হব (বৈশ্বিক চিন্তা), তখন আমাদের কর্মক্ষেত্রে বা নিজের বাসভূমে তার সুফল ফলবে (স্থানীয় কাজ)। যেদিন প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পরিবারে শিক্ষার আলো পৌঁছাবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, সেদিনই এই প্রাচীন জাতি পুনরায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাবে। একতা, কঠোর পরিশ্রম এবং আধুনিক চিন্তা— এই ত্র্যহস্পর্শই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে এক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। মনে রাখুন, আপনার আজকের ছোট পদক্ষেপটিই হতে পারে আগামীকালের বৈশ্বিক বিপ্লবের সূচনা।

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



বিশেষ প্রবন্ধ



কম্যুনিজম ও ইসলামি মৌলবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সাদৃশ্য সম্পর্কে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে

- ড. বন্দেমাতরম মৌলিক

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে **সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম** এবং **ইসলামি মৌলবাদ বা ইসলামিজম (Islamism)** দুটি প্রবল শক্তিশালী ও রূপান্তরকামী আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই দুই মতাদর্শ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মেরুর—একটি উগ্র বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী, অন্যটি একগুঁয়ে আধ্যাত্মিক ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক। তবে সমাজবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গভীরতর বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, **তাদের সাংগঠনিক কাঠামো, বিরোধীদের নির্মূল করার পদ্ধতি, নির্দিষ্ট গ্রন্থের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক বিস্ময়কর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সাদৃশ্য বিদ্যমান।** রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রোক্সেন ইউবেন (Roxanne L. Euben) এই সম্পর্ককে **"আয়নায় প্রতিফলিত শত্রু" (Enemy in the Mirror)** হিসেবে অভিহিত করেছেন, যেখানে উভয় পক্ষই আধুনিক পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদকে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে. এই উভয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে একটি কঠোর আদর্শিক ছাঁচে ঢেলে সাজানো, যা শেষ পর্যন্ত একটি সর্বাত্মকবাদী বা টোটালিটারিয়ান (Totalitarian) রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করে। (**Roxanne L. Euben** - *Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism: A Work of Comparative Political Theory,* Princeton University Press, 1999)।

মতাদর্শিক ভিত্তি ও নির্দিষ্ট গ্রন্থের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব

যেকোনো সর্বাত্মকবাদী আন্দোলনের মেরুদণ্ড হলো একটি মৌলিক পাঠ্য বা 'টেক্সট', যা অনুসারীদের কাছে অভ্রান্ত এবং অলঙ্ঘনীয় বলে গণ্য হয়। কম্যুনিস্টদের কাছে **কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (The Communist Manifesto)** যেমন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত নির্দেশিকা, বিংশ শতাব্দীর আমূল পরিবর্তনকামী ইসলামপন্থীদের কাছে **সাইয়্যেদ কুতুবের 'মাইলস্টোনস' (Milestones) বা 'মাআলিম ফিত ত্বরিক'** ঠিক সেই একই উচ্চতায় আসীন। এই

গ্রন্থদ্বয় কেবল কিছু রাজনৈতিক প্রস্তাবনা নয়, বরং তারা একটি সম্পূর্ণ বিশ্বদর্শন এবং ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণের দাবি করে।

মার্কসবাদী তত্ত্বে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' এবং 'শ্রেণিসংগ্রাম'কে ইতিহাসের একমাত্র চালিকাশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে, পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংস করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করাই মানবমুক্তির একমাত্র পথ। অন্যদিকে, সাইয়্যেদ কুতুব তার তত্ত্বে 'হাকিমিয়্যাহ' বা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে একমাত্র বৈধ শাসনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কুতুবের মতে, আধুনিক বিশ্ব একটি **'জাহিলিয়াত' বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে** বাস করছে, যেখানে মানুষের তৈরি আইন আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই 'জাহিলিয়াত' শব্দটি কুতুব প্রাক-ইসলামী আরবের বর্বরতা থেকে ধার করলেও তিনি একে আধুনিক পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের ওপর প্রয়োগ করেছেন। তিনি মনে করেন, যে সমাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শরিয়াহ আইন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর নেই, তা-ই মূলত জাহিলিয়াত। (Sayyid Qutb - *Milestones* (*Ma'alim fi al-Tariq*), Maktabah Islamiyah,1964)

তুলনার ক্ষেত্র	কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো (মার্কস/এঙ্গেলস)	মাইলস্টোনস (সাইয়্যেদ কুতুব)
বর্তমান বিশ্বের সংজ্ঞা	বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা।	আধুনিক জাহিলিয়াত বা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু	সর্বহারার বিপ্লব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ।	জিহাদের মাধ্যমে জাহিলী রাষ্ট্রব্যবস্থা উৎখাত ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা।
চূড়ান্ত লক্ষ্য	রাষ্ট্রহীন, শ্রেণিবৈষম্যহীন সাম্যবাদী সমাজ।	আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খিলাফত।
বিরোধীদের পরিচয়	শ্রেণি শত্রু (Class Enemy) বা প্রতিক্রিয়াশীল।	তাগুত (শয়তানি শক্তি) বা মুশরিক/কাফির।
পদ্ধতিগত দর্শন	দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক অমোঘতা।	ঐশ্বরিক নির্দেশ ও বিশ্বজনীন শরিয়াহর প্রয়োগ।

তুলনার ক্ষেত্র	কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো (মার্কস/এঙ্গেলস)	মাইলস্টোনস (সাইয়্যেদ কুতুব)

উভয় গ্রন্থই অনুসারীদের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দেয় যে, **তাদের মতাদর্শই একমাত্র সত্য এবং এর বাইরে যা কিছু আছে তা ধ্বংসযোগ্য।** কুতুব তার গ্রন্থে দাবি করেন যে, ইসলাম এবং জাহিলিয়াত

কখনোই সহাবস্থান করতে পারে না; হয় ইসলাম বিজয়ী হবে অথবা জাহিলিয়াত তাকে গ্রাস করবে। মার্কসও তার ম্যানিফেস্টোতে বুর্জোয়া সমাজকে সমূলে ধ্বংস করার ডাক দিয়েছিলেন, যা এই দুই দর্শনের মধ্যে অসহিষ্ণুতার তাত্ত্বিক সাদৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলে।

ভ্যানগার্ড ও ক্যাডার ভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো

লেলিনের প্রবর্তিত **'ভ্যানগার্ড' (Vanguard) বা অগ্রগামী দল** তত্ত্ব এবং সাইয়্যেদ কুতুব বা মওলানা মওদুদীর **'জামাআত' বা 'ক্যাডার'** ভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে গভীর সাংগঠনিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। লেলিনের মতে, সাধারণ শ্রমিক শ্রেণি নিজে থেকে রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করতে পারে না; তাই তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একদল সুশৃঙ্খল, পেশাদার বিপ্লবী প্রয়োজন যারা সর্বহারার চেতনা বহন করবে (Vanguardism - Wikipedia)। একইভাবে সাইয়্যেদ কুতুব 'মাইলস্টোনস' গ্রন্থে একটি 'অগ্রগামী দল' (Tali'a/Vanguard) গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন, যারা জাহিলী সমাজের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থেকে একটি বিশুদ্ধ ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য লড়াই করবে।

এই সাংগঠনিক কাঠামোতে 'গণতন্ত্র' বা 'বহুমত' এর কোনো স্থান নেই। কম্যুনিস্ট পার্টি যেমন 'ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম' বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মাধ্যমে কাজ করে, যেখানে নিচু স্তরের সদস্যদের ওপরের স্তরের আদেশ মানা বাধ্যতামূলক, ঠিক তেমনি ইসলামিস্ট দলগুলোতে 'সামি'না ওয়া আত্বা'না' (শুনলাম ও মানলাম) এবং 'বাইয়াত' বা আমীরের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করা হয়।

মওলানা মওদুদী তার 'ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থার' রূপরেখায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের কাজের পরিধি হবে সর্বব্যাপী এবং মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কোনো ক্ষেত্রই এই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ফ্যাসিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট একনায়কতন্ত্রের একটি ধর্মীয় সংস্করণ। (Sayyid Abul A'la Maududi - *Political Theory of Islam*, Islamic Publications Ltd., 1960)।

নিম্নের সারণিতে সংগঠনের সাদৃশ্য দেখানো হলো:

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য	কম্যুনিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টি	ইসলামিস্ট অগ্রগামী দল (Tali'a)

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য	কম্যুনিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টি	ইসলামিস্ট অগ্রগামী দল (Tali'a)
নেতৃত্বের ধরণ	পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি।	মজলিসে শুরা ও আমীর/ইমাম।
সদস্যদের গুণাবলী	মতাদর্শগত দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলা।	ঈমানি জজবা ও কঠোর আনুগত্য।
ব্যক্তি স্বাধীনতা	পার্টির স্বার্থে ব্যক্তির ইচ্ছা বিসর্জন।	আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে আমীরের আনুগত্য।
বহুদলীয় রাজনীতি	বুর্জোয়া অপকৌশল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত।	আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবিক দল গঠন হারাম।

এই ভ্যানগার্ড দলগুলো নিজেদের জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে তারা ছাড়া বাকি সবাই **'মিথ্যা চেতনা' (False Consciousness)** বা 'জাহিলিয়াতের' অন্ধকারে ডুবে আছে। এই মানসিকতা থেকেই বিপ্লব পরবর্তী সময়ে বিরোধীদের দমনে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হয়।

স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাব: নাস্তিক্যবাদ বনাম বিশুদ্ধতা

উভয় মতাদর্শই স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী ধর্ম এবং প্রথাগত জীবনধারার প্রতি চরম বৈরিতা পোষণ করে। **কম্যুনিজম যেখানে ধর্মকে "জনগণের আফিম" বলে মনে করে এবং একে নির্মূল করতে চায়, ইসলামী মৌলবাদ সেখানে স্থানীয় সংস্কৃতিকে 'বিদআত' (ধর্মীয় বিকৃতি) বা 'শিরক' (অংশীবাদ) হিসেবে চিহ্নিত করে ধ্বংস করতে চায়।** (The Fate Of Muslims Under Soviet Rule : A Review - Pragyata.com & SAYYID QUTB'S DOCTRINE OF JAHILIYYA - ResearchGate.net)

কম্যুনিষ্ট শাসনে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মাওবাদী চীনে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মকে প্রগতি ও বিজ্ঞানের অন্তরায় হিসেবে দেখা হতো। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি আইন জারি করা হয় যা ধর্মীয় সংগঠনগুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। স্টালিন আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক দশকে রাশিয়ায় হাজার হাজার গির্জা এবং মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কাজাখস্তানে অসংখ্য প্রাচীন মসজিদ ও মাদরাসা ধ্বংস করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৩৬

সালের সংবিধানে 'ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা'র কথা কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে ধর্মবিরোধী প্রচারণাকেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো। (The Fate Of Muslims Under Soviet Rule : A Review - Pragyata.com)

চীনে মাও সে তুং-এর 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' সময় প্রাচীন মন্দির, বৌদ্ধ মঠ এবং কনফুসীয় নিদর্শনগুলোকে **'পুরানো ধ্যান-ধারণা' (Four Olds)** হিসেবে চিহ্নিত করে ধ্বংস করা হয়। বর্তমান সময়ে সিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির (CCP) আচরণকে অনেক গবেষক **'সাংস্কৃতিক গণহত্যা'** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেখানে উইঘুরদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে, দাড়ি রাখা বা হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রায় ১০ থেকে ২০ লক্ষ মানুষকে 'পুনঃশিক্ষণ কেন্দ্র' বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী রাখা হয়েছে। (Chinese genocide of Uyghurs in Xinjiang continues - www.genocidewatch.com)

ইসলামী মৌলবাদে সাংস্কৃতিক ধ্বংসযজ্ঞ

একইভাবে, তালেবান বা আইএস (ISIS) যখন কোনো অঞ্চল দখল করে, তারা সেখানকার প্রাক-ইসলামী ইতিহাস এবং স্থানীয় লোকজ প্রথাগুলোকে 'হারাম' বলে ঘোষণা করে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানের বামিয়ানে ষষ্ঠ শতাব্দীর বিশাল বুদ্ধ মূর্তিগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া ছিল তালেবানের সাংস্কৃতিক ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। তাদের মতে, **ইসলাম আসার আগের যেকোনো ইতিহাসই হলো 'জাহিলিয়াত' বা অন্ধকারের ইতিহাস, যা সংরক্ষণ করা ধর্মীয় অপরাধ।** (https://extremism.gwu.edu/risks-facing-hazaras-in-taliban-ruled-afghanistan ও **extremism.gwu.edu** - The Risks Facing Hazaras in Taliban-ruled Afghanistan)

ইসলামিস্টরা অনেক সময় ঐতিহ্যবাহী মরমী বা সুফীবাদী ইসলামকেও আক্রমণ করে। তারা মাজার ভাঙচুর করে এবং স্থানীয় পীর-দরবেশ কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে শিরক হিসেবে গণ্য করে। গবেষক এস. এন. আইজেনস্ট্যাড লক্ষ্য করেছেন যে, এই আন্দোলনগুলো প্রথাগত সংস্কৃতিকে একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক কাঠামোর মধ্যে 'অপরিহার্য' (Essentialize) করে তুলতে চায়, যা বৈচিত্র্যের সব পথ বন্ধ করে দেয়। (S. N. Eisenstadt, *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of*

Modernity,Cambridge University Press,1999)।

বিরোধীদের হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠনের তাত্ত্বিক বৈধতা - বিরোধীদের হত্যা এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে উভয় মতাদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। সাম্যবাদে বিরোধীদের 'শ্রেণি শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যাদের নির্মূল করা বিপ্লবের স্বার্থে নৈতিকভাবে সঠিক (Vladimir Lenin - The State and Revolution)। অন্যদিকে, ইসলামী মৌলবাদে 'তাকফির' (Takfir) বা কাউকে কাফির ঘোষণা করার মাধ্যমে তার রক্ত ও সম্পদকে হালাল বা বৈধ করা হয়। (tandfonline.com - Full article: Killing in the Name of Islam? Assessing the Tunisian Approach)।

সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের সাদৃশ্য

কার্ল মার্কস তার তত্ত্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপকে সাম্যবাদের মূল শর্ত হিসেবে দেখেছিলেন. সোভিয়েত ইউনিয়নে **'ডিকুলুকাইজেশন'** অভিযানের মাধ্যমে ধনী কৃষকদের (কুলুক) সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের হত্যা বা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। **বুলগেরিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ার মতো দেশগুলোতেও কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পর 'জনগণের সম্পত্তি' গড়ার নামে ব্যাপক লুণ্ঠন চালানো হয়েছিল।** (**international-communist-party.org** -A Revolution Summed Up, 1967 - INTERNATIONAL COMMUNIST PARTY)।

আশ্চর্যজনকভাবে, সাইয়্যেদ কুতুব তার 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' (Social Justice in Islam) গ্রন্থে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন, তা অনেক ক্ষেত্রে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। কুতুব লিখেছেন, "সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব নয়, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্প্রদায়ের কাছে একটি আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ মাত্র"। কুতুবের মতে, রাষ্ট্র যদি মনে করে যে সামাজিক প্রয়োজনে কারও সম্পদ কেড়ে নেওয়া জরুরি, তবে তা করার পূর্ণ অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। তিনি দাবি করেন যে, ইসলামে ব্যক্তি কেবল একজন জিম্মাদার (Trustee) এবং সম্পদের প্রকৃত অধিকার সমাজের। ((Sayyid Qutb - *Social Justice in Islam* (মূল আরবি: *Al-Adala al-Ijtimaiyya fi al-Islam*) **অনুবাদক** - John B. Hardie), American Council of Learned Societies, ১৯৪৯ (প্রথম প্রকাশ), ইংরেজি অনুবাদ ১৯৫৩। **Chapter 6: The Economic Theory of Islam)**।

কুতুবের এই সম্পত্তি তত্ত্বের কারণেই কট্টর রক্ষণশীল আলেমরা তাকে 'ইসলামি সমাজতন্ত্রী' হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন। (themadkhalis.com - Readings in Elementary Communism: Karl Marx, Freidrich Engels ..)

সহিংসতার ব্যবহারিক প্রয়োগ: হত্যা ও দমননীতি

কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থায় বিরোধীদের 'শ্রম শিবিরে' (Gulag) পাঠানো বা সরাসরি ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা ছিল একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। খেমার রুজদের আমলে চশমা পরা বা শিক্ষিত হওয়া ছিল মৃত্যুর পরোয়ানা, কারণ তাদের 'বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী' হিসেবে গণ্য করা হতো (study.com - Khmer Rouge Regime | History, Communism & Cambodian Genocide)। ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো যেমন আইএসআইএস বা আল-কায়েদা তাদের বিরোধীদের 'মুরতাদ' হিসেবে চিহ্নিত করে। **আইএসআইএস ইয়াজিদি নারীদের দাস হিসেবে বিক্রি করা এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য ধর্মীয় ম্যানুয়াল তৈরি করেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে অমুসলিমদের সম্পদ 'গনিমতের মাল' হিসেবে দখল করা তাদের অধিকার।** তালেবানরা বর্তমানে আফগানিস্তানে হাজারাদের জমি কেড়ে নিয়ে তাদের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করছে, যা মূলত একটি সুশৃঙ্খল লুণ্ঠন প্রক্রিয়া। (nadiasinitiative.org - The Genocide - Nadia's Initiative & extremism.gwu.edu -The Risks Facing Hazaras in Taliban-ruled Afghanistan)।

গণহত্যা ও তার পরিসংখ্যান: একটি রক্তক্ষয়ী খতিয়ান

ইতিহাসের পাতায় কম্যুনিজম এবং ইসলামী মৌলবাদের হাত ধরে সংগঠিত গণহত্যার পরিসংখ্যানগুলো শিউরে ওঠার মতো। এই দুই আদর্শই তাদের 'ইউটোপিয়া' বা কাল্পনিক স্বর্গ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

কম্যুনিষ্ট শাসনে গণহত্যার পরিসংখ্যান

'দ্য ব্ল্যাক বুক অফ কম্যুনিজম' (The Black Book of Communism) এর গবেষণা অনুযায়ী, বিংশ শতাব্দীতে কম্যুনিষ্ট শাসনের অধীনে প্রায় ৯ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এই মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে ছিল নির্বিচার মৃত্যুদণ্ড, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, শ্রম শিবিরে মৃত্যু এবং

জোরপূর্বক দেশান্তর। এটি বিশ্বের একটি সাড়া জাগানো গ্রন্থ যাতে কমিউনিস্ট শাসনের কালো দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

(Stéphane Courtois & Others - *The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression* (মূল ফরাসি: *Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression*) **অনুবাদক:** Jonathan Murphy and Mark Kramer, Harvard University Press, **১৯৯৯ (Introduction: The Crimes of Communism)।**

অঞ্চল/ শাসন	প্রধান নেতা	নিহতের আনুমানিক সংখ্যা	পরিসংখ্যানের উৎস
সোভিয়েত ইউনিয়ন	জোসেফ স্টালিন	২ কোটি (২০ মিলিয়ন)	*Black Book of Communism*, p. 159
গণচীন	মাও সে তুং	৬.৫ কোটি (৬৫ মিলিয়ন)	*Black Book of Communism*, p. 759
কম্বোডিয়া (খেমার রুজ)	পল পট	২০ লক্ষ (২ মিলিয়ন)	*Black Book of Communism*, p. 1.7-2.0m
উত্তর কোরিয়া	কিম বংশ	২০ লক্ষ (২ মিলিয়ন)	*Black Book of Communism*
ইথিওপিয়া (ডার্গ)	মেঙ্গিস্তু হাইলে মারিয়াম	১৭ লক্ষ (১.৭ মিলিয়ন)	*Black Book of Communism*
আফগানিস্তান (কম্যুনিষ্টরা)	বিভিন্ন	১৫ লক্ষ (১.৫ মিলিয়ন)	*Black Book of Communism*

(The Black Book of Communism - Wikipedia) & (**fee.org** - Book Review ~ The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression)

স্টালিনের আমলে **১৯৩২-৩৩** সালে ইউক্রেনে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ বা **'হলোডোমোর' (Holodomor)** এ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। খেমার রুজ শাসনে মাত্র ৪ বছরে কম্বোডিয়ার মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশকে নিধন করা হয়, যা ইতিহাসে **'কিলিং ফিল্ডস'** হিসেবে পরিচিত। (cambridge.org - Introduction to the Special Issue on the Soviet Famines of 1930–1933)

ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীর গণহত্যা ও সহিংসতা

আধুনিক যুগে ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর গণহত্যার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে মূলত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং তাদের সাথে একমত না হওয়া সাধারণ মুসলমানরা।

হাজারা গণহত্যা (আফগানিস্তান): ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে তালেবানরা মাজার-ই-শরিফ দখল করার পর কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় ২,০০০ থেকে ৮,০০০ হাজারা শিয়া মুসলিমকে হত্যা করে। সাংবাদিক আহমেদ রশিদ একে "গণহত্যামূলক হিংস্রতা" (Genocidal ferocity) হিসেবে অভিহিত করেছেন। (The Risks Facing Hazaras in Taliban-ruled Afghanistan (**extremism.gwu.edu** - The Risks Facing Hazaras in Taliban-ruled Afghanistan)।

ইয়াজিদি গণহত্যা (ইরাক): ২০১৪ সালে আইএসআইএস ইরাকের সিনজারে ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এতে ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ৬,৮০০ নারী ও শিশুকে অপহরণ করা হয়। বহু শিশুকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে শিশু সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। (scholarlycommons.law.northweste/ THE ENDURING GENOCIDE AGAINST THE YAZIDIS: How Iraq's Law on Religious Identity Violates the Human)

তালেবানের বর্তমান সহিংসতা (২০২১-বর্তমান): আফগানিস্তানে তালেবানের দ্বিতীয় শাসনামলেও হাজারাদের ওপর টার্গেটেড হামলা অব্যাহত রয়েছে। ২০২২ সালের এক বোমা হামলায় ৫২ জন হাজারা স্কুলছাত্রী নিহত হয়। (Persecution of Hazaras - Wikipedia), (**ohchr.org/**Systemic Discrimination and Advocacy of Hatred against the Hazara & **pmc.ncbi.nlm.nih.gov/**Mortality and kidnapping estimates for the Yazidi population in the area OF...)।

তাত্ত্বিক সাদৃশ্যের গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - এই দুই মতাদর্শের মধ্যে কেন এত মিল? গবেষকরা মনে করেন, এর পেছনে রয়েছে একটি 'পলিটিক্যাল গনোসিস' (Political Gnosis) বা বিশেষ ধরণের গোপন রাজনৈতিক জ্ঞান। তারা বিশ্বাস করে যে তারা মহাবিশ্বের বা ইতিহাসের চূড়ান্ত রহস্য সমাধান করে ফেলেছে এবং সেই রহস্যের চাবিকাঠি হলো তাদের নির্দিষ্ট

মতাদর্শ। (researchgate.net/Radical Islamism and Totalitarian Ideology: a Comparison of Sayyid...)।

১. আধুনিকতা ও উদারবাদের ঘৃণা - কম্যুনিজম এবং ইসলামী মৌলবাদ—উভয়ই পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে একটি "ব্যর্থ ব্যবস্থা" হিসেবে গণ্য করে। সাইয়্যেদ কুতুব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার সময় পশ্চিমা জীবনযাত্রাকে "বস্তুবাদী মরুভূমি" হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে ইউরোপীয় সৃজনশীলতা মানুষের আত্মাকে হত্যা করেছে. একইভাবে মার্কসও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন। (usna.edu/THE THOUGHT OF SAYYID QUTB, Sayyid Qutb - Wikipedia & academia.edu/Sayyid Qutb's Concept of Jahiliyya as Metaphor for Modern Society)।

২. আন্তর্জাতিকতাবাদের রূপকল্প - মার্কস যেমন বলেছিলেন, "দুনিয়ার মজদুর এক হও", তেমনি কুতুব এবং মওদুদী বিশ্বাস করতেন যে মুসলিমদের কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা থাকতে পারে না। তারা 'উম্মাহ'র ধারণাকে একটি বিশ্বজনীন রাজনৈতিক ব্লকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, যা কম্যুনিষ্টদের 'প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদ' (Proletarian Internationalism) এর সাথে তুলনীয়। উভয়ই বিশ্বাস করে যে, তাদের বিপ্লব এক দেশে সফল হওয়ার পর তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। (1. **is.muni.cz/**Imagined Communities 2. **doi.org/**Appendix 2: preambles in: Constitutional Preambles 3. **repository.cam.ac.uk/**The Political Thought of Tan Malaka - University of Cambridge 4. **publications.hse.ru/**SOCIAL SCIENCES)।

৩. ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর - এই দুই ব্যবস্থাই চায় মানুষকে তার পূর্বের সত্তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত করে একটি 'নতুন মানুষ' (New Man) তৈরি করতে। কম্যুনিষ্টরা চায় 'সোশ্যালিস্ট মানুষ' গড়তে যারা শ্রেণিসচেতন হবে। ইসলামিস্টরা চায় 'আসল মুসলিম' গড়তে যারা কেবল আল্লাহর আনুগত্য করবে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির পরিবার, ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষাকে দলের বা ধর্মের অধীনে নিয়ে আসা হয়। খেমার রুজরা যেমন পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে সন্তানদের রাষ্ট্রীয় ক্যাডার হিসেবে গড়ে তুলেছিল, আইএসআইএস-ও একইভাবে শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে 'খিলাফতের শাবক' তৈরি করেছিল।

(১. The Genocide - Nadia's Initiative

২.https://utppublishing.com/doi/10.3138/gsi.13.2.03)

টোটালিটারিয়ানিজমের একীভূত রূপ - কম্যুনিজম এবং ইসলামি মৌলবাদের তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, তাদের বাহ্যিক খোলস ভিন্ন হলেও অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং মনস্তত্ত্ব অভিন্ন। তারা উভয়েই একটি মনোলিথিক বা একশিলা সমাজ গড়তে চায় যেখানে ভিন্নমতের কোনো অস্তিত্ব নেই। একটি নির্দিষ্ট বইকে চূড়ান্ত প্রাধান্য দেওয়া, একদল কঠোর ক্যাডার বাহিনী গঠন করা এবং বিরোধীদের রক্ত ও সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করা—এই বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে তারা আধুনিক সর্বাত্মকবাদী দর্শনের দুটি সমান্তরাল ধারা।

কম্যুনিষ্টদের ৯ কোটি মানুষের মৃত্যু আর ইসলামী মৌলবাদীদের হাজার হাজার মানুষের গণহত্যা একই ঘৃণার ফসল। তারা যখনই ক্ষমতায় যায়, তখনই স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়ে। সাইয়্যেদ কুতুবের 'মাইলস্টোনস' আর কার্ল মার্কসের 'ম্যানিফেস্টো'—গ্রন্থ যেটাই হোক, যখন তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র চালিকাশক্তি হয়, তখন মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জীবনের নিরাপত্তা অন্তর্হিত হয়।

এই দুই মতাদর্শের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ কেবল একটি তাত্ত্বিক বিলাসিতা নয়, বরং আধুনিক বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। তারা যেভাবে 'মুক্তির' প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে সর্বাত্মকবাদী জাঁতাকলে বন্দী করে, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি। বর্তমানের উইঘুরদের বন্দী শিবির কিংবা তালেবানের অধীনে আফগান নারীদের আর্তনাদ মূলত একই আধিপত্যবাদী দর্শনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এই চরমপন্থী চিন্তাধারা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ, মানবাধিকার এবং ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কাছে আবেদন তারা যেন মৌলবাদী কমিউনিস্ট ও মৌলবাদী ইসলাম থেকে দূরে থাকেন, অপরকে সচেতন করেন এবং সম্ভব হলে মৌলবাদকে প্রতিরোধ করেন। বর্তমান প্রজন্মের সচেতনতা ও প্রতিরোধের প্রকৃতির উপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্য নির্ভরশীল। তাই বিষয়টিকে অবহেলা একদম নয়। (১৯.০৪.২০২৬)

জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।



পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী

আদর্শ পতিব্রতা নারী বসুন্ধরা

- শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল

"বসুন্ধরা" কথার অর্থ পৃথিবী। আজ সেই বসুন্ধরা নামের এক পতিব্রতা নারীর কথা বলব যিনি তাঁর পতিব্রতা মাহাত্ম্যে পৃথিবীতে উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

ভারতীয় সনাতন ধর্মে নারীর জীবন এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে **'পতিব্রতা ধর্ম'** প্রতিষ্ঠিত। শব্দটির মূল তাৎপর্যেই এর পবিত্রতা নিহিত: 'পতি' (স্বামী) এবং 'ব্রত' (সংকল্প বা ব্রত) । পতিব্রতা হলেন সেই নারী যিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর স্বামী এবং বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে একনিষ্ঠ আনুগত্য ও সেবা বজায় রাখার সংকল্প গ্রহণ করেন । এই আদর্শ কেবল গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি স্বামীর প্রতি ঈশ্বরতুল্য ভক্তি ও পূজার ভাব । ধর্মশাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে, একজন আদর্শ পতিব্রতা নারী তাঁর স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করবেন, স্বামী অন্ধ, অসুস্থ, দরিদ্র বা অন্য যেকোনো অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁর নিষ্ঠায় কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না । এই অবিচল ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় নারীর সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি (*তপস*) এবং মহত্ত্ব। প্রাচীনকালে এমনও বলা হয়েছে, যে নারী তাঁর স্বামীকে ছাড়া অন্য কোনো দেবতাকে দেবতা হিসেবে স্বীকার করেন না, তিনিই প্রকৃত পতিব্রতা ।

পতিব্রতা বসুন্ধরা

ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ এবং সুদামার বন্ধুত্ব কেবল একটি আখ্যান মাত্র নয়, বরং এটি মৈত্রী, ভক্তি এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগের এক চিরন্তন মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে সুদামা থাকলেও, যে চরিত্রটি এই সমগ্র যাত্রাকে নেপথ্যে থেকে পরিচালিত করেছেন এবং যার ধৈর্য ও পাতিব্রত্য ধর্ম ঈশ্বরকেও মর্ত্যে নেমে আসতে বাধ্য করেছে, তিনি হলেন সুদামা-পত্নী বসুন্ধরা। বসুন্ধরা চরিত্রটি একজন সাধারণ গৃহবধূর চিত্র নয়, বরং তা নারী শক্তির সেই আধ্যাত্মিক রূপ যা অভাবের অন্ধকারেও ধর্মের আলো জ্বালিয়ে রাখে। বসুন্ধরার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি কেবল সুদামার সহধর্মিণী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সুদামার আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণকারী এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের মূল মাধ্যম।

বৃন্দাপুরী নামক একটি ক্ষুদ্র জনপদে সুদামা ও বসুন্ধরার জীবন ছিল চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। সুদামা এবং তার সখা চক্রধর বৃন্দাপুরীর রাজার দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে মেধার চেয়ে তোষামোদি এবং রাজকীয় দম্ভের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। সুদামা একজন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ হওয়া

সত্ত্বেও কেবল তার আদর্শ এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠার কারণে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এই দারিদ্র্যের সরাসরি অভিঘাত পড়েছিল বসুন্ধরার ওপর। সংসারের ঘানি টানা এবং ক্ষুধার্ত সন্তানদের শান্ত রাখার গুরুদায়িত্ব ছিল তার ওপর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বসুন্ধরার চরিত্রে আমরা কোনো অভিযোগ বা হাহাকার দেখতে পাই না। তার পাতিব্রত্য ধর্ম কেবল স্বামীর সেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল স্বামীর আদর্শের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ।

সুদামা এবং বসুন্ধরার জীবনের এই সংগ্রামের তুলনা করা যেতে পারে নিচের সারণিতে:

ক্ষেত্রের নাম	সুদামার দৃষ্টিভঙ্গি	বসুন্ধরার দৃষ্টিভঙ্গি	আধ্যাত্মিক তাৎপর্য
দারিদ্র্য	পূর্বজন্মের কর্মফল এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে গ্রহণ	ধৈর্যের পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ কিন্তু প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হওয়া	কর্মফল ও পুরুষার্থের মিলন
আদর্শ	অনাহারে থাকলে	আদর্শ বজায় রেখেও	গৃহস্থ ধর্মের
	ও কারো কাছে মাথা নত না করা	পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটানোর প্রয়াস	পালন
কৃষ্ণ-ভক্তি	সখা হিসেবে পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থাকা	কৃষ্ণের কাছে অধিকারের সাথে সাহায্য প্রার্থনার প্ররোচনা	সখ্য ও বাৎসল্য রসের মিলন

সুদামা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঘরে এক ফোঁটা তেলও অবশিষ্ট থাকে না, তখন বসুন্ধরার ধৈর্যের চরম পরীক্ষা হয়। তিনি প্রদীপের তলা থেকে অবশিষ্ট তেলটুকু নিয়ে স্বামীর ক্ষতস্থানে মালিশ করেন। এটি কেবল একটি সেবামূলক কাজ ছিল না, এটি ছিল তার সর্বস্ব অর্পণের প্রতীক। বসুন্ধরার এই নিঃস্বার্থ সেবাই দ্বারকায় বসে শ্রীকৃষ্ণকে বিচলিত করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী যখন দেখেন যে তাদের এক ভক্ত দম্পতি চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, তখন ভগবান স্বয়ং সেই প্রদীপের তেলকে মাখনে পরিণত করেন এবং অলৌকিকভাবে সুদামার ক্ষত

নিরাময় করেন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, বসুন্ধরার পাতিব্রত্য ধর্ম মহাজাগতিক শক্তিকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

বসুন্ধরা জানতেন যে সুদামা অত্যন্ত আত্মসম্মানী এবং তিনি কখনো কারো কাছে কিছু চাইবেন না। কিন্তু বসুন্ধরার যুক্তি ছিল ভিন্ন। তিনি সুদামাকে বোঝান যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়া মানে ভিক্ষা করা নয়, বরং পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন। তিনি সুদামাকে মনে করিয়ে দেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ছোটবেলায় তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকবে, তখন সেই অধিকার প্রয়োগ করা সুদামার কর্তব্য। বসুন্ধরার এই যুক্তিগুলো কেবল বৈষয়িক অভাব মেটানোর জন্য ছিল না, বরং তিনি চেয়েছিলেন তার স্বামী যেন তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর কৃপা লাভ করে জীবনকে সার্থক করেন। সুদামা যখন শেষ পর্যন্ত দ্বারকা যেতে রাজি হন, তখন বসুন্ধরার সামনে নতুন এক সংকট দেখা দেয়। রাজার বাড়িতে যাওয়ার সময় খালি হাতে যাওয়া অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক। কিন্তু তাদের ঘরে এক মুঠো অন্নও ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বসুন্ধরা প্রতিবেশী নিশার কাছ থেকে তিন মুষ্টি তণ্ডুল বা চিঁড়ে ধার করেন। এই তণ্ডল সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত বেদনার। বসুন্ধরা নিজে অভুক্ত থেকে এবং সন্তানদের মুখের গ্রাস বাঁচিয়ে সেই উপহারটুকু জোগাড় করেছিলেন। এই তন্ডুল কণাগুলি কেবল শস্য হিসেবে নয়, বরং বসুন্ধরার হৃদয়ের প্রেম ও ত্যাগের নির্যাস হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে ।

বসুন্ধরার চরিত্রটিকে কয়েকটি স্তরে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যা তাকে সাধারণ পৌরাণিক নারী চরিত্র থেকে আলাদা করে তোলে:

মানসিক দৃঢ়তা: যখন সুদামা নিজের কর্মফলকে দোষারোপ করে ভেঙে পড়তেন, তখন বসুন্ধরা তাকে আধ্যাত্মিক বল প্রদান করতেন।

ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তা: প্রতিবেশী থেকে তন্দুল সংগ্রহ করা বা স্বামীকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করার মধ্যে তার বাস্তববোধ ফুটে ওঠে।

নিষ্কাম প্রার্থনা: তিনি কৃষ্ণের কাছে নিজের জন্য কোনো স্বর্ণ বা ঐশ্বর্য চাননি; তিনি চেয়েছিলেন তার স্বামীর সম্মান এবং সন্তানদের ক্ষুধা নিবৃত্তি।

সুদামা যখন দ্বারকার পথে যাত্রা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তর্যামী সত্তা দিয়ে বসুন্ধরার কষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে ‘মুরলী মনোহর’ হয়ে সুদামার সেবা করতে আসেন । এখানে একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো, শ্রীকৃষ্ণ বারবার বসুন্ধরার কথা আলোচনা করেন। তিনি সুদামাকে বলেন যে, তার স্ত্রী যে তন্দুল পাঠিয়েছেন তা সাধারণ কোনো উপহার নয়, তা হলো মা লক্ষ্মীর প্রিয় অমৃত। শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদামাকে আহার করান এবং তার সেবা করেন, তখন তিনি বারবার

'বৌদি' বা 'ভাজ' (বসুন্ধরা) এর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মুরলী মনোহর যখন সুদামার পা টিপে দেন এবং তাকে বিছানা করে দেন, তখন তিনি আসলে বসুন্ধরার সেই ত্যাগের প্রতিদান দিচ্ছিলেন যা বসুন্ধরা বৃন্দাপুরীতে বসে সুদামার জন্য করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন যে তিনি এই রূপ ধারণ করেছেন কেবল তার ভক্তের আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য। বসুন্ধরা বাড়িতে বসে যে নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা করছিলেন, তার ফলেই ভগবানকে বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষের মতো পথপ্রান্তরের সেবা করতে হয়েছে।

সুদামার দ্বারকায় আগমন করেন এবং দ্বারকার ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্য দেখে সুদামা অভিভূত হন, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে বসুন্ধরা এবং সন্তানদের করুণ অবস্থার কথা ভেসে ওঠে। দ্বারকার নাগরিকরা যখন সুদামার জীর্ণ বসন দেখে উপহাস করে এবং তাকে 'পাগল' বলে সম্বোধন করে, তখন সুদামা নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বসুন্ধরার প্রতিটি অশ্রুবিন্দুর হিসাব রাখছিলেন, তিনি সমস্ত রাজকীয় প্রথা ভেঙে নগ্নপদে দৌড়ে আসেন তার সখাকে আলিঙ্গন করতে।

এই মিলন কেবল দুই বন্ধুর মিলন ছিল না, এটি ছিল বসুন্ধরার বিশ্বাসের জয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদামাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজের অশ্রু দিয়ে তার পা ধুইয়ে দেন, তখন সেই অশ্রুজলে বসুন্ধরার বহু বছরের দুঃখ-বেদনা ধুয়ে মুছে যাচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে বলেন যে, তিনি যদি আরও আগে আসতেন তবে বসুন্ধরাকে এতদিন কষ্ট পেতে হতো না। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সংলাপে বসুন্ধরার প্রতি যে শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে, তা অতুলনীয়। তিনি সুদামাকে মনে করিয়ে দেন যে, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যের চেয়েও সুদামার জীর্ণ কুটিরের ভক্তি তার কাছে বেশি মূল্যবান। সুদামা যখন লজ্জায় বসুন্ধরার দেওয়া সেই চালের পুঁটলিটি লুকিয়ে রাখতে চাইছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তা জোর করে কেড়ে নেন। তিনি যখন প্রথম মুষ্টি চাল মুখে দেন, তখন তিনি সুদামাকে (এবং পরোক্ষভাবে বসুন্ধরাকে) স্বর্গের ঐশ্বর্য দান করেন। দ্বিতীয় মুষ্টি চাল খাওয়ার সাথে সাথে তিনি তাকে মর্ত্যের সমস্ত রাজসুখ প্রদান করেন। কিন্তু যখন তিনি তৃতীয় মুষ্টি চাল মুখে দিতে যান, তখন দেবী রুক্মিণী তার হাত চেপে ধরেন। রুক্মিণী জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদি তৃতীয় মুষ্টিও খেয়ে ফেলেন, তবে তিনি নিজের বৈকুণ্ঠ ধামটিও সুদামা-বসুন্ধরাকে দিয়ে দেবেন। এই ঘটনার তাৎপর্য হলো - ভগবান বস্তু দেখেন না, দেখেন ভাব। বসুন্ধরার পাঠানো সামান্য চাল শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছাপ্পান্ন ভোগের চেয়েও প্রিয় ছিল, কারণ এতে বসুন্ধরার উপবাসের বেদনা মিশে ছিল। রুক্মিণী (মা লক্ষ্মী) হস্তক্ষেপ করেছিলেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন বসুন্ধরা যেন মর্ত্যেই তার পাতিব্রত্যের ফল ভোগ করেন, এখনই যেন বৈকুণ্ঠের লয় না ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার

করেন যে বসুন্ধরা তার সর্বস্ব দান করেছেন, তাই ভগবানকেও তার সর্বস্ব দিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

সুদামা যখন দ্বারকায়, তখন বৃন্দাপুরীতে দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং বসুন্ধরার সামনে আবির্ভূত হন। এই সাক্ষাৎকারের সময় বসুন্ধরা নিজের রূপ বা যৌবন নিয়ে কোনো আক্ষেপ করেননি। কিন্তু মা লক্ষ্মী তাকে সৌন্দর্যের এক গভীর দর্শন বোঝান। দেবী বলেন যে, সৃষ্টিকে সচল রাখতে গেলে আকর্ষণ এবং লাবণ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমন ফুলের সুগন্ধ মৌমাছিকে আকর্ষণ করে, তেমনি স্ত্রীর রূপ এবং মাধুর্য স্বামীর চিত্তকে প্রফুল্ল রাখে এবং সংসারে শান্তি বজায় রাখে। বসুন্ধরা যখন বলেন যে রূপ তো নশ্বর এবং তা সময়ের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়, তখন দেবী লক্ষ্মী তাকে **'চিরযৌবন' (Chir-Yauvana)** এর বর প্রদান করেন। দেবী বলেন যে বসুন্ধরা বার্ধক্যের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত থাকবেন এবং তার সৌন্দর্য চাঁদের মতো অম্লান থাকবে যা কোনো অন্ধকার রাতেও ঢাকা পড়বে না। এই বরটি কেবল একটি দৈহিক পুরস্কার ছিল না, এটি ছিল বসুন্ধরার অন্তরের পবিত্রতার একটি বাহ্যিক প্রতিফলন। যে নারী দারিদ্র্যের কদর্যতার মধ্যেও নিজের মনকে পবিত্র রেখেছিলেন, তাকে ঈশ্বর শাশ্বত সৌন্দর্য দান করলেন।

সুদামার বৃন্দাপুরীতে ফেরার দৃশ্যটি এক অভাবনীয় অলৌকিকতায় পূর্ণ। সুদামা যখন ফিরে আসেন, তিনি তার সেই জীর্ণ কুটির খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তার জায়গায় তিনি দেখেন এক বিশাল স্বর্ণপ্রাসাদ। কেবল তার বাড়ি নয়, পুরো বৃন্দাপুরী গ্রামটিই এখন এক স্বর্গীয় নগরীতে পরিণত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে পাঠিয়ে এই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এখানেও বসুন্ধরার চরিত্রের এক মহত্তম দিক ফুটে ওঠে। যখন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বসুন্ধরাকে প্রাসাদ দিতে চেয়েছিলেন, বসুন্ধরা বলেছিলেন যে তার প্রতিবেশীরা যদি কুঁড়েঘরে থাকে তবে তিনি একা প্রাসাদে থাকবেন না। তার এই সর্বজনীন প্রেমের কারণেই শ্রীকৃষ্ণ পুরো গ্রামটিকেই প্রাসাদে রূপান্তরিত করে দেন। সুদামা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তিনি নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারছিলেন না। মা লক্ষ্মীর বরে বসুন্ধরা তখন দেবী রুক্মিণীর মতোই সুন্দরী এবং জৌলুসময়ী হয়ে উঠেছিলেন। বসুন্ধরা তখন সুদামাকে মনে করিয়ে দেন যে, এই রূপ এবং ঐশ্বর্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের করুণা এবং তাদের ধৈর্যের ফল।

সুদামার প্রত্যাবর্তনের পর সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র দেখা যায়। বৃন্দাপুরীর সেই অহংকারী রাজা এখন সুদামার চরণে লুটিয়ে পড়েন এবং তাকে রাজগুরু হিসেবে বরণ করেন। সুদামার সখা চক্রধর, যিনি বিপদের দিনেও সাথে ছিলেন, তিনিও এখন এই ঐশ্বর্যের অংশীদার হন। এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও সুদামা ও বসুন্ধরা কিন্তু বিলাসিতায় মত্ত হননি। সুদামা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন

যেন এই 'মায়া' তাকে তার ভক্তির থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

বসুন্ধরা চরিত্রটি আমাদের শেখায় যে, পতিব্রত্য মানে কেবল স্বামীর আজ্ঞাবহ হওয়া নয়, বরং তা হলো স্বামীর আদর্শের সহযাত্রী হওয়া। বসুন্ধরা যদি সেদিন সুদামাকে দ্বারকা যেতে বাধ্য না করতেন, তবে সুদামার ভক্তি হয়তো জগতের সামনে এভাবে প্রকাশিত হতো না। বসুন্ধরা ছিলেন সেই শক্তি যা সুদামার সুপ্ত ভক্তিকে কর্মে রূপান্তরিত করেছিল।

তার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি প্রধান শিক্ষা পাই।

১। **অভাবের মধ্যেও স্বভাব বজায় রাখা:** চরম দারিদ্র্য তাকে অসৎ পথে চালিত করতে পারেনি।

২। **নিঃস্বার্থ সেবা:** স্বামীর প্রতি তার সেবা ছিল কোনো প্রতিদান ছাড়াই, যার ফলে ভগবান নিজেই তার ঋণী হয়ে পড়েছিলেন।

৩। **আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা:** তিনি জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ কেবল একজন রাজা নন, তিনি হলেন পরমেশ্বর ।

বসুন্ধরার 'চিরযৌবন' পাওয়ার ঘটনাটি রূপক হিসেবেও দেখা যেতে পারে। তার ভক্তি এবং চরিত্র ছিল চিরসবুজ, যা কখনো ম্লান হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা উপাখ্যানের এই দীর্ঘ আলোচনায় বসুন্ধরার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি প্রমাণ করেছেন যে একটি সুখী এবং সার্থক সংসারের মূলে থাকে নারীর ধৈর্য, বুদ্ধি এবং গভীর ঈশ্বরভক্তি।

'পতিব্রতা বসুন্ধরা'র এই ইতিবাচক প্রবন্ধটি শেষ করার আগে এটি বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী কেবল গৃহিণী নন, তিনি হলেন 'গৃহলক্ষ্মী'। বসুন্ধরা তার দারিদ্র্যপীড়িত কুটিরকে নিজের চরিত্র দিয়ে মন্দিরে পরিণত করেছিলেন, যার ফলে মা লক্ষ্মী সেই গৃহে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুদামার বন্ধুত্ব যদি এক দিগন্ত হয়, তবে বসুন্ধরার ত্যাগ হলো সেই আকাশ যা সেই দিগন্তকে ধারণ করে আছে। এই আখ্যানটি আজও আমাদের সমাজে এক বিশাল অনুপ্রেরণা, যা শেখায় যে অভাব সাময়িক কিন্তু আদর্শ এবং ভক্তি চিরস্থায়ী। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করার জন্য কেবল মন্ত্র জপ যথেষ্ট নয়, বসুন্ধরার মতো জীবন যুদ্ধে অবিচল থেকে নিজের ধর্ম পালন করাও এক প্রকার পরম উপাসনা। বসুন্ধরার এই কাহিনী কেবল অতীতের গল্প নয়, এটি বর্তমানের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করা প্রতিটি মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। তার ধৈর্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অটল বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত তাকে এবং তার পরিবারকে চরম দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়ে পরম আনন্দের পথে নিয়ে গিয়েছিল। পতিব্রতা বসুন্ধরা তাই কেবল এক পৌরাণিক চরিত্র নন, তিনি হলেন প্রতিটি ভারতীয় নারীর আদর্শের এক অবিনশ্বর প্রতিচ্ছবি।

পতিব্রতা আদর্শ ভারতীয় সমাজে নারীর শক্তি, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার এক চিরন্তন প্রতীক। বৈদিক জ্ঞানের পথ থেকে শুরু করে মহাকাব্যের অলৌকিক শক্তি অর্জন, কিংবা ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন—প্রতিটি যুগেই এই আদর্শ নারীর মহত্ত্বকে নতুন উচ্চতা দিয়েছে। আজকের সমাজে যখন পারিবারিক বন্ধনগুলি শিথিল হচ্ছে, তখন পতিব্রতা আদর্শের মূল শিক্ষা: নিঃশর্ত প্রেম, কর্তব্যবোধ, এবং সংকল্পের শক্তি — এই মূল্যবোধগুলিই পারে দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করে একটি সুখী এবং স্থিতিশীল সমাজ গঠন করতে। তাই এই সময়ের সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীদের কাছে আমার আবেদন - আপনারা পতিব্রতা নারীদের জীবনী পাঠ করে পতিব্রতা আদর্শ অনুশীলন করুন এবং পরিবার ও সমাজকে মজবুত করুন। পতিব্রতা বসুন্ধরার চরিত্র আপনাদের আদর্শ হোক। **জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।।**



কবিতা

“ছন্দের খোঁজে”

- বরুনাংশু গায়েন
হলদিয়া, মেদিনীপুর।

ছন্দ মেলানো বড়ই কঠিন
আমি তেমন পারি না,
ছন্দের ভাঁজ বড়ই জটিল
কিভাবে মিলাবো তাই খুঁজে পাই না।

ছন্দ মেলানো বড়ই কঠিন
তবু মনে জাগে আশা,
শব্দগুলো এলোমেলো হয়,
তবু লিখি ভালোবাসা।

কলম ধরি কাঁপা হাতে,
ভাবনা থাকে ভিড়ে,
মনের কথা ধরতে গিয়ে
হারাই নিজের নীড়ে।

ছন্দের ভাঁজ বড়ই জটিল,
তবু মনটা চায়,
অল্প কথায় গভীর অনুভব
কবিতায় রঙ ছায়।

যদি মিল না পায়ও শব্দ,
থেমে যাই না তাই,
মনের ভাষাই সেরা কবিতা—
ছন্দ খুঁজে নেয় আমায়।

*****

সাংগঠনিক খবর - ২০২৬

১। বক্তা হিসাবে সভাপতিকে আমন্ত্রণঃ

২০২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী, রবিবার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত হেমনগর গ্রামে অনুষ্ঠিত কল্পগঙ্গা ও কপিলমেলা প্রাঙ্গণে **"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান"** বিষয়ক আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হন সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। তিনি ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সেই দিন বক্তৃতা দেন। মঞ্চ থেকে নামার পর একজন বয়স্ক ব্যাক্তি শ্রীমণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ঐ বয়স্ক ব্যাক্তি একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী বলে নিজের পরিচয় দেন। সময় স্বল্পতার কারণে আলোচনা বেশিক্ষণ চালানো সম্ভব হয়নি। কারণ শ্রীমণ্ডল বক্তৃতার পর তাঁর বারাসাত নিবাসে ফিরে আসার তাড়া ছিল। ঐদিন একাদশী তিথি থাকায় শ্রীমণ্ডল মহাশয় উদ্যোক্তাদের কোনও আতিথেয়তা স্বীকার করতে পারেননি। রাত ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ তিনি তাঁর গৃহে ফিরে আসেন।



২। সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন

২০২৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী, রবিবার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সদর শহর বারাসাতে নপাড়া রাসবিহারী স্কুল ফর গার্লস প্রাঙ্গণে **'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র তৃতীয়** বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক **শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়।** মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি ও বক্তা **শ্রীকৃষ্ণকুমার সরকার** এবং **শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার মহাশয়।** এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য মোট ৩৩ জন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাম নথিভুক্ত করেন। মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আমন্ত্রিতসহ মোট ৩২ জন উপস্থিত হন।

সমবেত কণ্ঠে **বেদমন্ত্র উচ্চারণ** ও **মোমবাতি প্রজ্জলনের** মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। **মোমবাতি প্রজ্জলন** করেন সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের মহিলা সদস্য শ্রীমতি সোনালী মণ্ডল মহাশয়া। মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সম্মেলনের প্রধান অতিথি তথা প্রধান বক্তা ছিলেন ড. কৃষ্ণকুমার সরকার। তাঁকে উত্তরীয় দিয়ে **বরণ** করেন সংগঠনের সভাপতি এবং **পুস্পস্তবক, গীতা,**

স্বাগতসামগ্রী ও উপহার অতিথির হাতে তুলে দেন যথাক্রমে শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল, শ্রীসাত্ত্বিক মণ্ডল, শ্রীনরেশ তরফদার ও শ্রীরাজেস বৈদ্য মহাশয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সংগঠনের সদস্য **শ্রীচিরন্তন মণ্ডল মহাশয়।** ভাষণ অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়। তাঁর বক্তৃতায় সংগঠনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা চিত্রিত হয়। এরপর **এই সম্মেলনে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের মুখপত্র 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণের' দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।** মহাত্মা রাইচরণ সরদারের আত্মজীবনী থেকে নেওয়া সংগঠনের জন্য **"আত্মজাগরণ মন্ত্র"** সমবেতভাবে পাঠ করা হয়। এরপর বক্তৃতা দেন শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার মহাশয় এবং **"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাগাঁথা"** নামক কবিতা পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি। সম্মেলনের প্রাধান অতিথি তথা **প্রধান বক্তা ড. কৃষ্ণকুমার সরকার মহাশয় "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান"** বিষয়ক একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শ্রোতারা সমৃদ্ধ হন এবং অনেকে বক্তাকে প্রশ্নও করেন যা বক্তৃতার গ্রহণযোগ্যতা নির্দেশক। আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে **শ্রীঅশোক বৈদ্য মহাশয়** মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং ভবিষ্যতে পুস্তক প্রকাশের জন্য **আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি** দেন। মেদিনীপুর থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় মিহিরকুমার গায়েন মহাশয়ের পৌত্র **শ্রীশুভেন্দু গায়েন মহাশয়** আগত প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা দেন এবং তাঁর ঠাকুরদাদার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের বিষয়টি পত্রিকায় ছাপার জন্য সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান। **প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীদেবাশীষ জোয়ারদার, শ্রীভবেশচন্দ্র হাউলি, এডভোকেট শ্রীকার্ত্তিক সরকার, শিক্ষক শ্রীকার্ত্তিক মণ্ডল, এডভোকেট শ্রীমিল্টন সরকার, শিক্ষক শ্রীচন্দ্রশেখর মণ্ডল, শিক্ষক শ্রীতপন বৈদ্য** প্রমুখ তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সাংগঠনিক আলোচনায় **সভাপতির দায়িত্ব** হস্তান্তরের ইচ্ছা সভা অনুমোদন করেনি। আরও অন্তত একবছর দায়িত্ব পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। **বিগত দিনের কয়েকজন সদস্যের অনুপস্থিতি ও আচরণ নিয়ে সভায় প্রশ্ন উঠে।** সভায় অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়। শ্রীদেবাশিষ জোয়ারদার, শ্রীসত্যপদ মণ্ডল এবং শ্রীভবেশ হাউলি মহাশয় **সহ-সভাপতির** দায়িত্ব পান। **সম্পাদক** হিসাবে শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল ও শ্রীতপন বৈদ্য মহাশয়কে বেছে নেওয়া হয়। ছয় জনকে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়, মূলত যারা জেলার দায়িত্বে তাদেরকে এইপদে রাখা হয়। **কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব** দেওয়া হয় শ্রীঅশোক বৈদ্য মহাশয়কে। **মোট ২৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি** গঠিত হয়। **জেলার দায়িত্ব** পান শ্রীশুভেন্দু গায়েন (মেদিনীপুর), শ্রীমনুদেব গায়েন (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার (নদীয়া) এবং শ্রীকার্ত্তিক সরকার মহাশয় (উত্তর ২৪ পরগণা)। **বসিরহাট লোকসভার দায়িত্ব** দেওয়া হয় শ্রীভবেশ হাউলি মহাশয়কে। শ্রীসত্যপদ মণ্ডল মহাশয় **বাগদা বিধান সভার দায়িত্ব** পান। শ্রীভবেশ

হাউলি মহাশয় এবং শ্রীসত্যপদ মণ্ডল মহাশয়, দুজন পর পর তিনবার সংগঠনের তিনটি সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সভার প্রশংসা অর্জন করেন এবং সংগঠন থেকে তাদের **পুরস্কৃত করা হয়।** অন্যান্য যারা বিধানসভা ভিত্তিক ও বিভিন্ন সেলের দায়িত্ব পান তারা হলেন **শ্রীমুকেশ মণ্ডল** (বনগাঁ), **শ্রীশুভজিত মণ্ডল** (হাবরা), **শ্রীতপন কুমার বাছাড়** (গাইঘাটা), **শ্রীবারীন্দ্র মণ্ডল** (মহিষাদল), **শ্রীচন্দ্রশেখর মণ্ডল** (বারাসাত), **শ্রীঅশোক কুমার বৈদ্য** (মধ্যমগ্রাম), **শ্রীমতী সীতারাণী গায়েন** (হিঙ্গলগঞ্জ), **শ্রীনিশীথ কয়াল** (উচ্চ শিক্ষা ও সেমিনার), **শ্রীকার্ত্তিক মণ্ডল** (স্কুল শিক্ষা), **শ্রীঅসীম মণ্ডল** (প্রাইমারী শিক্ষা), **শ্রীচিরন্তন মণ্ডল** (শিক্ষাকর্মী), **শ্রীমিল্টন সরকার** (ল'সেল), **শ্রীমতী পলি সরকার** (দেবী বাহিনী) এবং **শ্রীরাজেস বৈদ্য** (পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনা)। শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল এবং শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল যথাক্রমে **পত্রিকার সম্পাদক ও সহ-সম্পাদিকারূপে** পূর্ববৎ বহাল থাকেন। সাংগঠনিক পর্বের আলোচনা পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি। এরপর সভাপতি এক অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দায়িত্বপ্রাপ্তদের করণীয় বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেন। সভাপতি বক্তৃতার শেষে আগত সকল সদস্যকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। **শ্রীচিরন্তন মণ্ডল মহাশয়** সম্মেলনের বহু দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করায় তাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বিদ্যালয়ের কর্মী **লক্ষণদা** রান্নার দায়িত্ব নিয়ে সভাপতির কৃতজ্ঞতাভাজন হন। শ্রীমতি সোনালী মণ্ডল এবং শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডলও নানা দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে সভাপতির কৃতজ্ঞতাভাজন হন। **শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল** মহাশয় সম্মেলনে উপস্থাপকের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেন। নির্ধারিত সময়ের প্রায় একঘণ্টা পরে সকলের সমবেতভাবে কল্যাণমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে মঞ্চানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তারপর সকলে মধ্যাহ্ন ভোজনে অংশ নেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পদ ছিল - **বাসমতী চালের ভাত, সবজি ডাল, ঝুরি আলু ভাজা, পনিরের তরকারী, কাতলা মাছের কালিয়া, খাসীর মাংস, চাটনি, পাঁপড়, রসগোল্লা, সন্দেশ ও হজমোলা।** প্রত্যেকের জন্য জলের বোতলের ব্যবস্থা ছিল। সকালে **চা ও টিফিনের** ব্যবস্থা ছিল এবং সম্মেলন চলাকালীন **কফি ও বিস্কুটের** ব্যবস্থা ছিল। অনেকে আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা দেখে অনেকে আপ্লুত হন এবং নানারকম প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। সভাপতি সদস্যদের জানান "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা রাজার জাতি তাই ব্যবস্থা রাজকীয়"। **লক্ষণদা, লক্ষণদার স্ত্রী, শ্রীচিরন্তন মণ্ডল মহাশয় পরিবেশন করেন।** সবশেষে সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল, সদস্যা শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল, লক্ষণদা, লক্ষণদার স্ত্রী এবং শ্রীচিরন্তন মণ্ডল মহাশয় ভোজন করলে ভোজন পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

২৫/০১/২০২৬, বারাসাতে, "সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ" আয়োজিত তৃতীয় সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের নামের তালিকাঃ

1. শ্রীভবেশচন্দ্র হাউলি - টাকি
2. শ্রীকার্ত্তিক মণ্ডল - টাকি
3. শ্রীসত্যপদ মণ্ডল - বাগদা
4. শ্রীনরেশচন্দ্র তরফদার - নদীয়া
5. শ্রীচিরঞ্জিত পাল - গোপালনগর, বনগাঁ
6. শ্রীশুভ বালা - বনগাঁ
7. শ্রীসাত্ত্বিক মণ্ডল - বারাসাত
8. শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল - বারাসাত
9. শ্রীরাজেশ বৈদ্য - বনগাঁ
10. শ্রীচয়ন দাস - বনগাঁ
11. শ্রীশুভেন্দু গায়েন - হলদিয়া
12. শ্রীবারীন্দ্র মণ্ডল - মহিষাদল
13. শ্রীসতীশ সরকার - বারাসাত
14. শ্রীআশোক কুমার বৈদ্য - মধ্যমগ্রাম
15. শ্রীকৃষ্ণ কুমার সরকার- গড়িয়া
16. শ্রী মিল্টন সরকার - গোবরডাঙ্গা
17. শ্রীচিরন্তন মণ্ডল - বারাসাত
18. শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল - বারাসাত
19. শ্রীমুকেশ মণ্ডল - বাগদা
20. শ্রীদেবাশিস জোয়ারদার - হৃদয়পুর
21. শ্রীচন্দ্রশেখর মণ্ডল - বারাসাত
22. শ্রীমনুদেব গায়েন - ভাঙ্গড়
23. শ্রীতপন বৈদ্য - বারাসাত
24. শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সরকার - বারাসাত
25. শ্রীনিশীথ কয়াল - বারাসাত
26. শ্রীসুকুমার মণ্ডল - হাবড়া
27. শ্রীশিবাজি মণ্ডল - বনগাঁ
28. শ্রীশুভজিত মণ্ডল - হাবড়া
29. শ্রীঅসীম মণ্ডল - হাবড়া
30. শ্রীতপন কুমার বাছাড় - গাইঘাটা

আয়োজকঃ

শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল





















"বর্বরদের কোনও ইতিহাস থাকেনা"
- মহাত্মা রাইচরণ সরদার
পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট


POUNDRAKSHATRIYA
INDRAKSHATRIYA SAMAJ
DATE:
JANUARY, 2026
TIME: 10 A.M.


JAY POUNDRAKSHATRIYA
POUNDRAKSHATRIYA SAMAJ
DATE:
TIME: 10 A.M.


BHARAT JAY POUNDRAKSHATRIYA
TIME: 10 A.M.
















SARBA BHARATIYA POUNDRAKSHATRIYA SAMAJ
2020
















JAY POUNDRAKSHATRIYA
DATE:
TIME: 10 A.M.










JAY POUNDRAKSHATRIYA
POUNDRAKSHATRIYA SAMAJ
DATE:
JANUARY
TIME: 10 A.M













সাংগঠনিক সভাঃ

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

০৪/০২/২০২৬

অনলাইন আলোচনা সভা

০৪.০২.২০২৬ বুধবার, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচিত কমিটির প্রথম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুগুল মিটে অর্থাৎ অনলাইনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। বেদ মন্ত্র পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বেদ মন্ত্র পাঠ করেন মেদিনীপুরের হলদিয়া থেকে কুমারী কমলিকা গায়েন। তিনি শ্রীশুভেন্দু গায়েন মহাশয়ের কন্যা। শ্রীশুভেন্দু গায়েন হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় মিহির কুমার গায়েনের পৌত্র এবং সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, মেদিনীপুর জেলার কনভেনর। বেদমন্ত্র পাঠের পর সভা পরিচালনা করেন সভাপতি এবং একে একে উপস্থিত পদাধিকারীরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রথমে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল মহাশয়। তিনি শুধুমাত্র জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে শ্রীতপন বৈদ্য মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করেন। আর কিছু বলেননি। এরপর বক্তব্য রাখেন অন্যতম সম্পাদক শ্রীতপন বৈদ্য মহাশয়। তিনি আঞ্চলিকভাবে সংগঠনের বিস্তার, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সম্মান জানানো, গুণী ব্যক্তিদের যুক্ত করা, ডাক্তার শ্রেণীকে যুক্ত করা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলেন। তিনি আয় বুঝে ব্যয় করার কথা বলেন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচারের প্রশংসা করেন। এরপর মেদিনীপুরের জেলা কনভেনর শ্রীশুভেন্দু গায়েন মহাশয় বক্তব্য রাখেন এবং তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরিচিতদের মাধ্যমে সংযোগ গড়ে তুলছেন বলে জানান। সংগঠনের অন্যতম সক্রিয় সদস্য প্রাথমিক শিক্ষা সেলের কনভেনর শ্রীঅসীম মণ্ডল মহাশয় তাঁর বক্তব্যে হোয়াটসঅ্যাপে নদীয়া জেলা গ্রুপ এবং শিক্ষা সেলের গ্রুপ খোলার কথা জানান। তিনি বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং কথা বলছেন বলে জানান। তিনি সংগঠন থেকে দেওয়া প্রচারপত্র বিলি করছেন বলেও জানান। তাঁর বক্তব্যে SIR প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। সংগঠনের বর্ষীয়ান সদস্য ও সহ-সভাপতি শ্রীদেবাশিস জোয়ারদার মহাশয় বক্তব্যের শুরুতে বলেন বিন্দুতে সিন্ধু হয়। ধীরে ধীরে বাড়বে। তিনি মৌখিকভাবে অনেকের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাতে কথা বলবেন বলে জানান। এরপর সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ

শ্রী অশোক বৈদ্য মহাশয় তাঁর মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনিও তপনবাবুর মত সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সংগঠনের বৃদ্ধি হতে পারে বলে মত প্রদান করেন। তিনি তাঁর পরিমণ্ডলে অনেকের সাথে কথা বলেছেন এবং অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন - কী কী কাজ হয়েছে ? তিনি তাদের বই প্রকাশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবদান ইত্যাদি তুলে ধরে তাদের মোটিভেটেড করার চেষ্টা করেন এবং তারা অনেকে মোটিভেটেড হয়েছে বলে জানান। তিনি অন্যদেরও এটা অনুসরণ করতে বলেন। তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নানা সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশনের কথা বলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এলাকায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষক নেই বলে তিনি জানান। সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রবেশের মাধ্যমে সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধির কথা বলেন। সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের হাবড়া বিধান সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীশুভজিৎ মণ্ডল মহাশয় ছিলেন এই মিটিং-এ অংশগ্রহণকারী সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য। তিনি বলেন এই সংগঠন থেকে পাওয়ার কিছু নেই বরং নিজ সমাজকে নিঃস্বার্থভাবে দিতে হবে। তিনি হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ খুলে যোগাযোগ হওয়া মানুষদের মোটিভ বোঝার চেষ্টা করছেন এবং ইতিবাচকদের পরে গ্রুপে যুক্ত করবেন বলে জানান। হাবড়া, বনগাঁ অথবা গাইঘাটা যেকোনোও একটি জায়গায় তারা সভা করবেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন - আমরা সচেতন নই, আবেগ তৈরি করতে হবে যাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা আপ্লুত হয়ে এই সংগঠনে যুক্ত হয়। তিনি আরও বলেন সংগঠনে যুবদের যুক্ত করতে হবে, সমাজ মাধ্যমে প্রচার করতে হবে, বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে বেশী মানুষ জানতে পারে। গাইঘাটায় সভা হতে পারে বলে তিনি পুনরায় জানান। তাঁর বক্তব্যে SIR প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয় এবং এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপর SIR-এর প্রভাব পড়তে চলেছে। এরপর বারাসাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর মণ্ডল বক্তব্য রাখেন এবং বারাসাতে একটি সভার আয়োজন করতে ইচ্ছুক বলে জানান। এব্যাপারে তিনি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন বলেও জানান। এরপর মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীবারীন্দ্র মণ্ডল মহাশয় বক্তব্য রাখেন। তিনি মেদিনীপুরের বিভিন্ন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত অঞ্চলে আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন বলে জানান। সভায় শিক্ষাকর্মী সেলের কনভেনর শ্রীচিরন্তন মণ্ডল মহাশয় দীর্ঘসময় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে

যায়; সেই কারণে তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

সভায় সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের বক্তব্য শেষ হলে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকল সদস্যদের বলা বক্তব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে শ্রীতপন বৈদ্য মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করেন সেটি অনুমোদন করেন এবং অনেকে স্বাগত জানান। তারপর তিনি সকল সদস্যের পেশ করা মূল বক্তব্যের পর্যালোচনা করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সদস্যদের গ্রহণ করতে বলেন - ১) বিভিন্ন স্তরের সংগঠন নিজেদের মত করে সামাজিক কাজ করতে পারবে। কাজের আগে তাদের ঊর্ধ্বতন সংগঠনের কর্মকর্তাদের অনুমতি নিতে হবে। ২) নিজেরা আয় বুঝে ব্যয় করবেন। ৩) কৃতী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা জানানো যাবে - যে স্তরের কৃতী সেই স্তরের সংগঠনের মাধ্যমে। বিধানসভা স্তরের কৃতীকে বিধানসভা কমিটি, জেলা স্তরের কৃতীকে জেলা কমিটি এবং রাজ্যস্তরের কৃতীকে কেন্দ্রীয় কমিটি সংবর্ধনা দেবে। ৪) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনদের সংগঠনে যুক্ত করার চেষ্টা অতীতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেটা অব্যাহত থাকবে। ৫) প্রচার বৃদ্ধির জন্য আর একটি ওয়েবসাইট ইংরেজিতে তৈরি করা হবে। ৬) কেউ যদি দায়িত্ব নিয়ে সংগঠনের নামে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেন, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। ৭) প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্তকে আয় বুঝে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ৪) নতুন গ্রুপ সংগঠনের নামে খুলতে হবে। যেমন - সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, হাবরা ব্রাঞ্চ, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, বনগাঁ শাখা ইত্যাদি। ৯) সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে। ১০) যদি কোনও স্তরের সংগঠনে সদস্য সংখ্যা বেশী থাকে তাহলে তারা সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের পক্ষে উপযুক্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন বা দাবী পেশ করতে পারবেন। ডেপুটেশন বা দাবী পেশের আগে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদককে অবশ্যই অবহিত করতে হবে। ১১) যুবদের যুক্ত করার জন্য শ্রীশুভজিত মণ্ডলকে অতিরিক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এবং একজন দক্ষ যুবকে খুঁজে দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ১২) অনুমতি নিয়ে বিধানসভা ভিত্তিক সভা বা সম্মেলন করা যাবে। ১৩) সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মুখপত্র "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণে"র জন্য সকলকে লেখা জমা দিতে অনুরোধ করা

হয়। ১৪) ১৮ই মার্চ মহাত্মা রাইচরণ সরদারের জন্মদিনে একটি অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং এ বিষয়ে সম্পাদকদের উদ্যোগ নিতে বলা হয়।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয় সকলের কাছে আর কোনও জিজ্ঞাস্য আছে কী না জানতে চান। কিন্তু কেউ কোনও প্রশ্ন করেননি। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান। কল্যাণমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

২৮/০৩/২০২৬

অনলাইন আলোচনা সভা (সেমিনার)

মহাত্মা রাইচরণ সরদারঃ জীবন ও কর্ম

২৮.০৩.২০২৬ শনিবার, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আয়োজনে "মহাত্মা রাইচরণ সরদারঃ জীবন ও কর্ম" নামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুগুল মিটে অর্থাৎ অনলাইনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। বেদ মন্ত্র পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বেদ মন্ত্র পাঠ করেন মেদিনীপুরের হলদিয়া থেকে কুমারী কমলিকা গায়েন। তিনি শ্রীশুভেন্দু গায়েন মহাশয়ের কন্যা। শ্রীশুভেন্দু গায়েন হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় মিহির কুমার গায়েনের পৌত্র এবং সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, মেদিনীপুর জেলার কনভেনর। বেদমন্ত্র পাঠের পর স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতপন বৈদ্য মহাশয়। তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং সংগঠনে নানাজনের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল মহাশয়। তারপর প্রধান বক্তা শ্রীকৃষ্ণকুমার সরকার মহাশয়ের বক্তব্য শুরু হয়। তিনি মহাত্মা রাইচরণ সরদার সম্পর্কে একটি অতিমূল্যবান শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। এরপর সভাপতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং কল্যাণমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। মোট ১৭ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন এবং একজন সদস্য **আফ্রিকা মহাদেশের সেনেগাল দেশ** থেকে অংশগ্রহণ করেন। ফলে অনুষ্ঠানের মান বৃদ্ধি পায় এবং আলোচনা সভাটি আন্তর্জাতিকরূপ লাভ করে। এই আলোচনা সভাতেই পরবর্তী সাংগঠনিক মিটিং-এর তারিখ ১৫ই এপ্রিল, ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়।

ভারতবর্ষে প্রায় ৩ হাজারের বেশি খ্রিষ্টীয় সংস্থা এবং প্রায় ২৭০০-এর বেশি ইসলামী সংস্থা ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে (অবক্ষয়িত তপশিলী সমাজ- শ্রী প্রশান্ত প্রামানিক) অথচ আমরা সব ধর্ম সমান বা যত পথ তত মত জপ করে চলেছি। যদি সব ধর্ম সমান হয় বা সব পথে ইশ্বরকে পাওয়া যায় তবে ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজন কোথায় ? তাহলে কেন ধর্মান্তরকরণ করা হয় ? এ বিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সচেতন হতে হবে এবং নিজ দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে। -পত্রিকা সম্পাদক।।

সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ

1. সকল সরকারী নথিতে ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি শংসাপত্রে পৌণ্ড্র শব্দের সঙ্গে **'ক্ষত্রিয়'** যোগ করে **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** করতে হবে।
2. মকর সংক্রান্তির দিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে।
3. **মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
4. **সুন্দরবনে মহাত্মা কপিল মুনির নামে 'কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।**
5. **সরকারকে "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ"** গঠন করতে হবে এবং তাতে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনরাই থাকবেন।
6. **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্তত একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে রাখতে হবে।**
7. সুন্দরবন ও মেদিনীপুর জেলার নদীবাঁধগুলি কংক্রিটের দ্বারা স্থায়িত্ব বিধান করতে হবে।
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্মৃতি বিজড়িত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করতে হবে এবং মিউজিয়াম নির্মাণ করতে হবে।
9. **সুন্দরবনের পানীয় জল সমস্যার সমাধানের জন্য পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করতে হবে।**
10. **হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগরের 'কল্পগঙ্গা ও কপিল মুনি মেলা'র পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।**
11. হাসনাবাদ থেকে হেমনগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করতে হবে।
12. রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
13. হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে **"ব্রহ্মচারী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়"** করতে হবে।
14. সুন্দরবনের নদীগুলির উপর সেতু নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনদের নামে নামকরণ করতে হবে।
15. সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার ও জেলার অন্য অংশের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন রোড পারমিট প্রদান ও বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
16. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তাদের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে হবে।
17. পূর্ব মেদিনিপুরে ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

18. দক্ষিণ রায়, বেণী মাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ, ঈশানচন্দ্র কামার, পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগর, স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বদেশী গৌরহরি বিশ্বাস, জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর, স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের নামে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
19. শহীদ গঙ্গাহরি দাসের নামে সাগরদ্বীপে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
20. ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার মহাশয়ের নামে একটি ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
21. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পুঁথি বিশেষজ্ঞ অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
22. সমাজদরদী শক্তিকুমার সরকারের নামে সুন্দরবনে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও একটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
23. সঙ্গীতসাধক ভীমচন্দ্র সরদারের নামে সঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
24. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দরদী হেমচন্দ্র নস্করের নামে একটি উপনগরীর নাম রাখতে হবে।
25. সমাজসেবী ডাক্তার রাধানাথ সরকারের নামে একটি নার্সিং কলেজ মুর্শিদাবাদ জেলাতে গড়ে তুলতে হবে।
26. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে সুন্দরবনে একটি ট্যুরিজম কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
27. বসন্তকুমার মণ্ডল মহাশয়ের নামে টালিগঞ্জের একটি সরকারী স্টুডিওর নামকরণ করতে হবে।
28. শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের নামে একটি ছাত্রাবাসের নাম করণ করতে হবে।
29. স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা একটি দূর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
30. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামে মেদিনীপুরের একটি স্কুলের নামকরণ বা নতুন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
31. মথুরাপুর লোকসভার একটি কিষানমান্ডির নাম কংসারী হালদারের নামে রাখতে হবে।
32. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে একটি করে স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।
33. প্রতিটি ব্লকের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্তত ১০০ শিক্ষার্থীকে ইংলিশ মিডিয়ামে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
34. প্রতিটি ব্লকে কিছু প্রাইমারী স্কুলকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উন্নীত করতে হবে।
35. হিঙ্গলগঞ্জ, ন্যাজাট, দৌলতপুর, বিষ্ণুপুর, আমতলা, কৃপারামপুর, বলরামপুর, রায়পুর, রামেস্বরপুর, রামচন্দ্রপুর, চম্পাহাটি, কালিকাপুর বারাসাত, নিমপীঠ ও তুলসীঘাটা, বিদ্যাধরপুর, বাসন্তি,

তালদি, দীঘিরপাড়, মাখালতলা, ঢোলা, অযোধ্যানগর, চাঁদপুর, বংশীধরপুর, কৃষ্ণচন্দ্র পুর, মথুরাপুর ইত্যাদি জনগণনা শহরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করতে হবে।

36. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে ফায়ার ব্রিগেড অফিস বানাতে হবে ও টীম রাখতে হবে।
37. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে কোল্ডস্টোরেজ বানাতে হবে।
38. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত দুটি করে রাইস মিল বানাতে হবে।
39. মৎস্যজীবীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আধুনিক সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে এবং উপযুক্ত বিমার ব্যবস্থা করতে হবে।
40. পরিবেশের ক্ষতি না করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন করতে হবে। এই শিল্পে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ করতে হবে।
41. বিনোদন পার্ক নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে তার নামকরণ করতে হবে।
42. সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্লককে রেল নেটওয়ার্কে জুড়তে হবে।
43. রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এলাকায় বিশেষ নজর দিতে হবে।
44. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের পরিবেশের মান বজায় রাখার জন্য নদীর তীরগুলিতে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
45. লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়াতে হবে ও ডিজিটালাইজড করতে হবে।
46. প্রতি ব্লকে একটি হাসপাতাল এবং প্রতি গ্রামে একটি করে হেলথ সেন্টার নির্মাণ করতে হবে।
47. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের নদী তীরস্থ প্রতিটি গ্রামে স্থায়ী শ্মশাণ ঘাট ও শ্মশাণ যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম বানাতে হবে।
48. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের প্রতিটি ব্লকে DISASTER MANAGEMENT-এর শাখা গড়ে তুলতে হবে এবং স্থানীয় যুবদের সেখানে যুক্ত করতে হবে।
49. প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে চাকরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
50. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডল, অষ্টমী ঢালী, মোক্ষদা নস্কর প্রমুখের নামে মহিলা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
51. গ্রাম, পৌরসভার নাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে রাখতে হবে।

***

SARBA BHARATIYA POUNDRAKSHATRIYA SAMAJ

3RD CONFERENCE ON 25/01/2026 AT RASBIHARI INSTITUTION FOR GIRLS, BARASAT

INCOME AND EXPENDITURE REPORT

INCOME

INCOME BY DONATION, REGISTRATION & DELEGATE FEES			
SL NO	**NAME**	**AMOUNT (RS/-)**	**TOTAL**
1	SRI SWAPAN KUMAR MANDAL	5001/-	
2	SMT. SONALI MADAL	1001/-	
3	SRI SATTWIK MANDAL	501/-	
4	SRI ASIM MONDAL	100/-	
6	REGISTRATION	3300/-	
7	DELEGATE FEE	3300/-	
TOTAL			13203/-

EXPENDITURE

EXPENDITURE			
SL NO	**NAME**	**AMOUNT (RS/-)**	**TOTAL**
1	PUBLICATION	5646/-	
2	TIFFIN	470/-	
3	PRESS AND PRINTINGS	100/-	
4	FOLDER AND PEN	300/-	
5	HALL AND ROOM RENT	500/-	
6	LANCH	14200/-	
7	FLOWERS	390/-	
8	CANDLE	80/-	
9	PHOTO	1000/-	
10	FLEX	1220/-	
11	GIFT & PEN	225	
TOTAL EXPENDITURE			24131/- *731.24 Per Head
INCOME			13203/-
Deficit			10928/-

Deficit Amount Paid by Sri Swapan Kumar Mandal (President)

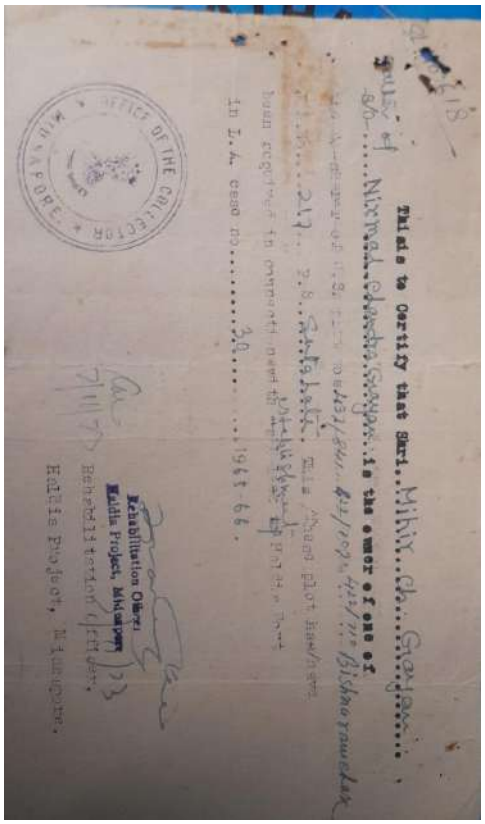
সাবধানতা* পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অনুপ্রবেশকারীদের কাছে জমি, দোকান, বাড়ি বিক্রি না করেন। এমনকি ভাড়াও দেবেন না।

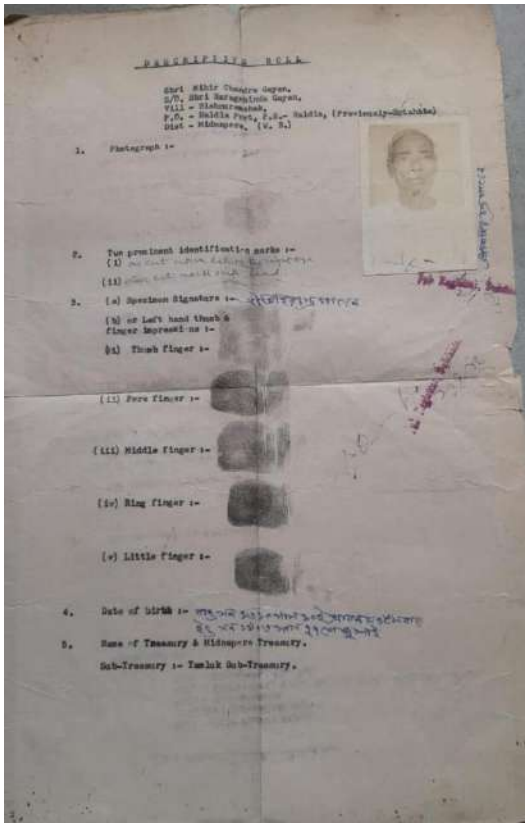
স্বর্গীয় মিহির চন্দ্র গায়েন





স্বর্গীয় মিহির চন্দ্র গায়েন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুর উত্তাল হয়ে ওঠে। যে মিছিলে মাতঙ্গিনী হাজরা গুলিবিদ্ধ হন সেই মিছিলে মাতঙ্গিণী হাজরার সঙ্গে ছিলেন মিহির বাবু। 1993 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সরকার দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠান করে, সেখানে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মাত্র 3000 জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মিহির বাবু ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। ইনি পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এনার সম্পর্কিত নথিপত্র নিম্নে দেওয়া হল -





PARTICULARS BOOK

Shri Nikir Chandra Gayen.
S/O. Shri Haragobinda Gayen.
Vill - Bishnumanab.
P.O. - Haldia Port, P.S.- Haldia, (Previously-Sutahata)
Dist - Midnapore, (W. B.)

1. Photograph :-

2. Two prominent identification marks :-
(i)
(ii)

3. (a) Specimen Signature :-

(b) or Left hand thumb & finger Impression :-

(b1) Thumb Finger :-

(ii) Fore finger :-

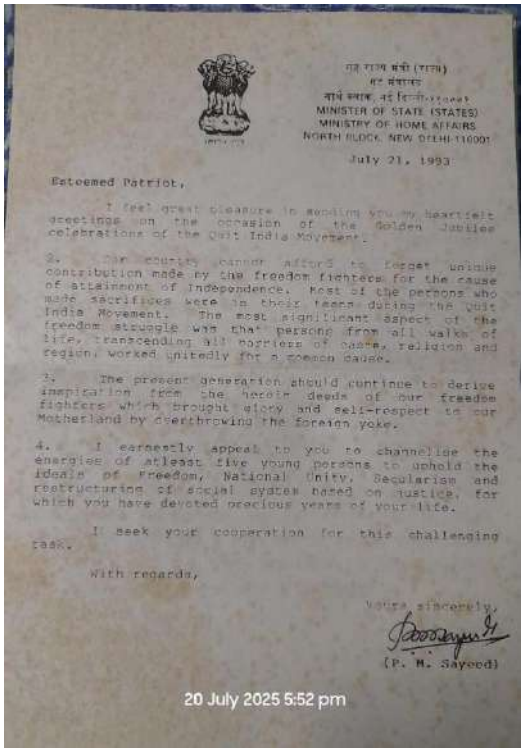
(iii) Middle Finger :-

(iv) Ring finger :-

(v) Little finger :-

4. Date of birth :-

5. Name of Treasury & Midnapore Treasury.
Sub-Treasury :- Tamluk Sub-Treasury.



MINISTER OF STATE (STATES)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

July 21, 1993

Esteemed Patriot,

I feel great pleasure in sending you my heartfelt greetings on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of the Quit India Movement.

2. Our country cannot afford to forget unique contribution made by the freedom fighters for the cause of attainment of independence. Most of the persons who made sacrifices were in their teens during the Quit India Movement. The most significant aspect of the freedom struggle was that persons from all walks of life, transcending all barriers of caste, religion and region, worked unitedly for a common cause.

3. The present generation should continue to derive inspiration from the heroic deeds of our freedom fighters which brought glory and self-respect to our Motherland by overthrowing the foreign yoke.

4. I earnestly appeal to you to channelise the energies of atleast five young persons to uphold the ideals of freedom, National Unity, Secularism and restructuring of social system based on justice, for which you have devoted precious years of your life.

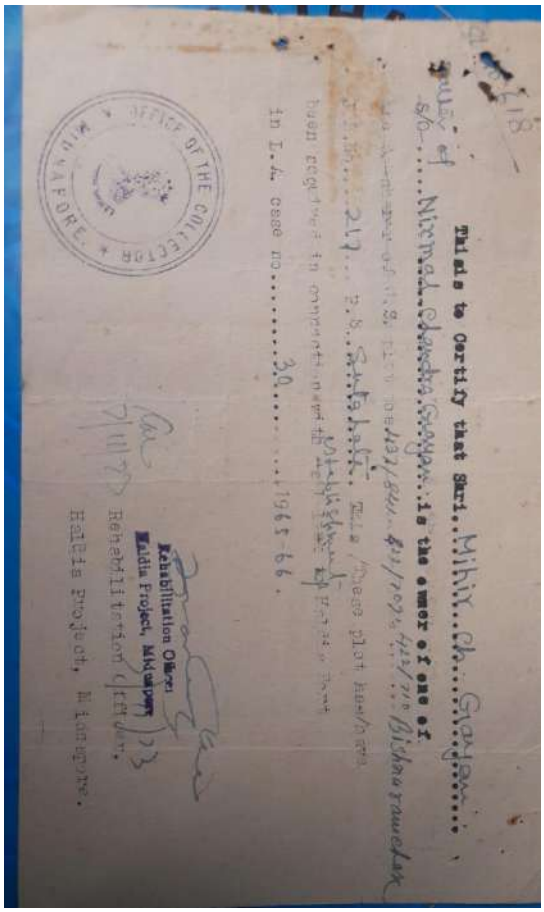
I seek your cooperation for this challenging task.

With regards,

Yours sincerely,

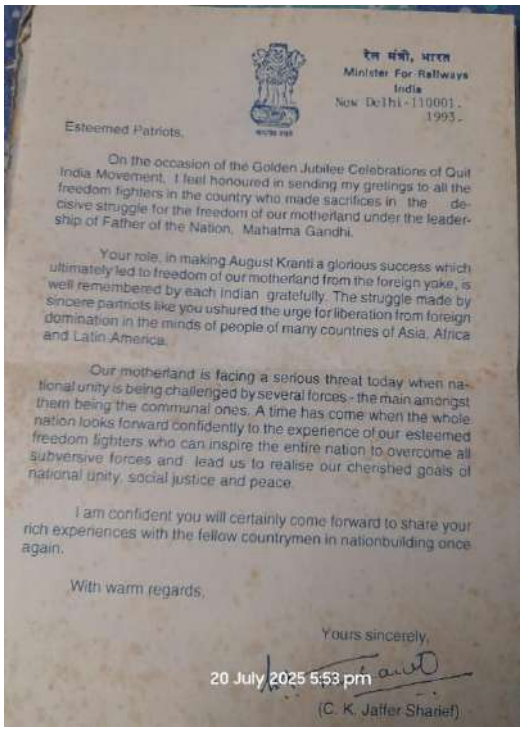
(P. M. Sayeed)

20 July 2025 5:52 pm



This is to certify that Shri Mihir Chandra Gayen
S/o Late Nirmal Chandra Gayen is the owner of one of
the Rehabilitation Plot No. 217 Sector No. 2 Block No. Ekta Plot Number
Haldia Project, Midnapore.
Rehabilitation Officer
Haldia Project, Midnapore
Rehabilitation Office
Haldia Project, Midnapore
been acquired in connection with the
in I.A. case no. 30 1965-66.

OFFICE OF THE COLLECTOR
BEFORE



रेल मंत्री, भारत
Minister For Railways
India
New Delhi-110001.
1993.

Esteemed Patriots,

On the occasion of the Golden Jubilee Celebrations of Quit India Movement, I feel honoured in sending my greetings to all the freedom fighters in the country who made sacrifices in the decisive struggle for the freedom of our motherland under the leadership of Father of the Nation, Mahatma Gandhi.

Your role, in making August Kranti a glorious success which ultimately led to freedom of our motherland from the foreign yoke, is well remembered by each Indian gratefully. The struggle made by sincere patriots like you ushured the urge for liberation from foreign domination in the minds of people of many countries of Asia, Africa and Latin America.

Our motherland is facing a serious threat today when national unity is being challenged by several forces - the main amongst them being the communal ones. A time has come when the whole nation looks forward confidently to the experience of our esteemed freedom fighters who can inspire the entire nation to overcome all subversive forces and lead us to realise our cherished goals of national unity, social justice and peace.

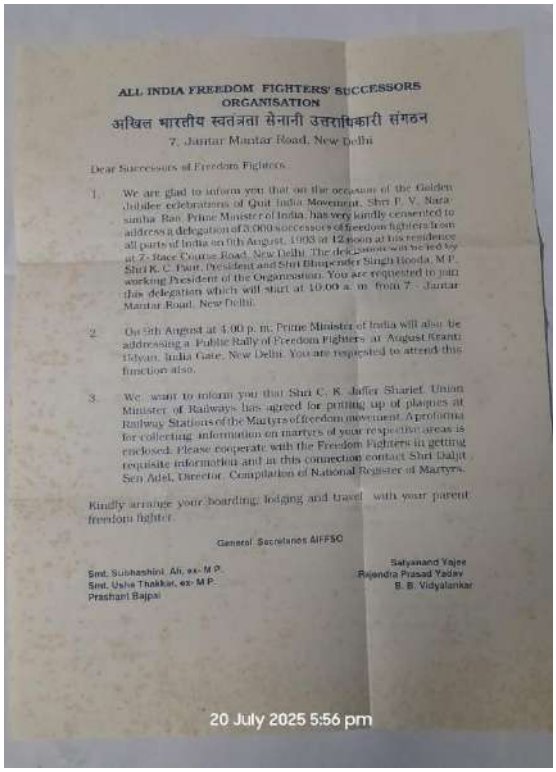
I am confident you will certainly come forward to share your rich experiences with the fellow countrymen in nationbuilding once again.

With warm regards,

Yours sincerely,

20 July 2025 5:53 pm

(C. K. Jaffer Sharief)



ALL INDIA FREEDOM FIGHTERS' SUCCESSORS ORGANISATION

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन

7, Jantar Mantar Road, New Delhi

Dear Successors of Freedom Fighters,

1. We are glad to inform you that on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of Quit India Movement, Shri P. V. Narasimha Rao, Prime Minister of India, has very kindly consented to address a delegation of 2,000 successors of freedom fighters from all parts of India on 9th August, 1993 at 12 noon at his residence at 7- Race Course Road, New Delhi. The delegation will be led by Shri K. C. Pant, President and Shri Bhupender Singh Hooda, M.P., working President of the Organisation. You are requested to join this delegation which will start at 10.00 a. m. from 7 - Jantar Mantar Road, New Delhi.

2. On 5th August at 4.00 p. m. Prime Minister of India will also be addressing a Public Rally of Freedom Fighters at August Kranti Udyan, India Gate, New Delhi. You are requested to attend this function also.

3. We want to inform you that Shri C. K. Jaffer Sharief, Union Minister of Railways has agreed for putting up of plaques at Railway Stations of the Martyrs of freedom movement. A proforma for collecting information on martyrs of your respective areas is enclosed. Please cooperate with the Freedom Fighters in getting requisite information and in this connection contact Shri Daljit Sen Adel, Director, Compilation of National Register of Martyrs.

Kindly arrange your boarding, lodging and travel with your parent freedom fighter.

General Secretaries AIFFSO

Smt. Subhashini Ali, ex- M.P.
Smt. Usha Thakkar, ex- M.P.
Prashant Bajpai

Satyanand Yajee
Rajendra Prasad Yadav
B. B. Vidyalankar

20 July 2025 5:56 pm

Mihir chandra Gayen. vill- Bishnuramchak. po-Haldia town ship.ps-haldia.Dist-purba medinipur. Their family has been shifted to south 24 paraganas as Their land had been acquired by haldia Port.

- সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিকট আবেদন করা হচ্ছে তাদের নিকট যদি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বাধীনতা বিষয়ক কোনও খবর এবং নথিপত্র থাকে তাহলে সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করবেন। সেই খবর ও তথ্য এখানে প্রকাশ করা হবে।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ মেনে চলুন

1. অনুপ্রবেশকারীদের কাছে জমি বিক্রি করবেন না। অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া হবে।
2. নিয়মিত গীতা পাঠ করুন - এই গ্রন্থ ক্ষত্রিয়দের কথোপকথন।
3. তিলক লাগিয়ে বাইরে বের হবেন, 'পৌণ্ড্র' কথার অর্থ তিলক এবং এটি ক্ষত্রিয় আচার।
4. ক্ষত্রিয় আচার রপ্ত করতে নিয়মিত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করুন।
5. বিভিন্ন NARRATIVE ও অপপ্রচার সম্পর্কে সজাগ থাকুন।
6. ভোট চাইতে এলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক প্রশ্ন করুন। নমশূদ্ররা, রাজবংশীরা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে আমরা কবে পাবো ?
7. যিনি বলবেন হিন্দু মুসলিম করবেন না - তাকে বলুন দেশ কেন ভাগ হয়েছিল ?
8. ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হলে ভারত কেন হিন্দু রাষ্ট্র নয় ? প্রশ্ন করুন।
9. মুসলিমরা মুসলিমদের পক্ষে কথা বললে দোষ নেই, খৃষ্টানরা খৃষ্টানদের হয়ে কথা বললে দোষ নেই, হিন্দুরা হিন্দুর পক্ষ নিয়ে কথা বললে সাম্প্রদায়িক বলা হচ্ছে। যারা বলছে তাদেরকে চিহ্নিত করুন ও তাদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দূরে থাকুন।
10. অজুহাত দেওয়া থেকে দূরে থাকুন, সাংগঠনিক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ***